রূপালী বাতাস সোনালী আকাশ

এম, আর, আখতার

রূপালী
বাতাস
সোনালী
আকাশ

রূপালী বাতাস/সোনালী আকাশ

এম, আর, আখতার

মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা—এক

Rupali Batash/Sonali Aakash
M. R. Akhtar
Price Taka Twenty five only

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭৪
প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স,
৩৯, বাংলা বাজার, ঢাকা-এক-এর
পক্ষে আহমেদ মাহফুজুল হক।
মুদ্রাকর : সালেহ আহমেদ খান
কাজল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৮২, আর, এম, দাস রোড ঢাকা-এক
প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী
মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র

‘তেরো নম্বরে পাঁচ বছর’ এবং ‘অন্য দিন অন্য জীবনের’ লেখক ও আমার জন্মদাতা মরহুম সাদত আলী আখন্দের স্মৃতির উদ্দেশে।

একাত্তুর সালে পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনীর হামলায় তিনি বগুড়া শহর থেকে পালিয়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যাবার পথে ১১ ই মে তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

এম, আর, আখতার (মুকুল)

পূর্বকথা

১৯৪০ সাল থেকে শুরু করে পরবর্ত্তী তিরিশ বছরে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের একটা চিত্র এই পুস্তকে তুলে ধরবার প্রয়াস করেছি। অবশ্য বাহ্যত 'রূপালী বাতাস/সোনালী আকাশ' পুস্তকে আমার কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি মন্থন করেছি বৈকী !

আজ থেকে বছর ছয়েক আগে এই পুস্তকের রচনাকাল। এর প্রথম খণ্ড ১৯৭২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু উভয় খণ্ড একত্রিত অবস্থায় বাংলাদেশে সমাদৃত হবে বলেই আশা রাখি। তবে গত কয়েক বছরে আমার মানসিকতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে আশংকায় পুস্তকটির পাণ্ডুলিপিতে কিংবা প্রুফে নজর দিতে সাহসি হইনি।

পুস্তকটি প্রকাশের ব্যাপারে যে মহাপ্রাণ ব্যক্তি আমাকে সব সময়েই আন্তরিক ভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং সাহস দিয়েছেন তিনি আর আমাদের মাঝে নেই। বাংলাদেশের ক্রমবর্দ্ধমান পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের মধ্যমণি 'মাওলা ব্রাদার্স' এর প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ আতিকুল মাওলা হঠাৎ করে ১৯৭৩ সালের ২০শে অক্টোবর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরপারে চলে গেছেন। ঐ সময় এই পুস্তকটির কয়েকটা মাত্র ফর্মা ছাপা হয়ে প্রেসে পড়ে ছিল।

কিন্তু কয়েক মাস পরে মরহুম মাওলার ভ্রাতুষ্পুত্র আহমেদ মাহফুজুল হক জাহাঙ্গীর পুস্তকটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেন। তখন পাণ্ডুলিপির শেষাংশ আবার হারিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমার বন্ধু সাপ্তাহিক চিত্রালী সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজের স্মরণাপন্ন হলাম। কেননা সমস্ত লেখাটাই ধারাবাহিকভাবে এক সময় চিত্রালীতে প্রকাশিত হয়েছিল। বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে পারভেজ সাহেব আমার পাণ্ডুলিপির হারিয়ে যাওয়া অংশটুকু কপি করিয়ে দিয়ে অশেষ উপকৃত করেছেন।

এরপর দেখা দিলো কাগজ সমস্যা। প্রথম কয়েকটা ফর্মা কার্টিজ কাগজে ছাপা হওয়ায় পরের ফর্মাগুলোর জন্যও কার্টিজ কাগজ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত কর্ণফুলী পেপার মিল থেকে সরাসরিভাবে কাগজ সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে।

এই পুস্তকটি লেখার জন্য সর্বপ্রথম আমাকে উৎসাহিত ও প্রতিদিন লেখার তাগাদা দেয়ায় আমার জীবনসঙ্গিনী মাহমুদা আখতার রেবাকে অশেষ ধন্যবাদ।

কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদপট আমার ভালো লেগেছে।

'রূপালী বাতাস/সোনালী আকাশ' স্বয়ং সম্পূর্ণ পুস্তক হিসাবে পাঠক পাঠিকাদের কাছে উপস্থাপিত করতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু আমার মতে এই পুস্তকের আসল অংশ এখনও প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

১৪ ই ভাদ্র ১৩৮১ — এম, আর, আখতার

৩ নং অরুনিমা ফ্ল্যাট
ঢাকা—২

রূপালী বাতাস

মগরেবের নামাজ হয়ে গেছে। সমস্ত বাড়ীটা আজ থমথম করছে। আমরা সব ভাই মিলে পড়তে বসেছি। কিন্তু সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে লক্ষ্য করছি, আব্বার কাণ্ড। তাঁর আইন হচ্ছে মগরেবের নামাজের পরই তিনি সমস্ত ছেলেদের বাসায় দেখতে চান। কিন্তু আজ বড় ভাই এখনও নাপাত্তা। কেবল আমি আর মেজোভাই জানিড় ব ভাই গেছে এক সুদূর গ্রামে ফুটবল খেলতে। কত করে আমরা দু'জন নিষেধ করলাম, অতদূরে ভাড়ায় ফুটবল খেলতে যেয়ো না। কিন্তু উনি যে নগদ দু'আনা পয়সা অগ্রিম নিয়েছেন সেই টীম থেকে! এছাড়া খেলা শেষ হবার পর ভাইকে সাইকেলে পৌঁছে দেবার কথা। কিন্তু কোথায় কি! সন্ধ্যার পর রাতের ঘন অন্ধকার নেমে এলো, তবু ভাইয়ের দেখা নেই। হঠাৎ দেখলাম আব্বা কাপড় পরছেন। আমাদের বুক দুরু দুরু করছে আর ভাবছি আজ ভাইয়ের কপালে কী দুঃখই না আছে। শেষ পর্যন্ত আব্বা কাপড় পরে তাঁর হাণ্টারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়—বড় ভাইয়ের খোঁজে। আর আম্মা এসে বসলেন আমাদের পড়ার টেবিলে একটা পরামর্শের জন্য।

যখনকার কথা বলছি সেটা আজ থেকে প্রায় ২৯ বছর আগেকার কথা। আব্বা তখন পুলিশের দারোগা ছিলেন। ১৯৪০ সাল। আমরা তখন টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাই স্কুলে পড়তাম আর 'মানদায়িনী লজে' থাকতাম। শেষ পর্যন্ত আম্মা আমাকে

পাঠালেন খালের ধারে—যেখান দিয়ে বড় ভাইয়ের ফিরে আসার কথা। আর মেজোভাই গেল পাশের বাসায় অবনীবাবু দারোগাকে খবর দিতে। খালের ধারের সমস্ত রাস্তাঘাট আর গলিচীপা আমার মুখস্থ। রাত তখন আটটার মতো হবে। মফস্বল শহর। লোক যাতায়াত একেবারেই কমে গেছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে লক্ষ্য করলাম খালের উপরের প্রথম পুলটার পাশে আব্বা হান্টার নিয়ে পায়চারি করছেন। আমি উপায় না দেখে দ্বিতীয় পুলটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কার কপাল গুনে বলতে পারি না, ভাইকে দেখলাম দুই নম্বর পুল দিয়ে এগিয়ে আসছে। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম—তোমার না সাইকেলে ফেরার কথা? চাপা কণ্ঠে উত্তর এলো, 'সাইকেল যোগাড় করতে পারিনি, তাই তিন মাইল হেঁটে এলাম।' আমি তখন ভাইকে বাসার সব ঘটনা বর্ণনা করলাম।

দুই ভাই যুক্তি করে বাসার পিছন দিয়ে এসে ঢুকলাম। আমি তো বাসায় গিয়ে সোজা পড়ার টেবিলে গিয়ে পড়া শুরু করে দিলাম। আর ভাই গিয়ে হাজির হলো আম্মার দরবারে। পড়তে বসে দেখলাম আব্বা তখনও ফেরেননি আর অবনীবাবু একটা চেয়ারে বসে সেদিনকার খবরের কাগজটা দেখছেন। একটু পরেই হান্টার হাতে আব্বা ফিরে এলেন। বাইরের ঘরে অবনীবাবুকে দেখেই মুখটা একটু হাসি হাসি হ'য়ে গেল। আর অবনীবাবু আব্বার হাতের হান্টারটার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, "কী ব্যাপার, আসামী খুঁজতে বের হয়েছিলেন নাকি?" আব্বা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আসামীই বটে।" কথাটা বলেই তার স্বভাবসুলভ অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। এরপর শুরু হলো দুই বন্ধুর রসালাপ। কিন্তু এই রসালাপ বেশী দূর এগুতে পারলো না। হঠাৎ "আর জীবনে করবো না", এই কথা ক'টা বলেই বড় ভাই হুড়মুড় করে এসে আব্বার পা জড়িয়ে ধরলো। আব্বা লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলে

উঠলেন, "করিস কী? করিস কী?" আর পা সরাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আব্বার একটু 'লেট্' হয়ে গেছে। তাই আব্বার পদযুগল মুহূর্তে বড় ভাইয়ের হাতের বেড়াজালের মধ্যে দেখলাম। এদিকে অবনীবাবুর চেহারা যা হয়েছে তা' ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত আব্বা ভাইকে মাফ্ করে দিয়ে পড়াতে পাঠালেন। আমি মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম পর্দার ওপাশ থেকে আম্মার মুখটা সরে গেল। তিনি দেখে গেলেন, তাঁর রচিত নাটিকার অভিনয় কেমন হয়েছে।

আমরা এক মায়ের পেটে হচ্ছি আট ভাই ছয় বোন। এর মধ্যে বেঁচে আছি সাত ভাই চার বোন। এতগুলো ছেলেমেয়েকে মানুষ করা যে কী কঠিন ব্যাপার তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানে। এই ছেলেমেয়ে মানুষ করতে গিয়ে আব্বা-আম্মার ত্যাগের কথা চিন্তা করলে হতবাক্ হয়ে যাই। আমার জ্ঞান হওয়ার পর এঁদের দুজনের কাউকেই কোনদিন সিনেমায় পর্যন্ত যেতে দেখিনি। আব্বা তো পান, সিগারেট, তামাক—এমনকি চা পর্যন্ত জীবনে পান করেননি। সমস্তটা জীবন তিনি কঠোর সংযম আর হিসাব করে নিজের সংসারধর্ম পালন করে গেছেন। তাই আব্বা নিজের সংসারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কতকগুলো অলিখিত আইনের বেড়াজালের সৃষ্টি করেছিলেন। এই আইনের বাইরে যাওয়া আমাদের সাধ্যের অতীত ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকটা ভাইবোনকে রাত চারটায় বিছানা থেকে উঠতে হতো। এ অভ্যাসটা আমার এতই মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, এখনও পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে। অবশ্য এখন আবার এ অভ্যাসটার জন্যে নিজের অর্ধাঙ্গিনীর কাছ থেকে মাঝে মাঝে গালমন্দ খেতে হয়, তা বলাই বাহুল্য।

রোববার সকালে আব্বা আমাদের সবার জন্যে বেত তৈরী করতেন, আর সেই সব বেতগোছার গায়ে আমাদের নাম পর্যন্ত

লেখা থাকতো। আমাদের কেউ দুষ্টুমি করলে আব্বা নাম লেখা বেত দিয়ে মার শুরু করতেন। আর সে কী মার! বেতগোছা পুরা না ভাঙ্গা পর্যন্ত মার থামতো না। আমি মার খেতাম সন্ধ্যাবেলা পড়ার সময়। তাই বলে পড়াশুনার জন্য নয়। কেননা পড়াশুনায় মোটামুটি ভালই ছিলাম। কিন্তু গণ্ডগোল হতো আমার ঘুম নিয়ে। সন্ধ্যাবেলায় পড়তে বসলেই ঘুম লাগতো। আর ঝিমুতে আরম্ভ করলেই খেতাম মার। সে মারের বাপ-মা নেই। চড়, ঘুষি, চাটি, থাপ্পড় সব কিছুই চলতো আমার উপর। সময় সময় জীবনের প্রতিই বিতৃষ্ণা জাগতো। এই ঘুম তাড়ানোর জন্য চোখে পানির ছিটা দেয়া থেকে শুরু করে সরষের তেল পর্যন্ত দিয়েছি। কিন্তু কোথায় কি! আবার ঝিমুনি, আবার মার।

বাংলাদেশে তখনও বিদ্যুতের প্রচলন বিশেষ হয়নি। প্রায় মফস্বল শহরেই হ্যারিকেনের প্রচলন ছিল। আমাদের বাসার নিয়ম ছিল এই হ্যারিকেন ধরানোর আগেই সব ছেলেমেয়েদের রাতের ভাত খাওয়া শেষ করতে হবে। বড় হয়ে দেখেছি এ নিয়মটা জেলখানায় এখনও পর্যন্ত চালু রয়েছে। সমস্ত বিকাল ধরে ফুটবল খেলার পর সন্ধ্যায় ভাত খেয়ে পড়তে বসলে যে ঘুম ধরা স্বাভাবিক এ কথাটা আব্বাকে আজ পর্যন্ত বলতে পারিনি। কেননা আব্বার চালু করা আইনের প্রতিবাদ করা যে আমাদের সাধ্যের অতীত। টাঙ্গাইল থাকাকালীন আর একদিনের ঘটনা এখনও পর্যন্ত চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে।

সেটা কিসের যেন এক ছুটির দিন ছিল। সকাল ন'টায় পড়াশুনা শেষ করেই আমরা ক'ভাই খুব খেলতে শুরু করেছি। এর মধ্যেই দেখি বড় ভাইয়ের সঙ্গে আমার পিঠের ছোট ভাই কচির একটা শলা-পরামর্শ হচ্ছে। আমরা বাকী ভাইরা দৌড়ে গিয়ে ওদের দুজনকে ঘেরাও করে দাঁড়ালাম; শুনলাম এক পয়সায় রফা হয়েছে। ঘটনাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার।

আমার পিঠের ছোট ভাই কচি কাউকে ওর মাথায় হাত দিতে দেয় না। আমাদের হাতে কিছু করার না থাকলেই কচির কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত দেয়ার চেষ্টা করতাম। ওটুকুই যথেষ্ট। কচি তখনই কেঁই-ই কেঁই-ই করে চীৎকার করতো। আর এই অর্ধ-ক্রন্দনের চীৎকার আব্বা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাই আসামী আর ফরিয়াদি যাকেই হাতের কাছে পেতেন, তাকেই মারতেন। ফলে কচির মাথায় হাত দেয়ার জন্য আমাদের জেদ আরও বেড়ে যেতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত বড় ভাইয়ের বুদ্ধির জয় হলো। উনি পয়সা দিয়ে কচিকে রাজী করিয়েছেন। শর্ত হচ্ছে কচি তার কোঁকড়ানো চুলের মাথাটা বড়ভাইয়ের কোলে সুন্দরভাবে স্থাপন করবে আর বড়ভাই তার একটা হাত কচির মাথায় চারদিক স্পর্শ করে ঘুরিয়ে আনবেন। এভাবে তিনবার ঘুরানো হলে আমরা 'এক' বলে চীৎকার করে উঠবো। এরকম ষাটবার হলে কচি চকচকে নতুন একটা তামার পয়সা পাবে। বড়ভাই কচির মাথায় হাত দেয়ার স্বাদ মিটাতে চান। যাক, শুরু হয়ে গেল এক আজব খেলা। মেঝেতে বড়ভাইয়ের কোলের উপর কচি চমৎকারভাবে মাথাটা 'প্লেস' করে বসে রয়েছে। আর ভাই মাথা স্পর্শ করে তাঁর হাত ঘুরিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে আমরা বাকী ক'ভাই-বোন ওদের বৃত্তাকারে ঘুরছি আর চীৎকার করে কোরাসে এক—দুই—তিন—চার করে গুনে যাচ্ছি।

ওদিকে আম্মা রান্নাঘরে ব্যস্ত আর আব্বা উপরতলায় ইলাস্ট্রেটেড উইকলীর পাজল্-এ নিমগ্ন।

আধ ঘন্টা পর আমাদের খেলা প্রায় শেষের পর্যায়ে এসে গেছে। আমাদের বুক দুরু দুরু করছে এই ভেবে যে, ষাট গোনা শেষ্ হতেই কচি একেবারে একটা চকচকে নতুন তামার পয়সার অধিকারী হয়ে যাবে। কিন্তু একী! হঠাৎ ঘরে বজ্রপাত হলেও এতো অবাক হতাম না। উনষাটবার পুরা আর দু' চক্কর হাত

ঘুরিয়েই বড় ভাইয়ের হাত বন্ধ হয়ে গেছে। উনি বললেন, যাটবার পুরাও করবো না—পয়সাও দেব না। যেই না বলা এই কথা, আর যায় কোথায়? বাড়ীতে কেউ মারা গেলেও বোধ হয় কেউ এত জোরে চীৎকার করে কাঁদে না। মুহূর্তে মহরমের সৃষ্টি হলো। আব্বা এই বিকট চীৎকার শুনে নেমে এসেছেন। দৌড়ে গিয়ে রাস্তায় ধরলেন বড়ভাইকে। আমরা সবাই প্রমাদ গুনলাম। আজ আর অবনীবাবুকে আনলেও কাজ হবে না। আব্বার এক হাতে বড়ভাই আর এক হাতে কচি। দু'জনকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা একেবারে নিশ্চিত যে আজ যা হবে তা অচিন্তনীয়। কিন্তু অবাক হলাম এই ভেবে যে, সব সময়েই তো আব্বা এসেই এলোপাতাড়ি মার শুরু করেন, কিন্তু এবার মারলেন না। এবারে দু'-জনকেই ধরে নিয়ে যাচ্ছেন ভিতর বাড়ীতে। একটু পরেই দেখলাম আব্বা একটা লাঠি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উঠানের এক পাশটায় আর কুঁয়ার পাড়ে বসে দু'জনে ওজু করছে। ওজু শেষ হলে আব্বা বড়ভাই আর কচিকে নিয়ে গেলেন উপরের ছাদে। হুকুম পেয়ে মেজোভাই দৌড়ে জানামাজ এনে দিলো আর আম্মা নিয়ে এলেন পবিত্র কোরান শরীফ। এই জানামাজে বসে বড়ভাই পাক কোরান স্পর্শ করে সেদিন প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আর কোনদিন কচির মাথায় হাত দিবেন না। আমাদের বুক থেকে বড় বড় নিশ্বাস বেরিয়ে এলো।

শীতের প্রারম্ভে আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে কাঁদাকাটি পড়ে যেতো। কেননা শীত শুরু হবার আগে কোন এক ছুটির দিনে আব্বা একটা মোটা খাতা নিয়ে বসতেন। এই খাতায় আমাদের ক'টা কাপড় এবং তা কোন তারিখে দেয়া হয়েছে লেখা থাকতো।

প্রথমে বড়ভাই গিয়ে হাজির হতো তার গরম কাপড়ের বাণ্ডিল নিয়ে। আব্বা মিলিয়ে দেখতেন কোনো কাপড় হারিয়ে গেছে কিনা। কোন কাপড় হারিয়ে গেছে, অথচ তাঁর কাছে

রিপোর্ট করা হয়নি, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধ। কাপড়ের গুন্‌তি শেষ হবার পর আব্বা গত বছরের পুরানো কাপড়গুলো ছেলেদের পরিয়ে দেখতেন কোনটা ছোট হলো কিনা। কোন গরম কাপড় একজনের গায়ে ছোট হয়েছে অথচ আরও ২-১ বছর চলতে পারে, তবে তো কথাই নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেই কাপড় যার গায়ে ছোট হয়েছে তার পিঠে যে ভাই রয়েছে তার নামে বরাদ্দ হয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এতোগুলো ভাইবোন থাকার ফলে কোন কাপড় ভালো অবস্থায় থাকলে, কারো গায়ে ছোট হলে তাতে আব্বার কোন অসুবিধে হতো না। তাই বলছিলাম শীতের প্রারম্ভে যেদিন আব্বা গরম কাপড়ের হিসেব করতেন, সেদিন আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে কাঁদাকাটি পড়ে যেতো। আমাদের মধ্যে মাঝের ভাইবোনগুলো কখনও কখনও ২-৩ বছরের মধ্যেও গরম কাপড় পেত না। শেষ পর্যন্ত মাঝে মাঝে আম্মার সুপারিশের প্রয়োজন হয়ে পড়তো।

অন্য কাপড়-চোপড়ের হিসাব বড্ড সোজা ছিল। প্রত্যেকের জন্য একজোড়া খাকি হাফপ্যান্ট ও একটা ইজার আর একজোড়া হাফসার্ট। গেঞ্জীর বদলে আমাদের জন্য নিমা বরাদ্দ ছিল। গেঞ্জী জিনিসটা নাকি বেশীদিন টিকে না আর দামও বেশী অথচ মার্কিন কাপড়ের তৈরী নিমা বহুদিন যেতো। এছাড়া বরাদ্দ ছিল একজোড়া বাটার 'নটিবয়' সু। আর বাসায় পরার জন্য ছিল খড়ম। এই ছিল আমাদের অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব। ঠিক এমনিভাবে আর একটা খাতায় লেখা থাকতো আমাদের বইপত্রের হিসাব। বইপত্রগুলো আব্বা প্রতি সপ্তাহেই পরীক্ষা করে দেখতেন। কোন খাতা শেষ হয়ে গেলে তা আব্বার কাছে ফেরত দিতে হতো। পুরানো খাতা বুঝে পাবার পর নতুন খাতা বরাদ্দ হতো। অবশ্য নতুন খাতা বলতে বাজার থেকে কেনা খাতা নয়। আব্বার কাছে সব সময়েই সাদা আর রুলটানা কাগজ দিস্তা হিসাবে কেনা

থাকতো। তিনি নিজে হাতে খাতা সেলাই করে করে উপরে নাম লিখে দিতেন। মাসের শেষে পুরানো খবরের কাগজ সের দরে বিক্রির সময় আমাদের খাতাগুলোও আব্বা ওজন দরে বিক্রি করতেন। পরে জানতে পেরেছিলাম, এসব টাকা আব্বা সারা জীবন ধরে একটা আলাদা একাউন্টে জমা রাখতেন। কয়েক বছর আগে আব্বা এ টাকা থেকেই বগুড়ার নামাজগড় গোরস্থানে প্রায় পাঁচ কাঠার মতো জায়গা কিনে 'আখন্দ পরিবার গোরস্থান' নাম দিয়ে ইটের দেওয়াল তুলে দিয়ে রেখেছেন। এখানেই একদিন আমাদের সবাইকে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে হবে, এটাই আব্বার ইচ্ছা।

টাঙ্গাইলের একদিনের একটা ঘটনার কথা পরিষ্কার মনে আছে। আব্বার সঙ্গে বাজারে গঙ্গাধর পোদ্দারের দোকানে গিয়েছি কাপড় কেনার জন্য। আমার মনে সেদিন কি আনন্দ! আমার নতুন কাপড় কেনা হবে আজ। তখন আমি পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। গঙ্গাধরের দোকানে আব্বা পছন্দ করলেন বারো পয়সা দামের চেক সার্টিং। আব্বা কিছুতেই বেশী দামের সার্টিং কিনবেন না। কিন্তু আমি পপলিন কাপড়ের জন্য দাবী করলাম। হঠাৎ কি যেন হলো। জোর জেদ করতে শুরু করলাম। যেটা অন্তত আব্বার মতো রাশভারী লোকের কাছে জীবনে আর করেছি কিনা মনে নেই। শেষ পর্যন্ত আমার শেষ অস্ত্র ছাড়লাম অর্থাৎ কাঁদতে শুরু করলাম। ভাবলাম এতো লোকজনের সামনে তো আব্বা মারতে পারবেন না। অবশ্য আমার কাঁদার আর একটা কারণ ছিল। সেটা হচ্ছে আব্বা যে চেক কাপড় পছন্দ করেছেন, সেই কাপড়ের সার্ট আমাদের বিন্দুবাসিনী স্কুলের হেডমাষ্টারের পাংখা-পুলারের গায়ে দেখেছি। তাই এই চেক কাপড়ের সার্ট গায়ে দিলে ছেলেরা স্কুলে আমাকে পাগল করে দিবে, তাতে সন্দেহ নেই। হঠাৎ চোখে মুখে সরষের ফুল দেখতে

লাগলাম। হাড়ে হাড়ে বুঝলাম আমার গালে বিরাশি সিক্কার চড় পড়েছে। এদিকে পোদ্দারমশাই আমার কান্না দেখে পপলিন কাপড়ের দাম গজ প্রতি এক পয়সা করে কমাতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু তাতে কী! আব্বা বারো পয়সার উপরে এক পাই বেশী খরচ করবেন না। শেষ পর্যন্ত আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'আমাকে লংক্লথের সার্ট দেন, তবু ঐ চেক কাপড়ের সার্ট নেবো না।' আব্বা বললেন, 'না, তোমাকে সাদা সার্ট দেয়া হবে না।' আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'টিয়া রংয়ের সাবান কিনে রং করে দেন।' শেষ পর্যন্ত দশ পয়সা গজের লংক্লথ কিনে আমার সার্ট বানাতে দেয়া হলো আর সেদিনই কেনা হলো টিয়া রংয়ের সাবান। মাত্র আটাশ বছরের তফাতে আজ আমার ছেলে যখন ঢাকার শাহীন স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে, তখন ছেলে আর তার মায়ের জেদে এই মাসখানেক আগে ছেলেকে আটাশ টাকা দিয়ে 'টেরিলিনে'র ফুল সার্ট কিনে দিতে হলো।

আমার আব্বার নাম সা'দত আলী আখন্দ। বাংলাদেশে এককালে মুসলিম সাহিত্যিক হিসাবে আব্বার বেশ নামডাক হয়েছিল। তাঁর লেখা বই 'তরুণ মুসলিম' তিরিশোত্তর বঙ্গীয় মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আমার আব্বা আর চট্টগ্রাম কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেসের তৎকালীন মালিক মরহুম আবদুল খালেকের (ইঞ্জিনিয়ার সাহেব) প্রচেষ্টায় ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদের চট্টগ্রাম শাখার সম্মেলনে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম যোগদান করেছিলেন। মরহুম আবদুল খালেক চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। তিরিশোত্তর যুগে আব্বার লেখা প্রবন্ধাদি প্রায়ই 'মাসিক সওগাতে' প্রকাশিত হতো। অবশ্য এর মধ্যে প্রায় লেখাই ছিল ইতিহাসের উপর গবেষণামূলক। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল মোগল-পাঠানের লড়াই, বাংলার বার ভুঁইয়া,

শহীদ তিতুমীর, খেলাফত আন্দোলন, বাংলাদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হওয়ার ইতিহাস ইত্যাদি ইত্যাদি। আব্বা ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও 'ব্যাকিং'-এর অভাবে দারোগার চাকুরী নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাহোক্ চট্টগ্রাম থেকে বদলী হবার পর সম্ভবত চাকরীর খাতিরেই আব্বার সাহিত্য সাধনায় বেশ ভাটা পড়েছিল। কিন্তু তবুও তাঁর কাছে মাঝে মাঝে চিঠি লিখে কয়েকজন তাঁকে সাহিত্য সেবায় উৎসাহিত করতেন। এর মধ্যে সওগাত সম্পাদক নাসিরুদ্দিন সাহেব এবং পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের প্রাক্তন স্পীকার আবদুল হামিদ চৌধুরী অন্যতম। এ সময়ে মুসলিম মহিলা কবি বেগম এম হোসেনের (পরে বেগম সুফিয়া কামাল) লেখা প্রথম কবিতা প্রকাশিত হলে আব্বা সুদূর কক্সবাজার থেকে লেখিকাকে এক অভিনন্দন বাণী পাঠিয়েছিলেন। কবি এখনও সেই অভিনন্দনের কথা ভোলেন নাই। শুধু তাই-ই নয়, বছর দুয়েক আগে আব্বা চিকিৎসার জন্য ঢাকায় আসলে বেগম সুফিয়া কামাল খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন আব্বাকে দেখার জন্য। বেগম সুফিয়ার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য যে ক'জন শুভাকাঙ্ক্ষী চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে 'সওগাত' সম্পাদক নাসিরুদ্দিন সাহেব এবং আমার আব্বা ছিলেন অন্যতম। তাই নানা কারণে কবি আব্বাকে ভুলতে পারেননি। আর এদের ভাইবোনের সম্পর্ক এখনও এটুট রয়েছে।

টাঙ্গাইলে থাকার সময় একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সাহেব প্রায়ই আমাদের বাসায় আসতেন আর আব্বার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মুসলমানদের ইতিহাস আর বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়তেন। আম্মা কোনদিনই ভদ্রলোককে না খেয়ে যেতে দিতেন না। শেষে দেখতাম

অধ্যক্ষ সাহেব প্রায় শনিবারই আমাদের বাসায় এসে হাজির হতেন। এ হাজিরা এতোই নিয়ম-মাফিক হতো যে, কোন শনিবার অধ্যক্ষ সাহেব অনুপস্থিত থাকলে আমরা একটু অবাক হয়ে যেতাম বৈকী! আব্বা একদিন আমাদের ডাক দিয়ে বললেন, "জানিস, এই অধ্যক্ষ সাহেবের চেষ্টায় আর অমুকের টাকায় টাঙ্গাইলের গ্রামে একটা কলেজ চালু হয়েছে?" গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠতো এই ভেবে যে, বাংলাদেশে মুসলমান অধ্যক্ষ পরিচালিত কলেজও তাহলে আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনকার দিনে 'মুসলমানদের মধ্যে প্রথম' বলে একটা কথা চালু ছিল। কিন্তু একটু বড় হবার পর বুঝলাম যে, অনেক সময় ম্যাট্রিক পরীক্ষায় মুসলমানদের মধ্যে প্রথম ছাত্রটির স্থান, আসলে প্রথম একশজনের মধ্যে থাকত কিনা সন্দেহ।

যাহোক ১৯৪৯-৫০ সালে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ছি, তখন আব্বা এলেন ঢাকায় একটা কাজ হাতে নিয়ে। উনি তখন মাদারীপুরের এস. ডি. পি. ও। আব্বা এসে উঠলেন ইসলামপুরের পুলিশ ক্লাবে আর আমি থাকি ১১ নম্বর জয়নাগ রোডের ইকবাল হলে।

ঢাকায় তাঁর কাজ শেষ হবার পর আমায় বললেন, 'তোর কি মনে আছে টাঙ্গাইলের সেই অধ্যক্ষের কথা?' আমি বললাম, 'মনে থাকবে না কেন? বেশ মনে আছে। কতদিন উনি আমাদের বাসায় এসেছেন?'

আব্বা এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, 'চল না উনার সঙ্গে দেখা করে আসি?' আব্বার প্রস্তাবে অসম্মতি জানাবার ক্ষমতা নেই। তাই উৎসাহ প্রকাশ করে বলেই ফেললাম, 'উনি তো এখন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান।'

বেলা এগারটা নাগাদ আব্বার সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম বোর্ড অফিসের উপর তলায়। একটা স্লিপ দিয়ে দু'জনে বসে আছি। প্রায় মিনিট দশেক। ভিতরে যাবার ডাক এলো। আব্বার মুখটা

আনন্দে ঝলমল করছে। এমন সময় বেয়ারা এসে জানালো যে আমাদের আরো কিচ্ছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। মিনিট বিশেক অপেক্ষা করার পর ভিতরে যাবার ডাক এলো। ভিতরে ঢোকার সময় আমি ভাবছিলাম, একটু পরেই দুই বন্ধুর মিলনের এক আনন্দঘন পরিবেশ উপভোগ করবো। কিন্তু মুহূর্তকাল সময়ের মধ্যে আমি চিন্তার খেই হারিয়ে ফেললাম। শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের আসনে উপবিষ্ট অধ্যক্ষ আর টাঙ্গাইলের সেই অধ্যক্ষ সাহেবের কথাবার্তার কোন মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মনে হলো অনেকক্ষণ কষ্ট করে উনি আব্বাকে চিনতে পারলেন। আর পারতপক্ষে টাঙ্গাইলের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে প্রচেষ্ট হলেন। আব্বা ভদ্রতার মুখোশ বজায় রেখে, 'খোদা হাফেজ' বলে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে আসার পর আমাদের দু'জনের মধ্যে আর কোন কথাই হলো না। শুধু ভাবলাম ক্ষমতা মানুষকে কোন্ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে!

এ ঘটনার প্রায় বছর ছয়েক পরে আমি যখন 'ইত্তেফাক' পত্রিকার চীফ রিপোর্টার, তখন এক সন্ধ্যায় এক ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন অফিসে। পরিচয় দিয়ে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু আমি তাকে বসতে বলতে পারলাম না। না চেনার অজ্ঞতা প্রকাশ করে তার কার্ডটা ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে একমনে কাজ করে যেতে লাগলাম। অবশ্য উনি এসেছিলেন 'ইত্তেফাক' সম্পাদক তোফাজ্জল সাহেবের কাছে। পরে জেনেছিলাম যে তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করে আওয়ামী লীগের টিকেট নিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার উমেদারীতে এসেছেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকা পর্যন্ত ইনি মরহুম হোসেন সোহ্‌রাওয়ার্দীর ছত্রছায়ায় ছিলেন। আবার 'উন্নয়ন দশকে' ইনি ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের টিকিটে একবার পরিষদ সদস্য পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আমাদের জীবনটা ছিল অনেকটা বেদুঈনদের মত। আব্বার বদলীর নির্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাসার সব মালপত্র বাঁধতে হতো আর ধূমকেতুর মতো আমরা পাড়ি জমাতাম আবার নতুন জায়গার পানে। আমরা আর কখনই পেছনের দিকে ফিরে তাকাতাম না। তাই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার আগেই আমাকে বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে শুরু করে দিনাজপুর পর্যন্ত ন'টা হাই স্কুলে পড়তে হয়েছে। প্রতিটা স্কুলে নতুন বই, নতুন মুখ আর নতুন পরিবেশের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। কিন্তু আব্বার অমোঘ আইনকানুন আর নির্দেশের দরুন সব রকমের অসুবিধাই হজম করে নিয়েছি।

আজ প্রায় আটাশ বছর পর এ সব কথা লিখতে বসে দেখছি, অনেক কিছুই বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে। এখনও মাঝে মাঝে কোন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় কিংবা শিউলীঝরা সকালে এসব হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকে আমার মনের ছায়াপটে ফিরিয়ে আনবার কতই না চেষ্টা করছি। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই আমার বৃথা হয়ে যাচ্ছে। পিছনে ফেলে আসা অতীতের দিনগুলো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে।

১৯৪০ সালের মাঝামঝি আব্বা ময়মনসিংহে বদলী হয়ে এলেন। আমরা পাঁচ ভাই একই সঙ্গে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্তি হলাম। সে সময় এই ময়মনসিংহ জেলা স্কুল বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসাবে গণ্য ছিল। কিন্তু খেলাধূলায় এই স্কুল কোন সময়েই মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের সঙ্গে পেরে উঠতো না। আমরা জেলা স্কুলে ভর্তি হবার কয়েক মাস পরে একদিন বোর্ডে নোটিশ পড়লো লীলাদেবী শীল্ড খেলায় স্কুলের দল গঠনের জন্য। ময়মনসিংহের প্রখ্যাত মহারাজা সূর্যকান্ত প্রদত্ত এই লীলাদেবী শীল্ড জেলার আন্ত-স্কুল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। শুনলাম উপর্যুপরি সাত বছর যাবৎ জেলা স্কুল এই

শীল্ড জয়লাভ করতে সক্ষম হয়নি আর প্রতিবারেই মৃত্যুঞ্জয় স্কুল ফাইনালের খেলায় জেলা স্কুলকে হারিয়ে দিয়েছে। তাই এবার পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। এসময় এক মুসলমান ভদ্রলোক জেলা স্কুলে ড্রিল মাষ্টার ছিলেন। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান কোন বাছ-বিচার ছিল না। তিনি ছিলেন নিয়ম ও শৃঙ্খলার মূর্ত প্রতীক। তাই এই ড্রিল মাষ্টারের হাতে মার খায়নি, এমন ছেলের সংখ্যা এসময় জেলা স্কুলে খুব কমই ছিল।

পায়ে কেট্‌স্, পরনে হাফপ্যাণ্ট আর মুখে হুইসেল নিয়ে ড্রিল স্যার দাঁড়ালেন স্কুল মাঠের মাঝখানে। আর আমাদের শেখাতে শুরু করলেন ফুটবল খেলার নতুন নতুন কায়দাকানুন। শেষ পর্যন্ত স্কুলের চূড়ান্ত দল গঠন হলো। আমি আর মেজোভাই, (যিনি এখন খুলনায় সী-কাষ্টমস্-এর সিনিয়র প্রিভেণ্টিভ অফিসার) দু-জনেই দলে স্থান পেলাম। লীলাদেবী শীল্ড খেলায় সর্বোচ্চ চার ফুট আট ইঞ্চি মাপের ছেলেদের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হতো। আমাদের সেণ্টার হাফ শামসু মাপে বড় হবে আশংকায় কোমরে বেল্ট আর দড়ি কষে বেঁধে দম বন্ধ করে মাপের স্কেলে দাঁড় করিয়ে পার করানো হলো।

শেষ পর্যন্ত আবার মৃত্যুঞ্জয় আর জেলা স্কুল ফাইনালে উঠলো। এসময় মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় আঠারোশ' আর আমাদের স্কুলের মাত্র সাড়ে চারশ'। যাহোক ড্রিল স্যার আমাদের প্রতিদিন সকালে স্কুলের মাঠে জোর প্র্যাকটিস করাতে লাগলেন। এ খেলা যেন তাঁর কাছে জীবনমরণের প্রশ্ন। ফাইনালে আমাদের স্কুলের টীম গঠন করা হলো। আমার মেজোভাই সেণ্টার ফরোয়ার্ডের জন্য নির্বাচিত হলেন। কেননা ওর মত সুযোগ-সন্ধানী ফরোয়ার্ড খুব কমই ছিল। হর্ষব্রত লেফ্‌ট-ব্যাকে, শামসু সেণ্টার-হাফ। কিন্তু মুস্কিল বাধল আমাকে নিয়ে। কেননা আমার ইচ্ছে আমি রাইট-আউটে খেলবো, কিন্তু ড্রিল স্যার আমাকে

রাইট-হাফে খেলাবেন। স্যার আমাকে বললেন, 'তোমাকে রেখেছি পটলাকে আটকাবার জন্য। তুমি ছাড়া ওদের এই লেফ্‌ট-আউটে পটলাকে আর কেউই আটকাতে পারবে না।' ড্রিল স্যারের এই কথায় কাজ হলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে রাইট-হাফে খেলতে রাজী হলাম। কিন্তু বুকে সাহস সঞ্চয় করে স্যারকে বললাম, 'পটলাকে আটকাবার দায়িত্ব যখন দিয়েছেন, তখন তা' আমি পালন করবোই—বাকীটা কিন্তু সামলানোর দায়িত্ব আপনার।'

স্কুল-টিমে দু'ভাই স্থান পাওয়ার কথাটা আমরা সবাই বাসায় চেপে গেলাম। কেননা আমাদের স্থির বিশ্বাস, আব্বা একথা জানতে পারলেই আমাদের খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। কোন রকমের খেলাই তাঁর কাছে পছন্দ নয়। তাঁর কাছে জীবনের একমাত্র আরাধ্য জিনিসই হচ্ছে পড়াশুনা। তিনি নিজেও সারাটা জীবন পড়াশুনা করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে অনুশীলন আর যুগান্তর পার্টির সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বৃটিশ সরকার যখন তটস্থ হয়ে উঠেছে, তখন অর্থাৎ ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত আব্বা কলকাতার আই, বি-তে চাকুরী করার সময় রিপন ল' কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। অবশ্য এতে করে তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মারার চেষ্টা করেছিলেন। উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিলেন যে, বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী ছেলে রিপন ল'র ছাত্র। তাই এদের কার্যকলাপ জানতে হলে ল'র ছাত্র হিসেবে রিপনে ভর্তি হতে হবে। আর অন্যদিকে চাকুরী ছেড়ে ভবিষ্যতে ওকালতি করার জন্য তাঁর মনে যে ইচ্ছা বহুদিন থেকে পোষণ করছিলেন, তা' কার্যকরী হবার রাস্তা দেখে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩১-৩২ সালে আব্বা বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এরপর তাঁর পক্ষে চাকুরী ছেড়ে ওকালতির অনিশ্চিত জীবনে ঢোকবার সাহস হয়নি। কেননা, তিনি তখন চার সন্তানের জনক। উপরন্তু দু'

দুটো ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ তাঁকেই বহন করতে হতো। অবশ্য সুদীর্ঘ ৩১ বছর চাকুরীর পর অবসর গ্রহণ করে তিনি ওকালতি পেশায় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বছর আটেকের বেশী ওকালতি করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। বার্ধক্য আর জরা এসে তাঁকে ঘিরে ধরেছে। তবুও জীবনে ওকালতি করার জেদ তিনি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু আর এক জায়গায় তিনি ঘটনাচক্রে বিজয়ী হতে পারেননি। সেটা হচ্ছে বি. এল পাশ করার পর তার ইচ্ছে ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এল পাশ করার। এজন্য তিনি বহু বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবারেই একটা না একটা ঘটনা এসে তাঁর প্রচেষ্টা পিছিয়ে দিয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশে একমাত্র মরহুম আবুল হোসেন ছাড়া আর কোন মুসলমান ছেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। দুর্ভাগ্যবশত জনাব আবুল হোসেন পাকিস্তান কায়েম হবার আগেই কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকাকালীন অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি একজন প্রতিষ্ঠাবান কবিও ছিলেন।

যাহোক, আব্বা এম. এল পরীক্ষা দিতে না পারলেও প্রতিটা দিন ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে বছরের পর বছর পড়াশুনা করে গেছেন। আর মাঝে মধ্যে কলকাতা গেলে ছেলেমেয়েদের কিংবা স্ত্রীর জন্য কিছু কেনার বদলে সে পয়সায় কলেজ ষ্ট্রীট-বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট থেকে পুরনো আইনের বস্তাবন্দী বই কিনে নিয়ে এসেছেন। এতে আমরা মনে দুঃখ পেলেও মুখ ফুটে কখনও কিছু বলতে পারিনি।

সেদিন ছিল শনিবার। আমাদের স্কুলের মাঠ লোকে লোকারণ্য। এদিকে মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের অসংখ্য সমর্থকরা হৈ চৈ করছে। আর একদিকে আমাদের স্কুলের ছাত্র আর শিক্ষকরা

আমাদের সাহস যোগাচ্ছে। ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু আমি নিবিষ্ট মনে খালি পটলাকে আটকাবার কথাই চিন্তা করে চলেছি। খেলা শুরু হবার প্রায় মিনিট দুয়েকের পর দেখি পটলার পায়ে বল। আমি তার সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দিতে গিয়ে দেখি একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। ছোকড়া বলটাকে টোকা মেরে আমার হাঁটুর ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে লাইন বরাবর দৌড়ে গিয়ে গোলে শট নিলো। কিন্তু অল্পের জন্য তা বারের উপর দিয়ে গেল। মিনিট তিনেক পর আবার দেখলাম পটলা বল নিয়ে আসছে। এবার তাকে হিল চার্জ করলাম, কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। পটলা এবার গোলে কিক না করে বলটা সুদ্ধ একেবারে গোলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। চারদিকে গগনবিদারী শব্দে মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের সমর্থকরা ফেটে পড়লো। আমরা এক গোলে পিছিয়ে পড়লাম। খেলা চলার প্রায় পনর মিনিট পর আবার দেখলাম পটলা এগিয়ে আসছে। এবার আমি পটলার উরুদেশ লক্ষ্য করে চার্জ করলাম। ওতেই কাজ হলো। প্রথমে পটলা কাটা মুরগীর মতো মাঠে শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। এরপর প্রচণ্ড ব্যথায় ওর দেহটা কুঁকড়ে গেল। খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল। আর আমি ধীর পদক্ষেপে আমাদের সমর্থকদের পাশটায় এসে দাঁড়ালাম। রেফারী দৌড়ে এসে আমাকে ওয়ার্নিং দিয়ে ফাউল কিকের নির্দেশ দিলেন।

খেলা আবার শুরু হবার পর দেখলাম, অনেক কষ্টে পটলা মাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন আর তাকে খেলোয়াড় না বলে 'প্যাসেঞ্জার' বললেই চলে। চার পাঁচ হাত দূর দিয়ে বল গেলেও দৌড় দিয়ে বল ধরার শক্তি আর তার নেই। বিরতির পর খেলার মোড় ঘুরে গেল। আমরা খুবই চেপে খেলতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা পর পর দুটো গোল করলাম। গোলদাতা আমার মেজোভাই স্বয়ং। পটলার এই দুরবস্থার জন্য সেদিন খুশী

হলেও আজ ২৮।২৯ বছর পর ব্যথায় আমার মনটা ভরে উঠে বৈকী। এখনও ব্যথায় বিবর্ণ পটলার মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মাত্র দেড় বছর পর এক নৌকাডুবিতে পটলার মৃত্যু হয়।

খেলা শেষ হবার পর আমাদের স্কুলের ছাত্রদের হিপ্ হিপ্ হুর্রে আওয়াজে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। ড্রিল স্যার সঙ্গে সঙ্গে একটা হ্যাজাক আর ট্রাক ভাড়া করতে লোক পাঠালেন। সুদীর্ঘ সাত বছর পর লীলাদেবী শীল্ডের বুকে আবার জেলা স্কুলের নাম খোদাই হবে ভেবে আনন্দে আমাদের বুক ভরে উঠলো। এতসব হৈচৈ-এর মধ্যে কখন যে রাতের ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে তা টেরই পাইনি। যখন টের পেলাম তখন আর শোধরাবার সময় নেই। দুই ভাই কাউকে কিছু না বলে জেলা স্কুলের দেয়াল টপকে দৌড় দিলাম কাঁচিঝুলির বাসার দিকে। যখন বাসায় গিয়ে দম ফেললাম, তখন দেখলাম আমরা দুজনেই যাঁকে যমদূতের মতো ভয় করে এসেছি, সেই জন্মদাতার হাতের মুঠোর মধ্যে। তারপর শুরু হলো আমাদের উপর মার। সে মারের কোন মা-বাপ নেই। পুলিশের হান্টারের মার যে না খেয়েছে, তাকে এ মারের কথা বুঝানো মুস্কিল। মিনিট পনর পর যখন আব্বার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম, তখন আমি চারিদিকে কেবল হলুদ দেখছি। এ অবস্থায় ভাত না খেয়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম। এ সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটেছে আব্বার একটি মাত্র নির্দেশ অমান্য করার জন্য। সেটা হচ্ছে মগরেবের নামাজের পরেই তিনি সমস্ত ছেলেদের বাসায় হাজির দেখতে চান।

মাত্র ২৮ বছর পর সেদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে কর্মক্লান্ত অবস্থায় ফিরে আসবার পর একমাত্র সন্তানকে অনুপস্থিত দেখে কাপড় না ছেড়েই তাকে খুঁজতে বেরুলাম। আধ ঘন্টা পর গুণধর সন্তানকে ঢাকেশ্বরী কলোনীর এক বাসা থেকে উদ্ধার করলাম।

উনি তখন সেই বাসায় তার বন্ধুর সঙ্গে ক্যারাম খেলছিলেন। আমাকে দেখে বিরক্তিতে তার মুখ ভরে গেল। হাজার হলেও আমি তার পিতা। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আমার সঙ্গে বাসায় ফিরে এলো। কিন্তু আর পড়ার টেবিলে নয়। একবারে গিয়ে সে বসলো টেলিভিশনের সামনে। আর আমি চোখের পানি আটকাতে বাড়ীর ভেতরে চলে গেলাম। মাত্র তিন যুগের ব্যবধানে ওয়াজেদ আলীর ভারতবর্ষের ট্র্যাডিশন আর সামনে চলছে কই? সবই তো বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ একেবারে আমাদের ঘরের দরজায় এসে পড়ল। খবরের কাগজে দেখলাম আক্রমণকারী জাপানীদের হাতে রেঙ্গুনের পতন হয়েছে। এরপর জাপানীরা তাদের এতদিনকার স্বপ্ন ভারত উপমহাদেশ কব্জা করার উদ্দেশ্যে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসতে লাগলো। আর এদিকে মিত্রবাহিনী সমানে 'সাফল্যজনকভাবে' পশ্চাদপসরণ করেই চলেছে। সমস্ত বর্মা দখলের জন্য জাপানীদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি বললেই চলে। রেঙ্গুন শহরের উপর কয়েক দফা বিমান আক্রমণেই কাজ হলো। রেঙ্গুনের শত শত বাড়ীতে সাদা নিশান উড়িয়ে দিল আর বোমার ভয়ে হাজারে হাজারে বর্মী জনতা বাড়ীর বাইরে এসে খোলা মাঠে আশ্রয় নিল। এতে করে জাপানীরা বোমার খরচ কমিয়ে রেঙ্গুন দখলের সময় বিমান থেকে খালি মেশিনগানের গুলী ব্যবহার করে আশাতীত ফল লাভ করলো। এর সাথে সাথে জাপানী সৈন্যরা বর্মী জেলেনৌকা দখল করে বর্মার অভ্যন্তরে বিনাবাধায় ছড়িয়ে পড়লো।

অন্যদিকে বর্মায় বসবাসকারী ভারতীয়রা আর কিছুসংখ্যক বৃটিশ-অনুগত বর্মী নাগরিক উত্তর-পশ্চিম বর্মার শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যের মাঝ দিয়ে পায়ে হেঁটে বাংলাদেশের দিকে পাড়ি জমালো। কিন্তু পথে কত লোক যে জীর্ণ, শীর্ণ, ক্লান্ত অবস্থায়

ইহলোকের মায়া ত্যাগ করলো, আর কতো লোক যে হিংস্র পশুর হাতে প্রাণ দিলো তা বলা দুষ্কর। বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে যে ক'জন বর্মী উদ্বাস্তু বাংলাদেশে এসে হাজির হলো, বৃটিশ সরকার তাদের সাদরে গ্রহণ করলো। কেননা বৃটিশকে সভ্য জগতের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে অনুগত লোকদের জন্য বৃটিশ কত বেশী উদ্বিগ্ন থাকে আর তারা বিপদের দিনে সাহায্যের জন্য কিভাবে এগিয়ে আসে। যাহোক, বাংলাদেশে পৌঁছবার পর ভারতীয় উদ্বাস্তুরা নিজেরাই নিজেদের পথ বেছে নিয়ে জনসমুদ্রে হারিয়ে গেল। এদের মধ্যে প্রায় সবাই বর্মায় ভাল রকমের সম্পত্তির অধিকারী ছিল। বলতে গেলে এরা রাতারাতিই নিঃস্ব হয়ে যায়। কিন্তু বৃটিশ সরকার এদের পুনর্বাসনের জন্য একটা ঘষা পয়সাও খরচ করেনি। কিন্তু বর্মী উদ্বাস্তুদের জন্য উত্তরবঙ্গে বেশ কয়টি ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হল। এসব ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের আরাম আয়েশের জন্য বৃটিশ সরকার অকাতরে পয়সা খরচের ব্যবস্থা করলেন। ক্যাম্পগুলো স্থাপনের পর দেখা গেল যে, কলকাতা থেকে বড় বড় সরকারী কর্মচারী আর রাজপুরুষেরা প্রায়ই ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। এদের আগমন উপলক্ষে ক্যাম্পের অধিকর্তারা বর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত বর্মী যোড়শীদের নৃত্যে বিমুগ্ধ সরকারী কর্মচারীদের সফরসূচী থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা বাদ হয়ে যেতে লাগলো। আর রক্ষকরাই অবশেষে ভক্ষক হয়ে দাঁড়ালো। ক্যাম্পের অধিকর্তা এ অবস্থার পুরো সুযোগ গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে হিসেব করে দেখা গেল যে কয়েক কোটি টাকার গরমিল হয়েছে। এটাই বিখ্যাত এস. কে. ঘোষ, আই-সি-এস মামলা হিসেবে খবরের কাগজের পাতায় দিনের পর দিন ধরে প্রকাশ পেয়েছিল। অবশ্য মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কয়েকজনের শাস্তিও হয়েছিল। ভালো করে পর্যালোচনা

করে মিত্রশক্তি বাংলাদেশে জাপানীদের সঙ্গে একটা ভালো রকমের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এর ফল হিসেবে আইন করে বাংলাদেশের প্রায় আট লাখ দেশী নৌকা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। জাপানী সৈন্যরা যাতে করে ভারী যানের অনুপযোগী পূর্ব বাংলায় দেশী নৌকা অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তারই জন্য নৌকা পোড়ানোর আইন করা হয়েছিল। উপরন্তু পশ্চিমাঞ্চল থেকে হাজারে হাজারে ট্রেন ভর্তি সৈন্য এসে হাজির হলো বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে। এর মধ্যে কলিকাতার খিদিরপুর ডক এলাকা আর চট্টগ্রাম ডকে জাপানী বিমান হামলা শুরু করলো। ফলে কলিকাতার বেসামরিক লোকেরা পশ্চিমের দিকে পাড়ি জমালো, আর পূর্ব বাংলার জেলা শহরগুলোতে অবস্থানকারী লোকেরা আশ্রয় নিল গ্রামাঞ্চলের নিজেদের পৈতৃক বাস্তুভিটায়।

মনে হলো মহাযুদ্ধ একটা হিংস্র দানবের মতো মানব সভ্যতার সব কিছু নিদর্শনকে নিশ্চিহ্ন করে ঝড়ের বেগে আমাদের গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধ্বংস আর হত্যাযজ্ঞের পর জাপানীরা এখন এসে আমাদের দুয়ারে আঘাত হেনেছে। ভীতসন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষ কেবল পালানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এসময়ে আব্বার মুখে শোনা একটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। রহমান সাহেব নামে এক দারোগাকে কক্সবাজার মহকুমার টেকনাফ থানায় বদলী করা হয়েছিল।

টেকনাফে জয়েন করার আগে ওপরওয়ালা রহমান সাহেবকে একটা সীলমোহর করা খাম দিয়ে জানালো যে, জাপানী আক্রমণের মুখে থানার ইনচার্জ হিসাবে তার কি কি কর্তব্য সবই এ'খামে লেখা রয়েছে। একদিন সন্ধ্যায় থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রহমান সাহেব নদীর ওপারটা লক্ষ্য করতে লাগলেন। তার মনে হলো যেন জাপানীরা ওপারে কামান সাজাতে ব্যস্ত রয়েছে। মুহূর্তে ভয়ে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো। তিনি অনেক কষ্টে মাল-

খানা থেকে ওপরওয়ালার দেয়া সেই খাম খুলে ফেললেন। দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে যে 'জাপানীদের হামলা শুরু হয়ে থানার পতন আসন্ন দেখলে থানার রেকর্ডপত্রসহ থানা জ্বালিয়ে দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই যেন এসব রেকর্ডপত্র শত্রুর হাতে না পড়ে।' আর যায় কোথায়! রহমান সাহেব তক্ষুণি এ. এস. আই. আর কনষ্টেবলদের ডেকে থানার সমস্ত রেকর্ডপত্র বারান্দায় একত্র করার হুকুম দিলেন। তারপর লাল কেরোসিন ঢেলে তাতে লাগানো হলো আগুন। রাতের ঘন অন্ধকারের বুক চিরে আগুনের লেলিহান শিখায় টেকনাফের আকাশ লাল হয়ে উঠলো। আর সাহেব থানার সব স্টাফকে কক্সবাজারে রিপোর্ট করতে বলে নিজে একটা ঘোড়ার পিঠে বেরুলেন কক্সবাজারের দিকে। কক্সবাজারের এস-ডি-ও সব ঘটনা শোনবার পর রহমান সাহেবকে জেলা সদরে রিপোর্ট করবার নির্দেশ দিলেন। কক্সবাজারে পৌছবার পর রহমান সাহেবের বোধগম্য হলো যে, জাপানীরা এখনও পর্যন্ত বর্মা সীমান্তই অতিক্রম করেনি। বাংলাদেশে ঢোকার আগে জাপানীরা এখন নিজেদের শক্তির একটা সামঞ্জস্য বিধান করছে মাত্র। তাই শেষ পর্যন্ত 'বলির পাঁঠার' মত রহমান সাহেব জেলা সদরে গিয়ে হাজির হলেন পুলিশ সুপারের কাছে। সুপার সাহেব ডি. এম-এর সঙ্গে পরামর্শ করে সঙ্গে সঙ্গে খবরটা পাঠিয়ে দিলেন কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ। সমস্ত ঘটনাই কর্তৃপক্ষকে খুবই চিন্তিত করে তুললো। শেষে তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন যে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রিম নির্দেশ এস-ডি-ওর নীচে কোন অফিসারের হাতে দেওয়া উচিত নয়। থানার দারোগাদের হাতে দেয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। তাই রহমান সাহেবকে কর্তৃপক্ষ একটা ওয়ার্নিং দিয়ে সুদূর রংপুর জেলার গ্রামাঞ্চলের থানায় বদলী করে দিলেন। এরপর মাত্র ২৫ ঘণ্টার মধ্যে রহমান সাহেব চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। কিন্তু এতো অল্প সময়ের মধ্যেও

তিনি চট্টগ্রাম পুলিশ ক্লাবে একটা মিলাদ মহফিলের আয়োজন করেছিলেন। এ ঘটনার প্রায় ২৪ বৎসর পর চীন-ভারত যুদ্ধের সময় আসামের এক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট চীনাদের অগ্রসরের খবরে কোন রকম নির্দেশ ছাড়াই ট্রেজারী জ্বালিয়ে আর জেলখানা খুলে দিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। অবশ্য এর ফল হিসেবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে চাকুরী হারাতে হয়েছিল।

এদিকে ময়মনসিংহ থেকে বেসামরিক লোকেরা যুদ্ধের আশঙ্কায় ভেগে যেতে শুরু করলো। আর একদিকে মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনীতে ময়মনসিংহ শহরের উপকণ্ঠ ভরে উঠলো। কংগ্রেসের '৪২-এর আন্দোলনের জের তখনও শেষ হয়নি। এ সময়ের ময়মনসিংহের দুটো ঘটনার কথা এখনও স্পষ্ট মনে রয়েছে। সেদিন ছিল শনিবার। বিকেলে আনন্দমোহন কলেজের মাঠে ফুটবল খেলার পর একটা বছর বারোর ফুটফুটে সুন্দর ছেলে কলেজ রোড দিয়ে বাসায় ফিরছিল। কিন্তু তার আর কোনদিনই বাসায় ফেরা হয়নি। দানবীয় আকারের একটা সামরিক ট্রাক ছেলেটাকে মুহূর্তের মধ্যে পিষে চলে গেল রেল ষ্টেশনের দিকে। ঘটনাটা ঘটেছিল ছেলেটির বাসার কাছেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার মা-বাপ ভাইবোনের দল হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো রক্তাক্ত মরা লাশটার উপর। সেকি এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! আমরা ক'ভাই আর দেরী না করে কাঁচিঝুলির বাসার দিকে রওয়ানা হলাম। পরদিন শহরে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। সামরিক বাহিনীর ট্রাকটা আগের দিন বিকেলে ছেলেটাকে চাপা দিয়ে ষ্টেশনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন সন্ধ্যায় মগরেবের আজান পড়ছে। এমন সময় কে বা কারা ট্রাকের ড্রাইভারকে তার সিটে বসা অবস্থায় হত্যা করেছে তা কেউই বলতে পারে না। পরে জানতে পেরেছিলাম, নিহত ছেলেটার বড়ভাই অনুশীলন সন্ত্রাসবাদী দলের একজন সদস্য আর তার নামে আগে থেকেই হুলিয়া রয়েছে।

এর মাসখানেক সময়ের মধ্যে আমাদের কাঁচিঝুলি পাড়াতেই একটা ঘটনায় সবাইকে স্তম্ভিত করে দিলো। ভর দুপুরে দুজন সৈন্য একটা রিক্সাওয়ালার বাড়ীতে ঢুকে তাদের জৈবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থে লিপ্ত হয়েছিল। কাঁচিঝুলিপাড়ার সরদারের কাছে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর গিয়ে পৌঁছাতেই তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। এই সরদার সাহেবের প্রতাপ ছিল অপরিসীম। মহল্লার ছোট ছোট ঝগড়া-বিবাদ সবই তিনি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি করে দিতেন, কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন পঙ্গু। তা হলে কী হবে! তার অসাধ্য কাজ ছিল না বললেই চলে। তাই সৈন্যদের কুকীর্তির খবর পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুকুম দিলেন যে, এ দুজন যেন মহল্লার বাইরে যেতে না পারে। এরপর জানতে পেরেছিলাম যে সেই দুজন আর কোনদিনই ডেরায় ফিরে যেতে পারেনি। বহু চেষ্টার পরও এর কোন কুলকিনারা করতে না পেরে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটা আপোষের ব্যবস্থা হয়েছিল। আর এ আপোষের পর ময়মনসিংহে এধরনের আর কোন ঘটনা হয়নি। কিন্তু এর বছর দেড়েক পরই চট্টগ্রামের কাহারপাড়ায় এরকমেরই একটা বীভৎস ঘটনা ঘটেছিল। যার তুলনা সভ্য জগতে বিরল। চট্টগ্রামের কাহারপাড়া মুসলিমপ্রধান ছিল বলে তখন বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দল বৃটিশ সরকারের কাছে প্রতিবাদ করেনি। অবশ্য মুসলিম লীগ সক্রিয়ভাবে সমস্ত বাংলাদেশে এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। আর দৈনিক আজাদের মরহুম মাওলানা আকরাম খাঁর উদ্যোগে 'কাহারপাড়া রিলিফ ফাণ্ড' নামে একটা তহবিল গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক মরহুম তোফাজ্জল হোসেন এ তহবিল সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন।

দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া সমস্ত বাংলাদেশটাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। মাত্র বছরখানেক সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ৫০

লাখ লোক অনাহারে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিল। এটাই ইতিহাসের পাতায় তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ হিসাবে স্থান লাভ করলো। এই দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের কত কত পিতা যে নিজের সন্তানকে বিক্রি করেছে, কত বধূ যে তার স্বামী ত্যাগ করেছে, আর কত নারী যে তার সতীত্ব বিসর্জন দিয়েছে, তার সঠিক হিসাব পাওয়া মুস্কিল। এক মুঠো ভাতের অন্য এসব কাজ করতে হয়েছে। এ দুর্ভিক্ষে কত লাখ পরিবার যে ছিন্নমূল বাস্তহারায় পরিণত হয়েছিল, তার হিসেব ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি।

অন্য সব জায়গার মতো ময়মনসিংহেও চালের দর হু হু করে বাড়তে লাগলো। একদিন বিকেলে আমি আর আমার মেজোভাই নতুন বাজারে গিয়ে অন্য সব জিনিস কেনা বাদ দিয়ে পনেরো টাকায় মাত্র পাঁচ সের চাল কিনে বাসায় ফিরে এলাম। প্রকৃতপক্ষে এদিন থেকেই শুরু হলো আমাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

সেদিন রাতেই আব্বা তাঁর সমস্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিটিংএ বসলেন। তিনি বললেন, যে নীতিবোধের জন্য তিনি পুলিশে চাকুরী করেও সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে পেরেছেন, যে নীতিবোধের জন্য তিনি গর্ব অনুভব করেন, সেই নীতিবোধকে তিনি কিছুতেই বিসর্জন দিবেন না। আমরা বড় তিন ছেলে তাকে নানাভাবে আয় বাড়াবার জন্য প্রলুব্ধ করলাম আর নিকট ভবিষ্যতের আরও ভয়াবহ দিনের কথা বার বার করে উল্লেখ করলাম। কিন্তু তিনি হিমাচলের মতই তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। আব্বা পরিষ্কার জানালেন যে, তিনি তাঁর নীতিবোধকে কিছুতেই বিসর্জন দিবেন না। আমি আর মেজোভাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম যে, এতোই যদি নীতিবোধ রয়েছে তো বৃটিশ আমলে দারোগার চাকুরী নিয়েছিলেন কেন?

বড়ভাই আব্বাকে প্রশ্ন করলো, "তাহলে সংসার কীভাবে চালাবেন?" আব্বা বললেন, "তোমরা কিছুটা সহযোগিতা আর

কষ্ট করলেই তা সম্ভব।" এরপর তিনি বলে চললেন তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনার কথা। যার ফল হিসাবে তার পর দুটো চাকর চাকরাণীকেই বিদেয় করা হলো। আর আমরা ক'ভাই বাসার সব কাজ ভাগ করে নিলাম। মেজোভাই নিল রান্নাবান্না ও খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব। আমার ঘাড়ে পড়লো বাসার সমস্ত কাপড়-চোপড় আর কাঁথা ধোয়ার দায়িত্ব। আর পিঠের ছোট ভাইটা পেলো বাড়ী-ঘর-উঠান আর নর্দমা পরিষ্কারের কাজ। আমাদের পাঁচ নম্বর ভাই বিকেলে দুটো ছোট ভাইবোনকে মুখ হাত পরিষ্কার করে প্যারাম্বুলেটারে মাঠে বেড়ানোর কাজ পেলো। বড়ভাই তখন আনন্দমোহন কলেজে আই. এস-সি পড়ে বলে বাসার কাজের হাত থেকে তাকে রেহাই দেয়া হলো, কিন্তু এতো করেও বোধহয় শেষরক্ষা আর হয় না। শেষে আমরা ভাত ভাগ করে খেতে শুরু করলাম। আব্বার মুখটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসতে লাগলো।

একদিন হঠাৎ আমরা খবর পেলাম এ. আর. পি. থেকে কন্ট্রোলে চাল দেয়া হবে। মাথাপিছু টাকায় দু'সের করে। তবে ময়মনসিংহ টাউন হল ময়দানে লাইনে দাঁড়াতে হবে। শহরে তখন চাল নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে তার দাম প্রতি মণ সোয়া শ' টাকা করে। কচুরমুখী আর মিষ্টি আলুর দর গিয়ে দাঁড়ালো চল্লিশ টাকায়। শহরের রাস্তার পাশে, খালি বারান্দায় আর রেলওয়ে প্লাটফর্মে আদম সন্তানদের লাশ পড়ে থাকতে দেখতে পেলাম। ডাষ্টবিনে শুরু হলো মানুষ আর চতুষ্পদ জন্তুর মারামারি। নিরন্নদের আর্তনাদে চারদিক বিষন্নতায় ভরপুর হয়ে উঠলো। এমনি এক পরিবেশে আমরা তিন ভাই ঝোলা হাতে চললাম টাউন হল ময়দানে। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। বিরাট বড় লাইন পড়েছে। অত্যন্ত মন্থরগতিতে লাইন এগিয়ে চলেছে। মনে হলো এ লাইন যেন সীমাহীন—এর শেষ নাই। আমরা

তিন ভাই এ লাইনে শরীক হলাম। দুপুরের পর বিকেল আর বিকেলের পর সন্ধ্যা, এরপর রাতের ঘন অন্ধকার নেমে এলো ধরণীর বুকে। যুদ্ধের দরুন ব্ল্যাক-আউট থাকায় সে অন্ধকার আরও বীভৎস আকার ধারণ করলো। মনে হলো আমরা যেন অসংখ্য প্রেতাত্মা লাইন করে এগিয়ে চলেছি আর মনে মনে ভাবছি কখন আমাদের ডাক আসবে। কিন্তু সময় আর কাটতে চায় না। ঘুমে আমাদের চোখ জড়িয়ে আসতে লাগলো। সে এক দুর্বিষহ অবস্থা। ধীরে ধীরে কালরাত্রির অবসান হ'লো। দেখতে পেলাম সুবেহ্ সাদেকের আলো পৃথিবীর বুকে এসে পড়তে শুরু করেছে আর আমরা তিন ভাই গিয়ে হাজির হয়েছি একেবারে লাইনের মাথায়।

একটা দৃশ্য দেখে আমরা হতবাক্ হয়ে গেলাম। জনা দশ-বারো এ. আর. পি-র জোয়ান বুট পরে বরফের মত চাঁই করা এক গাদা চালের উপর লাফাচ্ছে। আর তাতে কিছু চাল চাঁই থেকে বেরিয়ে আসছে। দাঁড়িপাল্লায় সেই চালই ওজন করে আমাদের ঝোলায় ঢুকিয়ে দিলো। লক্ষ্য করে দেখলাম বিবর্ণ চালের চাঁই-গুলোতে নীলাভ রঙ্গের শ্যাওলা পড়েছে। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলাম, তবুও তো এগুলো পেটের দানা। সকালে বাসায় ফেরার পথে আমাদের সেকি আনন্দ! আমরা আজ সফল হয়ে বাড়ী ফিরছি। তিন ভাইয়ের হাতে রয়েছে ছ' সের চাল, এটা কি একটা কম কথা! বাসায় ফিরে দেখলাম আব্বা বাসার সামনে পায়চারি করছেন আর অধীর আগ্রহে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। আমাদের দেখে শুধু বললেন, 'সন্ধ্যারাতে বাসায় ফিরে এলেই পারতিস'। আমরা তখন সমস্ত রাত্রি জাগরণ আর ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উঠেছি। মুখ ধুয়ে গুড় দিয়ে মিষ্টি আলু খেয়ে আমরা তিন ভাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আগের রাতটাই ছিল আমাদের জীবনের প্রথম রাত যে রাতটা আমরা বাসার বাইরে

কাটালাম। পরে জানতে পেরেছিলাম যে, সে রাতে আব্বা আম্মা দুজনেই বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিলেন। আর আব্বা দুবার আমাদের ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাতের অন্ধকার আর ভীড়ের মাঝে আমাদের খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি।

এ ঘটনার মাত্র দিনকয়েকের মধ্যেই বৃটিশ সরকার পুলিশ কর্মচারীদের পরিবারের সমস্ত সদস্যদের জন্য রেশনে চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, এমনকি সরিষার তৈল পর্যন্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন। এটাই সম্ভবত বাংলাদেশের প্রথম রেশনিং ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এ রেশনিং ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। পুলিশের কর্মচারীর জন্য রেশনিং ব্যবস্থা করায় আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এরপর পাড়ার লংগরখানার জন্য আমরাও মুষ্টিভিক্ষা দিতে সক্ষম হলাম। পাড়ার কিশোর ছেলেরা মিলে আমরা কাঁচিঝুলিতে একটা লংগরখানা খোলার ব্যবস্থা করেছিলাম। অবশ্য মোটামুটি সবাই আমাদের সাহায্য করতো। কিন্তু বিপদ দেখা দিলো আর এক জায়গায়। বহুদিন অনাহারে থাকার পর লংগরখানার 'লাপসি' পেটে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই তা সহ্য করতে পারলো না। ফলে অনাহারী লোকগুলো 'লাপসি' খাবার পরেই বমি করতো আর আমরা শত বারণ করা সত্ত্বেও এরা আবার সেই বমিই ভক্ষণ করতো। এ দৃশ্য যে না দেখেছে তার পক্ষে এ চিন্তা করা সম্ভব নয়। এখনও আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় এমনি একটা দৃশ্য জ্বলজ্বল করছে। একটা বুড়ী আমাদের কাঁচিঝুলির লংগরখানায় শানকি নিয়ে বসে রয়েছে 'লাপসির আশায়'। তার পাতে লাপসি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গোগ্রাসে খেতে লাগলো। কিন্তু খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী হর হর করে বমি করে দিলো। কিন্তু তারপর তার সে কি কান্না—'আমার ভাত আমারে ফিরিয়ে দাও।' বলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো, আবার হঠাৎ করে বুড়ী সেই বমি তুলে

খেতে শুরু করলো। সে এক বীভৎস দৃশ্য। দানবীয় ক্ষুধা মানুষকে কোন পর্যায়ে নিতে পারে তাও চিন্তার অতীত। বহুদিন অনাহারে থাকার পর হঠাৎ করে কিছু খাবার পেটে পড়লেই লোকগুলোর শরীরে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হতো। এর ফলে অনাহারী লোকগুলোর শুরু হলো দাস্ত। আর এতেই অনেকে পরপারে যেতে শুরু করলো। ডাক্তারের অভাবে আমরা এর কোন প্রতিকারই করতে পারলাম না। শুধু কবর দেয়ার জন্য আর শ্মশানে পোড়ানোর জন্য পাড়ায় ছুটো স্কোয়াডে একটু বয়স্ক আর সাহসী ছেলেদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। পরে জানলাম লাশগুলোকে ধর্মীয় অনুশাসন মোতাবেক ঠিক কবর দেয়া বা পোড়ানো সম্ভব হচ্ছে না, তাতে বহু টাকার দরকার। তাই কবর দেয়ার বদলে এক সঙ্গে দুই তিনটা করে লাশ মাটিতে পোতা হচ্ছে কিংবা শ্মশানে সের পাঁচেক লাক্‌ড়ী দিয়ে লাশগুলো আধপোড়া করে রেখে দেয়া হচ্ছে। চারিদিকে এক ভয়াবহ অবস্থা। স্কুল-কলেজ সব কিছুই অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে আছে। আর কঙ্কালসার মানুষের মিছিল গ্রামাঞ্চল থেকে এসে শহরে হাজির হচ্ছে দু'মুঠো অন্নের আশায়। রাস্তার পাশে মৃত মাতার বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে বাচ্চা দুধ খাবার চেষ্টা করছে। এ দৃশ্যও ময়মনসিংহ জেলায় বিরল নয়। এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের আসল চিত্র। যে দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে ময়মনসিংহের সন্তান জয়নুল আবেদীন শিল্পীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা আর নিজের উপলব্ধি দিয়ে পূর্ণভাবে অনুভব করার পরই জয়নুল আবেদীনের তুলির তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ অক্ষয় কীর্তি হিসাবে বেঁচে রইলো। এ দুর্ভিক্ষের আগুনে বাংলাদেশে পঞ্চাশ লাখ লোক আত্মাহুতি দিলো। তুলনামূলকভাবে আজকের দিনের বায়াফ্রার দুর্ভিক্ষের চেয়ে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ আরও ভয়াবহ ছিল। তাই ১৯৪৩ সালের ময়মনসিংহের কথা আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

যদি এ বছরটাকে ভুলতে হয়, তবে তো আমাকে বাংলাদেশকেই ভুলতে হবে। সেটা কী সম্ভব। সুদীর্ঘ ২৬ বছর পর এখন সংসারের আর্থিক অনটন দেখা দিলে শুধু বার বার আব্বার অসীম ধৈর্য আর নীতিবোধের কথাই মনে পড়ে। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় পুলিশের দারোগার চাকুরী করা সত্ত্বেও তিনি কেমন করে নিজের বিবেককে পরিষ্কার রাখতে পেরেছিলেন, তা ভাবতেই হতবাক্ হয়ে পড়ি। কোন শিক্ষার গুণে তিনি এতোবড় মনোবলের অধিকারী হয়েছিলেন, তা এখনও আমার বোধগম্য নয়।

রোজ সন্ধ্যার সময় আব্বা বাজারের হিসেব লিখতে বসতেন। এ হিসেব লেখা না হওয়া পর্যন্ত তিনি খেতে বসতেন না। অবশ্য তাঁর অভ্যাস এখন পর্যন্ত বজায় রয়েছে। শুধু যে হিসেব লেখা তাই নয়, হিসেবের মোট খরচের পর তাঁর তহবিলের মিল হতে হবে। আব্বার তহবিল মিল না হওয়া পর্যন্ত পড়ার টেবিলে বসেও আমরা ভয়ে অস্থির থাকতাম। আব্বা দৈনিক বাজারের হিসেব লেখা ছাড়াও মাসের শেষে সব যোগবিয়োগ করে মাসিক হিসেব বের করতেন। এখানেই শেষ নয়, অন্য মাসের খরচের সঙ্গে তার একটা তুলনামূলক চার্ট করে বলে দিতেন যে, এ মাসে কত টাকা খরচ বেশী হয়েছে আর বেশী খরচ হবার কারণটা কি। এ-ছাড়া আবার বছরের শেষে একই পদ্ধতিতে বছরের খরচের হিসেব বের করতেন। আগের বছরগুলোর সংগে তুলনামূলক চার্ট তৈরী করবার পর আব্বা আইটেম হিসেব খরচ আর দর বের করতেন। এ চার্ট দেখে তিনি বলে দিতে পারতেন যে, ১৯৩৪ সালে কলিকাতায় গড়ে চালের দর কি ছিল আর ১৯৩৬ সালে কক্সবাজারে চালের দর কত কমে ছিল আর ১৯৪৩ সালে ময়মনসিংহে তা বেড়ে কততে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খেসারীর ডাল, সরিষার তৈল, শুক্‌নো মরিচ—সব জিনিসেরই দামের তুলনামূলক চার্ট তিনি তৈরী করে ফেলতেন। শুধুমাত্র সীমিত আয়ের জন্যই যে তিনি

এটা করতেন তাই-ই নয়—এটা তাঁর একটা 'হবি'র মত ছিল। এতো হিসেব করে চলতেন বলেই ছোট ভাইদের লেখাপড়া বাবদ যে টাকা তিনি মাসে মাসে মণি-অর্ডারযোগে পাঠিয়েছেন তার রসিদগুলো সম্ভবত আজও তাঁর কাছে মজুদ রাখতে পেরেছেন। এ-টাকা তিনি ১৯২২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মোট কত টাকা তিনি ভাইদের দিয়েছেন তা তিনি বলে দিতে পারতেন।

ময়মনসিংহে এক প্রাইভেট টিউটার মাসের শেষ মাইনে নিয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর সংগে আব্বার কথা ছিল রোজ দু' ঘণ্টা—হপ্তায় এক রোজ ছুটি, মাসে দশ টাকা বেতন। কিন্তু মাসের শেষে বেচারা খাম খুলে দেখে মাত্র ৮ টাকা সোয়া পাঁচ আনা তাকে দেয়া হয়েছে। অবশ্য বেতন কাটার কারণগুলো একটা কাগজে লিখে টাকার সংগে মুড়ে রাখা ছিল। অনুপস্থিত দিনগুলোর মাইনে কাটা ছাড়াও কবে ১৫ মিনিট কম পড়িয়েছেন কিংবা কবে ৪০ মিনিট আগে চলে গিয়েছেন—সবই হিসেব করে কেটে রাখা হয়েছে। অবশ্য যেদিন তিনি আব্বাকে বলে আগে চলে গেছেন সেদিনের মাইনে কাটা হয়নি। কেননা এটা হচ্ছে মঞ্জুরীকৃত ছুটি। মাইনে পাওয়ার পর এতসব ব্যবস্থা দেখে মাস্টার মশাইয়ের মুখের অবস্থা যা হয়েছিল তা বর্ণনার বাইরে। এমন সময় আব্বা তাঁকে ডেকে বললেন, 'আমার ছেলেদের দু ঘণ্টার বেশী পড়ান,—এটা আমি যেমন চাই না, তেমনি কম সময় পড়ালে আমি মাইনে না কেটে পারি না,' এই বলে তাঁর ডাইরীটা এগিয়ে দিলেন। প্রতিটি পাতার মাথায় মন্তব্য লেখা রয়েছে। মাস্টার-মশাই আর কোন প্রশ্ন না করে আমাদের পড়াতে বসলেন। এর পর ঐ মাস্টারমশাই চাকরীতে বহাল থাকা পর্যন্ত আর কোনদিন অনুপস্থিত হননি বা কম সময় পড়িয়ে যাননি।

সমস্ত জীবনটাই আব্বা হিসেব করে চলেছেন। এত বেশী হিসেব করে চলেছেন যে তা সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে। বৃটিশ

আমলে দারোগাদেরই খুব ফিটফাট থাকতে হতো। আর তার অর্থই হচ্ছে ২-৩ দিন অন্তর অন্তর ধোপার ধোয়া কাপড় পরা, রোজ দাড়ি কামানো, আর প্রতি হপ্তায় চুল ছাঁটা। তখনকার দিনে মফস্বলশ হরে লণ্ড্রী ছিল না বললেই চলে। ধোপারা বাড়ী বাড়ী এসে কাপড় নিয়ে যেতো। দর ছিল টাকায় ২৫-৩০ খানা কাপড় ধোলাই। অবশ্য আজ সেটা টাকা টাকায় দাঁড়িয়েছে; আর রিক্সা ভাড়া করে কাপড় লণ্ড্রীতে দিয়ে আসতে হয় আবার নিয়েও আসতে হয়। ধোপার কাছে কাপড় দেয়ার সময় আব্বার কতকগুলো নিজস্ব নিয়ম ছিল, তার মধ্যে বোতাম কাটা ছিল অন্যতম। অর্থাৎ আব্বা তাঁর সার্ট, পেন্ট, বুশ-সার্ট, কোট ইত্যাদি ধোপার কাছে দেয়ার সময় বোতামগুলো কেটে একটা কৌটার মধ্যে রেখে দিতেন। কৌটার উপরে লেখা 'আমার বোতামের কৌটা'। আবার ধোপা বাড়ী থেকে কাপড়চোপড় আসার সংগে সংগে নিজে হাতে সে-সব বোতাম লাগাতেন। প্রতি দফায় আর বছরের পর বছর এমনি করে একত্রিশ বছর ধরে তিনি এ অভ্যেস বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই আব্বার অপরিসীম ধৈর্য আর হিসেবী মনের কথা চিন্তা করে এখনও হতবাক্ হয়ে যাই।

চুল ছাঁটার হিসেবটা চমৎকার। প্রতি রোববার আব্বা নিজের চুল ছাঁটাতেন। প্রতি পনেরো দিনে আমাদের একবার আর প্রতি মাসে চাকরদের একবার চুল ছাঁটতে হতো। এর জন্য মাস-করা নাপিত ছিল। চুল ছাঁটার স্টাইল খুবই সুন্দর। নাপিতের উপর কড়া হুকুম যে, এমনভাবে চুল ছাঁটতে হবে যাতে করে আর চিরুনীর দরকার না হয়। আমরা ঠাট্টা করে এর নাম রেখেছিলাম 'হাজী ছাঁট'।

আজকের দিনে একেই বোধ হয় 'ক্রু'কাট বলে। হাজী ছাঁটের মজা হচ্ছে যে, এর দরুন মাথায় আর তেল দেয়ার প্রয়োজন হতো না।

ময়মনসিংহে থাকার সময় আর একদিনের কথা ভোলার নয়। এ-দিন আমরা পাঁচ ভাই এক সংগে ত্যাজ্যপুত্র হয়েছিলাম। ঘটনাটা ঘটেছিল ঘোর বর্ষার সময়।

বাসার সব কাজকর্ম শেষ করে বিকেলে আমরা বড় পাঁচ ভাই গেছি আনন্দমোহন কলেজের মাঠে খেলার জন্য। কিন্তু তারপর শুরু হলো জোর বৃষ্টি। বৃষ্টির পানিতে ভেজা আব্বার আইনে এক মারাত্মক অপরাধ। আমরা সে-কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের সংগে বৃষ্টি আর কাদার মধ্যে ফুটবল খেলায় মাতোয়ারা হয়ে উঠলাম। এরপর খেলা শেষ করে ভর সন্ধ্যায় গেলাম কলেজের পুকুরে গোসল করতে। তখনও অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। রাত প্রায় সাড়ে সাতটা কি পৌনে আটটার সময় দুরু দুরু বক্ষে আমরা ক'ভাই বাসায় পৌঁছলাম। বাইরে থেকে দেখলাম বাসার দরজা-জানালা একেবারে বন্ধ। মুহূর্তে আমরা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলাম। কিন্তু এখন উপায়?

বাইরের যে ঘরে বড় ভাই একা থাকতেন আর পড়তেন, সে ঘরটায় একটা বিরাট তালা ঝুলছে। বুঝলাম আব্বা আমাদের ত্যাজ্যপুত্র করেছেন। কিন্তু এখন আমাদের মনে একটাই প্রশ্ন যে, রাত কাটাই কি করে? শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি করে আমরা দু'ভাই পাশের নায়েব সাহেবের বাসায় গেলাম চাবির খোঁজে। নায়েব সাহেব প্রায়ই জমিদারীতে খাজনা আদায়ের জন্য ব্যস্ত থাকেন। তাই তিনি সেদিন বাসায় অনুপস্থিত। ভদ্রলোকের চার বউ-এর তিনজন জীবিত। অনেক কষ্টে তিন জোড়া চাবি নিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করলাম। শেষ পর্যন্ত বাইরের ঘরের তালা খুলতে সক্ষম হলাম। এর পর আবার নায়েব সাহেবের বাসায় গিয়ে গোটা কয়েক লুংগি নিয়ে এলাম। একটা ছোট চৌকির উপর পাঁচ ভাই মিলে কোন রকমে রাত কাটালাম।

ভোর হতেই বাসার চাকর এসে জানিয়ে গেল যে, সবাইকে মুখ-হাত ধুয়ে যার যার পড়ার টেবিলে বসার আদেশ জারী

হয়েছে। মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা নির্দেশ মোতাবেক পড়ার টেবিলে হাজির হলাম। দেখলাম আব্বার টেবিলে আমাদের নাম লেখা পাঁচগোছা বেতই মজুত। আব্বা হ্যারিকেনটাকে নিবিয়ে গম্ভীর মুখে বসে রয়েছেন। বুঝলাম আব্বা তাঁর অভ্যাস-মত শেষরাতে পড়াশুনা করেছেন, আর সারা রাত আমরা যা করেছি সবই তিনি টের পেয়েছেন। হঠাৎ করে পড়ার টেবিলের ড্রয়ার খুলতেই আব্বা গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোদের আর পড়াব না, তাই বইপত্র সব সরিয়ে ফেলেছি।' ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধহয় এতটা হতবাক্ হতাম না। যে পড়াশুনা হচ্ছে আব্বার সারা জীবনের সাধনা, সেই পড়াশুনাই তিনি আমাদের বন্ধ করে দিলেন। এর পর তিনি বললেন, 'তোরা জীবনে কী করে খাবি তা' আজ আমাকে জানাতে হবে, সে-ভাবে তোদের তৈরী করে দিয়ে আমার কর্তব্য শেষ করতে চাই।'

প্রথমে ডাক পড়লো বড় ভাই-এর। তিনি তখন আনন্দমোহন কলেজে আই. এস-সি. পড়তেন। (বর্তমানে ইনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক) আব্বার প্রশ্নের উত্তরে বড়ভাই জানালেন যে, তিনি সাংবাদিক হবেন। সাংবাদিকতাও যে একটা পেশা হতে পারে সেটা সেদিনই প্রথম জানতে পারলাম। পরবর্তীকালে বড়ভাই কলিকাতায় ইত্তেহাদ আর ঢাকায় আজাদ, মিল্লাত (অধুনালুপ্ত) ও সংবাদে সাংবাদিকতা করেছিলেন।

যাহোক, আব্বা বললেন যে অর্ধশিক্ষিত লোক দিয়ে সাংবাদিকতা হয় না। এর জন্য প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা আর প্রচুর সংখ্যক বাইরের বই পড়া। শেষ পর্যন্ত পড়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করায় বড় ভাই অব্যাহতি লাভ করে বাইরের ঘরে পড়তে চলে গেলেন। মেজোভাই কয়েক মাস আগে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। আব্বার মতে ম্যাট্রিক থার্ড ডিভিশনে

পাশ করা আর ফেল করা একই ব্যাপার। তাই মেজোভাইকে তিনি আর কলেজে ভর্তি হতে দেননি। কয়েক মাস ধরে মেজোভাই বসেই ছিলেন। সেদিনই আব্বা ঠিক করে ফেললেন যে ওকে খলিফাগিরি শেখাতে হবে। পরে কলিকাতায় কমলালয় অথবা ওয়াসেল মোল্লাতে পাঠিয়ে কাটিং-এর ব্যাপারটা শিখিয়ে নিলেই চলবে। ময়মনসিংহে কোন খলিফার কাছে প্রাথমিক ট্রেনিং নেবে, সেটার দায়িত্ব আব্বা স্বয়ং গ্রহণ করে মেজোভাইকে বিদায় দিলেন। পরবর্তীকালে ঘটনার প্রবাহের মধ্যে বি. এ. পাশ করার পর আমাদের মেজোভাই এখন খুলনায় সী-কাস্টমস-এর সিনিয়র প্রিভেনটিভ অফিসারের চাকুরী করছেন।

এর পর কম্পিতবক্ষে আমি গিয়ে আব্বার দরবারে হাজির হলাম। আমি বললাম, আমার ইচ্ছা উকিল হওয়া। আমি জানতাম এটাই হচ্ছে আব্বার সবচেয়ে বড় দুর্বল স্থান। কেননা, জীবনে উকিল হওয়াটাই তাঁর সবচেয়ে বড় সাধনা ছিল। কিন্তু আমার কথা মুখ দিয়ে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর মার শুরু হলো। পুরা বেতের গোছাটা ভাঙার পর আব্বা হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'উকিল হওয়ার এই বুঝি নমুনা? পড়াশুনা কোথায়?' কাঁদতে কাঁদতে আম্মার কাছে গিয়ে আলমারীর চাবি নিয়ে আমার বইগুলো বের করে পড়তে বসলাম। আমি তখন ক্লাশ নাইনের ছাত্র। আমার পিঠের ছোট ভাই আমার চেয়ে মাত্র এক বছর পাঁচ মাসের ছোট হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক'টা ক্লাশ নীচে পড়তো। তাই ওকে ডেকে আব্বা ওর গালে এক বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় দিয়ে বললেন, "তোর তো আর পড়াশুনা হবে না? তোকে হাবুর কলেজে পাঠিয়ে দেবো।' এই বলে ওকে দিয়ে সমস্ত উঠানটা পরিষ্কার করাতে লাগলেন। আমার আব্বার পাঁচ ভাই-এর একজন মাত্র অশিক্ষিত ছিলেন। আর ইনি গ্রামে আমাদের জমিজমা দেখাশুনা করতেন। এঁর নাম ছিল হাবিবুর।

সবাই ডাকতো হাবু বলে। তাই আব্বা হাবুর কলেজ বলতে এঁর পেশাকেই বুঝিয়েছিলেন। আমার পাঁচ নম্বর ভাই-এর বয়স কম বলে সে যাত্রায় রক্ষা পেলো। অতীতের এ দিনগুলোর কথা মনে হলে শুধু একটা প্রশ্নই মনে জাগে যে, মাত্র ২৬ বছরের ব্যবধানে ছেলেপুলে শাসনের ব্যাপারটা কতই না পরিবর্তন হয়েছে। আর তখন যদি আব্বা নিজের আরাম-আয়েশের কথা ভুলে গিয়ে আমাদের এভাবে শাসন না করতেন তবে বোধহয় সাতটা ছেলে আর চারটে মেয়েকে মানুষ করা তাঁর মতো একজন সাধারণ দারোগার পক্ষে সম্ভব হতো না।

আব্বার সব সময়ই কড়া নজর ছিল যে, নগদ পয়সা যেন তাঁর কোন ছেলে-মেয়ের হাতে না পড়ে। এর জন্যই বোধহয় সংসারের খুঁটিনাটি জিনিসপত্র আর হিসেব রাখার সমস্ত ভারটা তিনিই বহন করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস নগদ পয়সা ছেলেমেয়েদের হাতে পড়লে তারা খারাপ হতে বাধ্য। এ ব্যাপারে আব্বা এতো বেশী কড়া ছিলেন যে, তা অনেকেরই ধারণার বাইরে। তখনকার দিনে বাজারে এক পয়সা আর আধ-পয়সা ছাড়াও ডবল পয়সা আর পাই-পয়সার প্রচলন ছিল। কিন্তু আমরা কোনদিনই আব্বার আছে পাই-পয়সা চাইবারও সাহস করিনি। কোন কিছু কিনে খেতে হলে তা প্রথমেই আম্মার দরবারে পেশ করতে হবে। আম্মা প্রায়ই তা নামঞ্জুর করে দিতেন। কালে-ভদ্রে আম্মার সুপারিশে আব্বা রাস্তা থেকে বাদামভাজাওয়ালাকে ডেকে বাদাম কিনে দিতেন। তবু ছেলেমেয়েদের হাতে নগদ পয়সা দিতেন না। স্কুলে গিয়ে আমরা ভুলেও টিফিনের সময় গেটের বাইরে যেতাম না। এত সব ঝামেলার জন্য আমরা বড় ক'ভাই আব্বা-আম্মার কাছে পয়সা চাইতাম না।

আব্বার নির্দেশে বাজারে যাবার সময় হেঁটে আর আসার সময় রিক্সায় আসতে হতো। তখনকার দিনে বড়বাজার থেকে

কাঁচিঝুলি পর্যন্ত রিক্সার ভাড়া ছ' পয়সা মাত্র। বাজার থেকে ফেরত আসার সময় আর রিক্সায় না এসে বাজারের বোঝা হাতে করে প্রায় দেড়-দু'মাইল রাস্তা হেঁটেই চলে এলাম। আর বাজারের হিসাব বুঝিয়ে দেয়ার সময় রিক্সাভাড়ার দরুন ছ' পয়সা লিখে দিয়ে পয়সা পকেটস্থ করলাম। এটাই হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম কামাই। আর কেউ ব্যাপারটা যাতে টের না পায় তার জন্য এ ছ'টা পয়সা একটা কৌটায় ভরে মাটির নীচে পুঁতে রাখলাম। আর রাতদিন শুধু চিন্তা করতে লাগলাম যে কেমন করে আর চারটা পয়সা যোগাড় করা যায়। কেননা, আমার ইচ্ছে যে দু'আনা দিয়ে একটা টিকিট কিনে 'অলকা' হলে ম্যাটিনী শো আর দু-পয়সা দিয়ে স্পেশাল আইসক্রীম খাওয়া। কিন্তু চিন্তা করে কোন কিনারাই করতে পারলাম না। যখনই বাজারে যাবার সুযোগ হয় তখনই মেজোভাইয়ের সঙ্গে বাজারে যেতে হয়। রিক্সাভাড়া বাঁচাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওর কাছে তো আমার 'ট্রেড সিক্রেট' আর বলে দিতে পারি না? তাহলে তো আমার জমানো ছ' পয়সার বারোটা বাজবে।

এর মধ্যে একদিন হঠাৎ দেশ থেকে আমাদের মেজোচাচা এসে হাজির হলেন ময়মনসিংহ জেলার জমি-জমা সংক্রান্ত একটা গণ্ডগোলের ব্যাপারে আব্বার পরামর্শ নিতে। মনে মনে ঠিক করলাম—এই মেজোচাচার কাছ থেকেই পয়সা নিতে হবে। আমাদের মেজোচাচা ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু তিনি পাশ করা ডাক্তার সত্ত্বেও জীবনে ডাক্তারী করেছিলেন কিনা সন্দেহ। গ্রামে বরাবরই থাকতেন বলে গ্রাম্য রাজনীতির সঙ্গে তিনি দারুণভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, ফুড কমিটির সেক্রেটারী—এ-সব গ্রামের লোভনীয় পদগুলোও দখল করেছিলেন। তিনি ছিলেন হাড়-কৃপণ। শুনেছি রাতের বেলায় তিনি না ঘুমিয়ে বড় সিন্দুকের উপর বিছানা

পতে বন্দুক হাতে বসে থাকতেন। এহেন চাচার কাছ থেকে পয়সা আদায় করার পণ করে বসলাম। আমাদের বাসায় আসার দিন থেকেই মেজোচাচার সেবায় লেগে পড়লাম। উনার আবার হুঁকো খাওয়ার খুবই অভ্যেস ছিল। কিন্তু আব্বার সামনে খাওয়ার সাহস নেই। তিনি আব্বাকে লুকিয়েই হুঁকো খেতেন। আর হুঁকো খাওয়ার সব সরঞ্জামই আমি যোগাড় করে দিতে লাগলাম। দেখতে দেখতে তাঁর ফিরে যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এলো। আমার কিন্তু পয়সা আদায়ের কোন সুরাহাই করতে পারলাম না। যাওয়ার সময় যদি সবার সামনে পয়সা দেনও তবু এতগুলো ভাই ভাগ করে নিলে আমার ভাগে এক পয়সা পড়বে কিনা সন্দেহ। তাই মরিয়া হয়ে মেজোচাচার নতুন কেনা 'অক্সফোর্ড' জুতোর এক পাটি নিয়ে বাসার পিছনে কচুক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। একটু পরেই জুতার খোঁজ পড়লো। বহু খোঁজাখুঁজির পরও জুতার এক পাটি আর পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত মেজোচাচাকে জুতা খুঁজে বের করার জন্য প্রথমে এক আনা, পরে দু' আনা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করতে হলো। কেননা এদিকে তাঁর ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। আমার প্ল্যান শেষ পর্যন্ত কাজে লেগে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে আমি 'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলে চীৎকার করে উঠলাম। নগদ দু' আনা পয়সা পেয়ে আমি অন্যান্য ভাইদের জন্য এক আনা ছেড়ে দিয়ে চারটে পয়সা পকেটস্থ করলাম। এর পর শনিবার 'অলকা' হলের বম্বে টকিজের 'বসন্ত' ছবি দেখলাম আর স্পেশ্যাল আইসক্রীম খেলাম। সেদিন আমার সে কী আনন্দ! মমতাজ শান্তি অভিনীত 'বসন্ত' ছবি হচ্ছে আমার জীবনে পঞ্চম বার বায়োস্কোপ দেখা। এর আগে 'মুক্তি', 'দেবদাস', 'বিদ্যাপতি' আর 'ডায়মণ্ড কুইন'—এ চারটি ছবি দেখেছিলাম। অবশ্য এগুলো আব্বার অনুমতিতে তাঁর দেয়া পয়সা থেকে টিকিট কিনে দেখেছিলাম। আর 'বসন্ত' হচ্ছে নিজস্ব পদ্ধতিতে দেখা আমার জীবনের প্রথম ছবি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। আমি ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের ক্লাশ 'টেন'-এর ছাত্র। স্কুলের আসল বিল্ডিংটা তখন পর্যন্ত মিলিটারীদের দখলে থাকায় বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুলের মতো আমরাও একটা ভাড়াটে বাড়ীতে স্কুল করছি। আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন আবদুল মান্নান ওয়ার্সী সাহেব। তখনকার দিনে বাংলাদেশের সমস্ত জেলা স্কুলগুলোর সবচেয়ে প্রবীণতম হেডমাস্টার। পরবর্তীকালে ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী শহরের মর্যাদা লাভ করলে ইনি অবসর গ্রহণ করে ওয়ার্সী বুক সেন্টারের প্রতিষ্ঠা করেন।

বছরের একটা সময় আমাদের সব ক'টা ভাইয়েরই বিপদ দেখা দিত। সেটা হচ্ছে স্কুলের মিলাদ মহফিলের সময়। আব্বা এতোগুলো ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাতে গিয়ে চাঁদাটা না দেয়া তাঁর জীবনের একটা মূল নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড মৌলবী সাহেব ছিলেন অসম্ভব রকমের কড়া লোক। শেষ পর্যন্ত মিলাদ মহফিলের চাঁদা আদায়ের ভারটা তাঁর উপর ন্যস্ত হল। তিনি প্রতিটি মুসলমান ছাত্রের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করবেন বলে পণ করে বসলেন। তাঁর চাঁদা আদায়ের নানা রকমের কাহিনী ছাত্রদের মুখে মুখে প্রচার হতে লাগলো। এর মধ্যে আরবী আর ফার্সীর ক্লাসে বেত্রাঘাত ও পরীক্ষার খাতায় নম্বর কাটা অন্যতম। আমার বন্ধু-বান্ধব আমাকে ভয় দেখাতে লাগলো। কিন্তু আমি একেবারে নির্বিকার। কেননা আরবী বা ফার্সী কোনটারই আমি ছাত্র ছিলাম না। আমি ছিলাম সংস্কৃতের ছাত্র। তাই সেকেণ্ড মৌলবী সাহেব একদিন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমাদের সংস্কৃত ক্লাসে এসে হাজির হলেন। কিন্তু আমি চাঁদা দেবো না বলায় উনি চোখ দু'টো রক্তবর্ণ করে বিড় বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। অবশ্য

আমিও লজ্জা অথবা ভয়, যে কোন কারণেই হোক স্কুলের মিলাদ মহফিলে আর যোগ দিলাম না।

এর দিন কয়েক পরে আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যার জন্য জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ফুটবল খেলা আমাকে ছেড়েই দিতে হলো। স্কুলের একজন নামকরা খেলোয়াড় বলে দলে খেলার জন্য আমার ডাক পড়লো। মেজোভাই তখন ম্যাট্রিক পাশ করে বসে রয়েছেন। কেননা আব্বা তাঁকে না পড়িয়ে টেইলারিং শেখাবার জন্য একজন মনোমত ওস্তাদ খলিফা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাই আমরা দু'ভাই জোড়া বেঁধে নানা দলে খেলে বেড়াতে লাগলাম। এর মধ্যে একদিন কলেজ কোয়ার্টার দল থেকে ডাক এলো—কেওটখালিতে একটা কাপ টুর্নামেন্টের ফাইন্যাল খেলা আছে। দু'ভাইয়ের ভাড়া চার আনা করে আট আনায় রফা হল। এর মধ্যে দু' আনা নগদ আর বাকী পয়সা খেলার পরে পাওয়া যাবে। এ-ছাড়া খেলাশেষে আমাদের সাইকেলে বাড়ী পৌঁছে দেবে।

সেদিন ছিল শনিবার। স্কুলের হাফ-ছুটির পর দু'জনে চলে গেলাম কেওটখালিতে ফাইন্যাল খেলবার জন্য। জোর খেলা হলো। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে এক্সট্রা টাইমে আমরা একটা বিতর্কমূলক গোলে 'ইলেভেন স্টার'কে হারিয়ে দিলাম। গোলটা যখন হয় তখন আমাদের একজন খেলোয়াড় অফ্-সাইডে ছিল বলেই মনে হয়। বহু ঝগড়াঝাটির পর ঠিক হলো যে, টুর্ণামেন্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের দলকে খরচা বাবদ নগদ তিন টাকা দেবে আর ফাইন্যাল খেলার 'রিপ্লে' হবে। এত সব হৈ-চৈ আর গণ্ডগোলের মধ্যে কখন যে সন্ধ্যা উতরে রাতের ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে টেরই পাইনি। যখন দু'ভাইয়ের খেয়াল হলো তখন আর উপায় নেই।

কম্পিতবক্ষে দু'ভাই যখন বলির পাঁঠার মতো বাসার দরজায় এসে হাজির হলাম তখন প্রায় রাত আটটা বাজে। অন্ধকারের মধ্যে বুঝতে পারলাম যে, আব্বা বাসার সামনে ছোট্ট লনে ইজি-চেয়ারে বসে রয়েছেন। আর তাঁর পাশে আম্মাও রয়েছেন। কিন্তু দু'জনেই একেবারে চুপচাপ। পড়ার ঘর থেকে ছোট ভাই-বোনদের পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। আমি মাথা নীচু করে বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই গিয়ে একেবারে আব্বার হাতে পড়লাম। পিছনে তাকিয়ে দেখি মেজোভাই লা-পাত্তা হয়ে গেছে। আমাকে হড় হড় করে টেনে আব্বা একেবারে বাড়ীর ভিতরের বারান্দায় নিয়ে গেলেন আর আম্মা পাথরের মূর্তির মতো চেয়ারে বসে রইলেন। এর পর আব্বা একটা দশ-হাতি শাড়ী দিয়ে আমাকে বারান্দার থাম্বার সঙ্গে বাঁধলেন, তারপর একটা পুলিশের হান্টার দিয়ে আমার উপর 'হবিয়া দোজখ' নেমে এসেছে। প্রায় দশ মিনিট ধরে আমাকে হান্টার পেটা করে আব্বা হাঁফাতে হাঁফাতে চলে গেলেন নিজের পড়ার টেবিলে। সবাই মিলে বাঁধন খুলে আমাকে উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে বিছানায় নেতিয়ে পড়লাম। যখন হুঁশ পেলাম, তখন সকাল হয়ে গেছে। এর পর আয়নায় দেখলাম মুখের কয়েকটা জায়গা নীল হয়ে রয়েছে। পরদিন রোববার আর বিছানা থেকেই উঠতে পারলাম না। এমন কি সোমবার দিনও মুখের নীল দাগের জন্য স্কুল কামাই করলাম। এ ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু এর পর আমি আর কোনদিন ফুটবল খেলা তো দূরের কথা, ফুটবল স্পর্শ পর্যন্ত করিনি।

আর আজ আমার মনে শুধু একটা প্রশ্নই জাগে যে, মাত্র পঁচিশ বছরের ব্যবধানে সামাজিক ব্যবস্থার কি এতোই পরিবর্তন ঘটেছে যে, লেখাপড়া তো দূরের কথা, এখনকার ছেলেদের জোর

করে ফুটবল পর্যন্ত খেলাতে হচ্ছে। আর অভিভাবকরা নিরিক্ত ওজনে মাপ করে ছেলেদের শাসন করতে বাধ্য হচ্ছেন !

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে আব্বা বদলী হলেন দিনাজপুরে। আমরা ক'ভাই বাংলাদেশের ম্যাপ খুলে দিনাজপুরের অবস্থানটা দেখে নিলাম আর ছোট ভাইয়ের ভূগোল বই থেকে পড়লাম, 'দিনাজপুর জেলা ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য বিখ্যাত'। অবশ্য পরে দিনাজপুরেই আমাকে প্রায় ছ' বছর কাটাতে হয়েছিল। আর এ দিনাজপুরে থাকার সময় আমি ১৯৪৫ সালে বাড়ী থেকে প্রথম পালিয়ে যাই। সে কাহিনী আর একদিন বয়ান করা যাবে।

১৯৪৪ সালের মার্চ কি এপ্রিল মাসে আমরা দিনাজপুরে এসে হাজির হলাম। নতুন জায়গা, নতুন মুখ আর নতুন পরিবেশ। প্রথম ক'টা দিন তো স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। মনটা আমার বার বার গুমড়ে উঠতে লাগলো ময়মনসিংহ-এর মায়াভরা কৈশোরের মধুমাখা দিনগুলোর কথা মনে করে। কিন্তু উপায় নেই। তাই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভুলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম কোথায়? আজ প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বছর পরেও ময়মনসিংহের দিনগুলোর কথা আমার স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করছে।

আব্বা কিন্তু দিনাজপুরে এসে খুবই খুশী হলেন। কেননা আব্বা তাঁর চাকুরী জীবনের প্রথম একটা বছর এই দিনাজপুরেই কাটিয়েছিলেন। প্রায় ২৫ বছর পর তিনি দিনাজপুর এসে শুধু একটা মন্তব্যই করলেন যে, পঁচিশ বছরের মধ্যে এ শহরের কোনই উন্নতি হয়নি। দিনাজপুর ছাড়ার প্রায় ২০ বছর পর আমি একটা কাজ উপলক্ষে সেদিন দিনাজপুরে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনে একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কথাটা পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলেই ফেললাম। মনে হলো ওয়াজেদ আলীর ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিশন যেন দিনাজপুরে সমানে চলছে। একটা নতুন সিনেমা হল আর কলেজের নিজস্ব বিল্ডিং ছাড়া এ শহরে বিগত

৪৫ বছরে আর কোন উন্নতি হয়েছে কিনা সন্দেহ। পূর্ব বাংলার জেলা শহরগুলোর সবচেয়ে শেষে ঐ দিনাজপুরে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। পানির কলের ব্যবস্থা আজও পর্যন্ত হয়নি। কবে হবে কেউ বলতে পারে না।

এ হেন দিনাজপুর শহরে বদলী হয়ে এসে আব্বা আমাকে আর আমার ছোট দু'ভাইকে (বড় ভাই কলেজের ছাত্র আর মেজোভাই-এর পড়াশুনা বন্ধ) পাঠালেন মহারাজা স্কুলে ভর্তি হতে। কেননা তুলনামূলকভাবে নাকি জেলা স্কুল থেকে এই মহারাজা স্কুল পড়াশুনায় অনেক ভাল। তখন মহারাজা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন শ্রীমণি মুখার্জি। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় পাঁচশো'র মত। কিন্তু মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা হাতের আঙ্গুলে গোনা যায়। ক্লাশ টেন-এ ভর্তি হব বলে হেডমাস্টার নিজে ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য আমাকে ডেকে পাঠালেন। কম্পিতবক্ষে 'মে আই কাম ইন স্যার?' বলে তাঁর রুমে ঢুকে পড়লাম। পায়ে পাম্পসু, পরনে শান্তিপুরী ধুতী ও আদ্দির পাঞ্জাবী, কাঁধে চাদর ঝুলিয়ে চমৎকার সৌম্যমৈত্রীর অধিকারী মুখার্জিমশায়কে দেখলাম নিবিষ্ট মনে কাজ করে যাচ্ছেন। শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এলো। আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বসতে বললেন। আমি সঙ্কুচিতভাবে একটা চেয়ারে বসে তাঁর টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি প্রথমেই বললেন, 'মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা কম বলে আমরা এ স্কুলে আরবী ক্লাশ খুলতে পারিনি। তাই তোমার এখানে ভর্তি হয়ে লাভ নেই।' আমি বললাম, 'আমার এতে কোন অসুবিধা হবে না স্যার। আমি হচ্ছি সংস্কৃতের ছাত্র। অবশ্য সংস্কৃতে পড়তে অসুবিধা দেখলে ম্যাট্রিকে পারসীতে পরীক্ষা দিব।' আমার জবাবে হেডমাস্টারমশায় কয়েক সেকেণ্ড অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে আমার কাছ থেকে টি. সি-টা চেয়ে ভর্তির

অনুমতি দিলেন। সেদিন থেকে আমি দিনাজপুর মহারাজা গিরিজানাথ হাই স্কুলের ছাত্র হয়ে গেলাম।

পরদিন ক্লাশে গিয়ে দেখি ক্লাশের মোট ৫২ জন ছাত্রের মধ্যে আমি ছাড়া আর একজন মাত্র মুসলমান ছাত্র ছিল। তার নাম ওয়াকিল উদ্দিন মণ্ডল। কিন্তু সে নাকি বছরের অধিকাংশ সময়েই অনুপস্থিত থাকে। ফলে আমিই হয়ে পড়লাম ক্লাশের মধ্যে সবেধন নীলমণি—অর্থাৎ একমাত্র মুসলমান ছাত্র। তাই স্বাভাবিকভাবেই অনেক বিড়ম্বনাই সহ্য করতে হয়েছে। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতের ছাত্র বলে পণ্ডিতমশায় খুবই বিরক্তি বোধ করতেন। কেননা হিন্দুধর্মের প্রতি মমত্ত্ববোধের চেয়ে মুসলমানদের প্রতি 'ঘৃণা'ই তাঁর বেশী ছিল। সংস্কৃত ক্লাশে আমার উপস্থিতির দরুন পণ্ডিতমশায় অপদস্থ করবার জন্য বেছে বেছে শুধু আমাকেই প্রশ্ন করতেন। কোন সময় উত্তর দিতে ভুল করলে জাত তুলে গাল দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। মোটকথা একমাত্র ঐ পণ্ডিতমশায়ের জন্যই মহারাজা স্কুলের দিনগুলো আমার কাছে বিষময় হয়ে উঠলো।

এর মধ্যে আব্বা মেজোভাইকে নিয়ে গিয়ে মুন্সীপাড়ায় একজন খলিফার কাছে টেলারিং শিখতে লাগিয়ে দিলেন। আর বড়ভাই আই. এস-সি পাশ করে রাজশাহী কলেজে বি. এস-সি পড়তে গেলেন। আব্বার ইচ্ছে বড়ভাইকে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়িয়ে একজন ভাল ইঞ্জিনীয়ার বানাবেন। মেজোভাইকে দেখতাম দিনের পর দিন শুধু বোতামের ঘর টুকছেন আর ওস্তাদ খলিফাকে খুশী করার জন্য ব্যস্ত রয়েছেন। এমন অবস্থায় সংস্কৃত ক্লাশের বিড়ম্বনার কথা আর কাউকে না বলে গুমরাতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে টেস্ট পরীক্ষা এসে গেল। একদিন হেডমাস্টারমশায় আমাকে ডেকে পাঠাবার কোন কারণই খুঁজে

গেলাম না। মাথা চুলকাতে চুলকাতে স্যারের রুমে গিয়ে হাজির হতেই তিনি বললেন, 'তোমার সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছি। তুমি যে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারবে না সেটা আমি লিখে দিতে পারি।' কথাটা শুনেই বুঝলাম যে, পণ্ডিতমশায় ছাড়া আর কেউই এ ধরনের রিপোর্ট করতে পারেন না। তাই মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম, 'স্যার, আপনি লিখে দিতে পারেন, কিন্তু আমি পাশ করবোই। তবে টেস্ট পরীক্ষায় সংস্কৃতের রেজাল্টের উপর আমাকে কিন্তু 'ডিসএলাউ' করতে পারবেন না।' কথা ক'টা বলে আমার রাফ খাতাটা স্যারের দিকে এগিয়ে দিলাম। হেড-মাস্টারমশায় আমার খাতায় ইংরেজীতে যা লিখে দিলেন তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আমার দ্বারা আর যাই হোক না কেন ম্যাট্রিক পাশ হবে না।

মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। এদিকে আব্বা একদিন আমাকে ডেকে বললেন যে, 'তুই যদি থার্ড ডিভিশনেও ম্যাট্রিক পাশ করিস তবুও তোকে পড়াব। আমার ইচ্ছা তুই ডাক্তারী লাইনে ভালো করবি।' নিজের জীবনের ওপর ধিক্কার এসে গেল। রাত-দিন খালি ভাবতে লাগলাম, আমি কী এতোই খারাপ ছাত্র যে, সবাই আমার সম্পর্কে এ ধরনের মত পোষণ করছেন।

টেস্ট পরীক্ষায় যা আশা করেছিলাম তাই-ই হলো। সংস্কৃতে মাত্র ২৭ নম্বর পেলাম। আমার চেয়ে খারাপ লিখেও অনেক ছাত্র-৫০ নম্বরের কাছাকাছি নম্বর পেয়েছে। আমি সোজা হেড-মাস্টারমশায়ের রুমে চলে গেলাম। উনি আমাকে দেখেই হেসে উঠে বললেন, 'তোমাকে টেস্টে 'এলাউ' করে দিলাম। কিন্তু ম্যাট্রিকে আমার মুখ রক্ষা করো।'

হঠাৎ কী মনে হলো, ম্যাট্রিকের ফরম পূরণ করার সময় সংস্কৃতের জায়গায় 'পারসী' লিখে ফরম পূরণ করে সই করে দিলাম। কথাটা আর চাপা রইলো না। দিন কয়েক পরে আব্বা আমাকে

ডেকে পাঠালেন। আমি অপরাধ স্বীকার করে মার খাওয়ার জন্য তৈরী হলাম। কিন্তু আমার সমস্ত জীবনের চিন্তাধারাকে নস্যাৎ করে আব্বা আমাকে তাঁর বুকের মাঝে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন, 'একটা মৌলবী ঠিক করে পড়তে শুরু করে দে। তোকে ম্যাট্রিক পাশ করতেই হবে'। পরদিন থেকেই আমি জেলা স্কুলের হেড-মওলবীর বাসায় রোজ গিয়ে পারসী পড়তে শুরু করলাম। খেলাধুলো সমস্ত বাদ দিয়ে ১৬ ঘণ্টা করে পড়তে লাগলাম। এই ১৬ ঘণ্টার প্রায় ছ' ঘণ্টাই পারসী পড়তে হতো। পারসী নোট-বই প্রায় মুখস্থ করে ফেললাম।

১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা শুরু হলো। প্রতিটি পরীক্ষাই ভাল দিলাম—এমন কী পারসী পর্যন্ত। কিন্তু শেষের দিনে অঙ্ক পরীক্ষায় সব কিছু গোল হয়ে গেল। সময়ের অভাবে জানা অঙ্কগুলো পর্যন্ত লিখতে পারলাম না। কেননা প্রশ্নপত্রে একটা সরল অঙ্ক ছিল আর তার উত্তরটাও আমার মুখস্থ। কিন্তু কিছুতেই উত্তর মিলাতে পারলাম না। প্রথম এক ঘণ্টা আট-দশবার ওই একটা অঙ্ক করে উত্তর মিলাবার জন্য জেদ চেপে গেল। শেষ পর্যন্ত অঙ্কটা শুদ্ধ করলাম বটে, কিন্তু যে সময় নষ্ট করেছি, তা আর কভার করতে পারলাম না। তাই জানা সত্ত্বেও অনেক ক'টা এ্যালজেবরা আর জ্যামিতি লিখতেই পারলাম না। ঘণ্টা পড়ার পর হিসেব করে দেখলাম মাত্র ৩২ নম্বরের উত্তর দিয়েছি। দিব্যচোখে দেখতে পেলাম হেডমাস্টারমশায়ের ভবিষ্যৎ-বাণীর কথা! আর ভাবতে লাগলাম, ম্যাট্রিক ফেল করলে আব্বার মারের চোটে আমার রক্ত আর মাংস আলাদা হয়ে যাবে। তাই হল থেকেই সোজা রেল স্টেশনে এসে ট্রেনে চেপে পার্বতীপুরে হাজির হলাম। পকেটে আমার দশ টাকা সম্বল। টাকা দশটা আব্বা আমাকে দিয়েছিলেন পারসী পড়ানোর জন্য হেড-মওলবীর মাইনে দিতে। মাত্র ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে সান্তা-

হারগামী একটা লোকাল ট্রেনে চেপে বললাম। বাড়ী ছেড়ে অজানার পথে পা বাড়ালাম। মনে হলো আমি বড্ড একা। এই বিরাট বিশ্বে আমি একাকী এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে চলেছি। এর শেষ কোথায় কে জানে?

বহু জায়গায় ঘোরাঘুরির পর এপ্রিল মাসের এক বর্ষণমুখর সকালে শিয়ালদা স্টেশনে এসে হাজির হলাম। সামনে দেখতে পেলাম বিশাল জনসমুদ্র। মনে হলো কলিকাতা শহরে সবাই যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। আমি পকেটে হাত দিয়ে আমার মামাতো ভাইয়ের ঠিকানা আবার দেখে নিলাম। এ ভাইকে আমি জীবনে কোনদিন চর্মচোখে দেখিনি। কিন্তু আমাকে এর কাছেই আশ্রয়ের জন্য যেতে হবে। কেননা ইনি ছাড়া সমস্ত কলিকাতা শহরে আমাকে আশ্রয় দেবার মতো আর কেউই নেই বলে মনে হলো। ভদ্রলোক সিভিল সাপ্লাই-এর ইন্সপেক্টার। তখনকার দিনে সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টারের পসার খুবই বেশী। ইন্টালীর মৌলালী দরগার পিছনে এক তিনতলা বাড়ীর একটা মেসে ভাই-এর দেখা পেলাম। ভদ্রলোক তখন অফিসে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। কপালটা ভালো। পরিচয় দিতেই চিনতে পারলেন। বললাম, 'ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় বেড়াতে এসেছি'।

মেসেই আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে ভাই অফিসে গেলেন। আমি দুপুরে খাওয়ার পর তেতলার জানালা দিয়ে চলমান কলিকাতা শহরটাকে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ বাড়ীর কথা মনে পড়ে গেল, আব্বা, আম্মা, ভাই-বোন সবারই কথা মনে পড়লো। কিন্তু মনকে দমিয়ে দিলাম এই বলে যে, বাড়ীর দুয়ার আমার জন্য চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। কেননা, যে অপরাধ আমি করেছি, তার ক্ষমা আর যেই-ই করুক না কেন, আব্বার কাছে পাওয়া অসম্ভব। বার বার মনকে প্রবোধ

দিলাম, আমাকে প্রকৃত মানুষ হতেই হবে। এ অজানা ভবিষ্যতের মধ্যেই আমার সাফল্য রয়েছে।

অনেক রাতে সম্মিলিত কণ্ঠের হাসির আওয়াজে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। খেয়াল করে দেখলাম মাঝের দরজাটা খোলা আর ওধারের ঘরের মেঝেতে জোর তাস খেলা হচ্ছে।

সবারই সামনে টাকার স্তূপ, আর গ্লাস ভর্তি পানীয়। কয়েকটা তিন ন'-এর কৌটা সামনে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মেসের দু'-দুটো চাকর সাহেবদের ফাই-ফরমাসে অস্থির হয়ে উঠেছে। আমার মনে প্রশ্ন এলো 'এত টাকা এরা পেল কোথা থেকে'? কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর পাই নি। কেননা জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছি শুধু কড়া-ক্রান্তির হিসাব। অপচয় আর বেহিসেবীর কথা চিন্তা করতে পারিনি। খালি আব্বার কাছ থেকে জেনেছি যে, অবস্থার বিপাকে পড়ে ঘুষ খেতে হবে ভয়ে তিনি ছেলেপুলের জনক হবার পর থানায় বদলী নেননি। আব্বা বলতেন, 'থানায় গেলেই ঘুষ নিতে হবে। আর ঘুষ নিলে শুধু বেহিসেবীই হবো তাই-ই নয়, টাকার উপর মায়া থাকবে না। তাই ছেলেমেয়েদের হাতে টাকা-পয়সা পড়বে, আর সেটা হলেই ছেলেমেয়েদের একটাও মানুষ হতে পারবে না। দেখিস না, দারোগার ছেলেমেয়েরা একটাও মানুষ হতে পারে না।' তাই ইন্টালীর মেসে গভীর রাতে সংসারের আর একটা চিত্র দেখে রাতটুকু আর ঘুমুতে পারলাম না।

পরদিন সকালে নাস্তা খাবার পর লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে এগিয়ে চললাম। খানিকটা যেতেই 'আসাম ও বঙ্গদেশের' মুসলমানদের একমাত্র দৈনিকের অফিসের সামনে হাজির হলাম। অফিসের সামনের বাউণ্ডারী ওয়ালে সেদিনকার দু'-কপি কাগজ আঠা দিয়ে লাগানো রয়েছে। বেকার যুবকরা যাতে বিনা পয়সায় কাগজ পড়তে পারে, সম্ভবত সে কারণেই মরহুম মওলানা

আকরাম খাঁ এ ব্যবস্থা করেছিলেন : নিয়তির কী পরিহাস! পয়সার অভাবে একদিন যে আজাদ পত্রিকা অফিসের বাউণ্ডারী ওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কাগজ পড়েছিলাম, মাত্র পনের বছর পর আমি সেই পত্রিকার বার্তা সম্পাদকের পদে বহাল হয়েছিলাম, আর কুড়ি বছরের ব্যবধানে জেনারেল ম্যানেজারের পদ অলঙ্কৃত করেছিলাম।

যাক গে, আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। সেদিনকার এ আজাদ কাগজের একটা বিজ্ঞাপনের উপর এসে আমার চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। বিরাট বিজ্ঞাপনটার মাথায় লেখা রয়েছে, 'নেভীর জন্য ১৪ বছরের বালক প্রয়োজন। যোগদান করুন'— রিক্রুটিং অফিসটা কাছেই ছিল। তাই হেঁটেই চলে গেলাম। দেখলাম একজন শিখ সৈন্য সামনে গার্ড দিচ্ছে। তাই ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে আমার আসার উদ্দেশ্য বলতেই সে আমাকে ভিতরে ঢোকবার অনুমতি দিয়ে ঘরটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। রিক্রুটিং অফিসার আমার দেহের মাপজোক নিয়ে পরদিন ফরম পূরণ করে তৈরী হয়ে আসতে বললেন। আমার মনে আর আনন্দ ধরে না। এত অল্প বয়সে কলিকাতার মতো জায়গায় আমার চাকুরী ধরতে গেলে এক রকম হয়েই গেছে। এ ছাড়া আমাদের পুরো গোষ্ঠীতে আমি হবো দেশরক্ষাবাহিনীতে দাখিলহওয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি। প্রথম হচ্ছেন আমার সবচেয়ে ছোট চাচা। তিনি বছর দুয়েক আগেই আর্মিতে জয়েন করেছিলেন। ছোট চাচার আর্মিতে যোগ দেয়ার কাহিনী বড়ই চমৎকার। ছোট চাচা পড়তেন বগুড়ায় গ্রামের একটা স্কুলে আর তার লেখাপড়ার পুরো খরচটাই আব্বা চালাতেন। শুধু ছোট চাচা কেন, আমার সব চাচারই লেখাপড়ার খরচ আব্বা চালিয়েছেন। আর এসব খরচের হিসেব আব্বার কাছে এখনও মজুত রয়েছে। এমন কী, মনি-অর্ডারের রশিদগুলো পর্যন্ত সযত্নে বাঁধা রয়েছে। ছোটচাচা তখন ক্লাস এইটে

পড়তেন। বছরের শেষে আব্বার কাছে ছোট চাচার চিঠি এলো —'দাদা, আমি ভালভাবেই ক্লাস নাইন-এ প্রমোশন পেয়েছি, তাই ম্যাট্রিক ক্লাসের নতুন বই কিনবার জন্য টাকার দরকার। নীচে হিসাব দিলাম।' আব্বা ছোট ভাই-এর সাফল্যে খুশীতে আত্মহারা হয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা না করেই হিসাব মতো মনি-অর্ডারে টাকা পাঠিয়ে দলেন। এর মাস কয়েক পর যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় আব্বা পুরো ফ্যামিলিটা বগুড়ায় শ্বশুর-বাড়ীতে রাখার জন্য ময়মনসিংহ থেকে কয়েক দিনের ছুটিতে হঠাৎ করে বগুড়ায় গিয়ে হাজির হলেন। এ খবর যথাস্থানে আমাদের আদি পৈত্রিক ভিটায় পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ছোট চাচা উপায়ান্তর বিহীন অবস্থায় মাত্র দশটি টাকা পকেটে করে কলিকাতায় পালিয়ে গেলেন আর সেখান থেকেই তিনি দেশরক্ষা বাহিনীতে ভর্তি হলেন। অবশ্য ছোট চাচা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুরো সময়টাতেই আর্মিতে ছিলেন আর বর্মা থেকে শুরু করে ফিলিপাইন পর্যন্ত বিরাট এলাকাটা চষে বেড়িয়েছিলেন। ছোট চাচার প্রথম চিঠি যখন এলো তখন তিনি পুণায় ট্রেনিং নিচ্ছেন। এ পুরো ব্যাপারটা ঘটেছিল শুধু একটিমাত্র কারণে। ছোট চাচা ক্লাশ এইট-এ ফেল করেছিলেন আর বই কেনার মিথ্যা বাহানা করে আব্বার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন।

যাহোক, নেভীর রিক্রুটিং অফিসের ব্যাপারটা ভাইয়ের কাছ থেকে চেপে গেলাম। কিন্তু রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। আম্মা 'সোবেসাদেকে'র সময় বাসার এক কোণে বসে সুর করে পাক-কোরান তেলোয়াত করছেন আর তাঁর চোখ দিয়ে অঝোরে পানি পড়ছে। আমি বুঝতে পারলাম আম্মা আমারই মঙ্গলের জন্য আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছেন। দারুণ অস্থিরতার মধ্যে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম ভোরের আলো ফুটে গেছে আর দূর থেকে আজানের সুর ভেসে আসছে।

মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। তবুও মনকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে সকাল ন'টার মধ্যেই রিক্রুটিং অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। অফিসের গেটে দাঁড়িয়ে থাকতেই দেখলাম বিরাট একটা ট্রাক অফিসের ভিতর থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। ট্রাকটা ভর্তি শুধু আমার বয়েসী ছেলের দলে। জিজ্ঞেস করে জানলাম ওদের হাওড়া ষ্টেশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওখান থেকে পাঠানো হবে বোম্বে। মনে হলো, যেন এক পাল খাসীকে ট্রাক ভর্তি করে জবাইখানাতে পাঠানো হচ্ছে।

আমি খানিকক্ষণ হতবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্বপ্নে দেখা আম্মার কোরান তেলোয়াতের সুরটা তখনও পর্যন্ত আমার কানে বাজছে। হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে চললাম ইন্টালীর দরগার দিকে। কখন যে শিয়ালদা ষ্টেশনে এসেছি টেরই পায়নি। পকেটে সম্বল মাত্র দেড় টাকা। তাই দিয়ে একটা হাফ টিকিট পোড়াদ' পর্যন্ত কেটে বেলা দুটোয় আসাম মেলে চেপে বসলাম। দমদম পার হবার আগেই সমস্ত গাটা থরথর করে কেঁপে আমার পুরনো ম্যালেরিয়া জ্বরটা দেখা দিলো। এরপর জ্বরে প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় কম্পার্টমেন্টের এক কোণায় পড়ে রইলাম। যখন জ্বর ছাড়লো তখন সান্তাহারে পৌঁছে গেছি। হঠাৎ করে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারলাম না। চেকারের হাতে পড়াতে আমাকে জি. আর. পি. থানায় পাঠিয়ে দিলেন। কিছুতেই আব্বার আসল পরিচয় দিলাম না। রাতে আমার জন্য থানায় পুরি আর আলুর তরকারী এলো। গোগ্রাসে খেয়ে হাঁপাতে লাগলাম। মনে হলো আবার জ্বরটা আসবে। অনেক রাতে জি. আর. পি-র এক দারোগা এসে প্রশ্ন করতে লাগলো। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই বলে তার বিশ্বাস হওয়াতে তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন। বাকী রাতটা প্লাটফরমে কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার মনে একই চিন্তা, দিনাজপুরে আব্বা-

আম্মার কাছে যাব, না বগুড়ায় চাচা-চাচীদের কাছে যাব? শেষে ভাবলাম আব্বা তো মারা ছাড়া আর কিছুই করবেন না। যা থাকে কপালে, আমাকে দিনাজপুরেই যেতে হবে। সমস্তটা দিন অভুক্ত অবস্থায় সান্তাহার প্লাটফরমে ঘোরাঘুরিই করলাম। সন্ধ্যায় আবার সেই আসাম মেলে চাপলাম। পার্বতীপুর পরিচিত জায়গা। তাই চেকারের চোখ এড়িয়ে দিনাজপুরগামী গাড়ীতে চাপলাম। রাত তখন ১০টা।

বাসায় যখন পৌঁছলাম তখন পুলিশ লাইনের পেটা ঘড়িতে বারোটা বাজলো। আম্মার 'কদমবুচি' করতেই সে কী কান্না। রাতে আর আব্বার সঙ্গে দেখা হলো না। বুঝলাম সকালেই আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। গরম খিচুড়ী খেয়ে যখন বিছানায় গেলাম তখন রাত দু'টা।

হঠাৎ বিরাট হৈচৈ-এ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকাল তখন প্রায় ছ'টা বাজে। আমার সব ভাইবোনই বড়ভাই-এর ঘরের সামনে জটলা বেঁধে হৈচৈ করছে। বড়ভাই-এর টেবিলের উপর একটা কাগজে লেখা ক'টি ছত্র—

'যাই তবে চলে যাই,
চোখে যদি আসে জল,
তাই গোপনে বিদায় চাই'

—খোকা

আর একটা কাগজে লেখা কী কী জিনিস সঙ্গে নিয়েছে তার লিষ্টি…

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা সবাই স্থির সিদ্ধান্তে এলাম যে, এবার বড়ভাই বাড়ী থেকে পালিয়েছেন। কিন্তু আপাতত তাঁর পলায়নের কোন কারণই আমরা খুঁজে পেলাম না। কেননা উনি তখন রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজের বি, এস-সি

ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। তাই কোন পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের ধারণা এ পৃথিবীতে একমাত্র পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ না হ'লে কেউ বাড়ী থেকে পলায়নের দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে পারে না।

বড়ভাই-এর লেখাপড়ার ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। ১৯৪০ সালে টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাই স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন ভাই একটা সংস্কৃত টোলে ভর্তি হয়ে সসম্মানে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এর ফলস্বরূপ বাংলা, সংস্কৃত, আর পালি ভাষা সম্পর্কে তিনি মোটামুটি পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

এরপর থেকে মিলাদ মহফিলের রচনা প্রতিযোগিতায় তো বটেই, স্কুলের প্রতি বছরের সরস্বতী পূজার রচনা প্রতিযোগিতায় ভাই প্রথম স্থান দখল করে চললেন। এহেন ছাত্রকে আই. এস-সিতে ভর্তি হতে হল। কেননা আব্বার ইচ্ছা তাঁর বড় ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হবে।

তখনকার দিনে বাংলা, বিহার, আসাম আর উড়িষ্যা এ'চার প্রদেশের জন্য কলিকাতার শিবপুরে একটা মাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ছিল। তাই এ' কলেজের ভর্তি পর্বটা এক মারাত্মক ব্যাপার বলে পরিগণিত ছিল। তার উপর আবেদনকারী মুসলমান হ'লে তো কথাই নেই। তাই আব্বা ভাইকে আই. এস-সি পরীক্ষা দেয়ার পর শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভর্তির পরীক্ষায় হাজির না করে রাজশাহী কলেজে অঙ্কে অনার্স দিয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেন। আব্বার ইচ্ছে ভাই শিবপুর এ্যাডমিশন টেষ্ট দিবে। যদি পাশ করতে পারে, তবে তো কথাই নেই। টেষ্ট-এ ফল খারাপ হলে বি, এস-সির পড়া চালিয়ে যাবে।

কিন্তু দেরীতে হ'লেও বড়ভাই তখন সিদ্ধান্তে এসে গেছেন যে, ইঞ্জিনীয়ারিং তো দূরের কথা, তিনি বিজ্ঞানই আর পড়বেন না। তাঁর তখন শ্লোগানই হচ্ছে 'গোয়াল ঘর বদলাতে হবে।'

অবশ্য রাজশাহীতে পড়ার সময় বড়ভাই-এর রাজনীতিতে হাতে-খড়ি হয়ে গেছে। কিন্তু ভাই-এর সাধ্য নেই যে আব্বার কাছে কথা ক'টা গুছিয়ে বলে।

এর মধ্যে আব্বা একবার কলিকাতায় গিয়ে ভাই-এর ভর্তির ব্যাপারে খানিকটা তদ্বির করে এসে ভাইকে রাজশাহী থেকে দিনাজপুরে নিয়ে এলেন। অবশ্য আমি তখন পলাতক অবস্থায় রয়েছি। আব্বা তাঁর বড় ছেলেকে নিয়ে কলিকাতা যাবার দিন-ক্ষণ ঠিক করে ফেললেন আর বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের সগর্বে একথা শুনিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু বিধাতা বোধহয় বিরূপ হলেন। যেদিন আব্বার বড় ছেলেকে নিয়ে কলিকাতা রওয়ানা হওয়ার কথা, তার আগের রাতে পলাতক অবস্থা থেকে আমি ফিরে এলাম আর সে' রাতেই বড়ভাই অজানার পথে পা বাড়ালেন। পরে বড়ভাইয়ের কাছে শুনেছিলাম যে, দু' ভাই এক সঙ্গে পলাতক হলে আম্মা এ আঘাতের ধাক্কা সামলাতে পারতেন কি না সন্দেহ, তাই বড়ভাই আমার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন। আর এক চরম মুহূর্তে নাকি আমার আবির্ভাব হয়েছিল। রান্না-ঘরে ঢুকে দেখি এক কোণে বসে আম্মা আঁচল মুখে নীরবে কেঁদেই চলেছেন। সমস্ত বাড়ীটা একেবারে থমথম করছে। বেলা আট-টার সময় আব্বার দরবারে আমার ডাক পড়লো। আমি 'বলির পাঁঠার' মতো জন্মদাতার দরবারে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম তাঁর টেবিলের উপর একগোছা বেত শোভা বর্ধন করছে। আমি উপায়ান্তরবিহীন অবস্থায় যন্ত্রচালিতভাবে এগিয়ে গিয়ে আব্বার পা ধরে সালাম করলাম। কেননা খেয়াল ছিল যে, রাতে আম্মাকে সালাম করেছিলাম। কিন্তু আব্বাকে তখনও পর্যন্ত সালাম করা হয়নি। আব্বা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'মওলবী সাবের টাকা ক'টা দিয়েছিস?'

আমি বললাম—'না। টাকা ক'টা খরচ করে ফেলেছি।'

সত্যি কথা বলার জন্যই হোক আর বড়ভাই-এর আকস্মিক পলায়নের জন্যই হোক, আব্বা কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আজ বিকেলে আমার কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে মওলবী সাহেবের কাছে পৌঁছে দিবি। আর পরীক্ষার ফল বের হওয়া পর্যন্ত রোজ দু'পাতা করে হাতের লেখা লিখে দেখাবি।'

আমি নিজের কানকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। পায়ে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে একটা বিকট চীৎকার করে এক দৌড়ে পুলিশ লাইনের ময়দানের দিকে গেলাম। সম্ভবত জীবনের এই প্রথমবার একটা ভয়ানক রকমের অপরাধ করা সত্ত্বেও আব্বার মারের হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

পরে 'দাদার' কাছে শুনেছিলাম যে, আব্বা ক্লাস ফাইভ-এ পড়ার সময় যাত্রা দেখে এতোই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, লেখাপড়ার কথা ভুলে গিয়ে এক যাত্রা পার্টির সঙ্গেই চলে গিয়েছিলেন। প্রায় সপ্তাহকাল পরে আমার দাদা যাত্রা পার্টির খোঁজ করে নিজেদের গ্রাম থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে পায়ে হেঁটে গিয়ে আব্বাকে ধরে এনেছিলেন। কিন্তু দাদাও আব্বাকে এ অপরাধের জন্য মাফ করে দিয়েছিলেন। আর এই মাত্র মাস সাতেক আগে আমার একমাত্র সন্তানকে বহু কষ্টে পশ্চিম পাকিস্তানের এ্যাবোটাবাদ পাবলিক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও মাত্র ৫১ দিনের মাথায় পালিয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পিণ্ডির চাকলালা বিমান বন্দর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল। আর আমি ছেলের এ অপরাধ মাফ করে দিয়েছি। তবে কি বাড়ী থেকে পালানোটা আমাদের গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট নাকি?

বহুদিন পরে ১৯৪৮-৪৯ সালে আব্বা যখন মাদারীপুরের এস. ডি. পি. ও. ছিলেন, তখন আমরা হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছিলাম যে, যাত্রার প্রতি আব্বার কী প্রচণ্ড নেশা রয়েছে। যে

লোক জীবনে বায়োস্কোপ দেখেননি বললেই চলে, সেই লোক মাদারীপুরে মহকুমা পুলিশ অধিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও সারারাত ধরে যাত্রা দেখলেন। শুধু তাই-ই নয়। সকালে নাশতা খাবার সময় প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে ছোটবেলায় যাত্রা দেখার কাহিনী বয়ান করলেন।—

'আমাদের সময় ছেলেরাই যাত্রাতে মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতো। তাই অধিকর্তার হুকুমে এধরনের অভিনেতাদের মেকআপ নেয়ার আগে ভালো করে দাড়ি কামিয়ে নিতে হতো। তখন আমি বগুড়ার চন্দনবাইশা হাই স্কুলের ছাত্র। যাত্রা দেখতে গিয়ে একেবারে ডায়াসের কাছে বসেছি। যাত্রার নাম 'সীতার পাতালপুরী প্রবেশ'। সীতার ভূমিকায় যে অভিনয় করছিল, সে সম্ভবত দিন ছ'য়েক দাড়ি কামায়নি। ভেবেছিল 'মেক-আপ' নেয়ার পর আর কেউ টের পাবে না। কিন্তু যাত্রা শেষ হওয়ার আগেই সকাল হয়ে সূর্য উঠে গেল। তখন হেজাকের আলোও অর্থহীন। একদিকে সূর্যের আলো আর অন্যদিকে সারারাত অভিনয়ের ক্লান্তিতে সীতার ভূমিকায় যে অভিনয় করছিল তার চেহারায় স্পষ্টভাবে খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। এছাড়া হাতের বিরাট কালো লোমগুলোও প্রকট হয়ে দেখা যাচ্ছে। তাই চারদিকে হাসির হৈ চৈ পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সীতারূপী অভিনেতা একবার ডায়াসের বাইরে গিয়ে আর ফিরে এলেন না।'

আমি পলাতক অবস্থা থেকে ফিরে আসার দিন দশেক পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুলো। বিকেলে আব্বা অফিস থেকে 'অমৃতবাজার' কাগজটা হাতে করে এনে চীৎকার করে বললেন, 'ও খোকার মা শুনছো, আমাদের মুকুল যে পাশ করেছে।'

বড়ভাইয়ের ডাকনাম হচ্ছে 'খোকা'। কিন্তু খোকার মা কথা ক'টা শোনার আগেই খোকার ভাই কথা ক'টা শুনে ফেলেছে।

জীবনে আমি যত আশ্চর্য খবর শুনেছি, এই ম্যাট্রিক পাশের খবরটা তার মধ্যে প্রথম স্থান দখল করে রয়েছে।

টিনের সুটকেশ খুলে আমার হেডমাস্টারের লেখা কাগজটা নিয়ে পরদিন গিয়ে হাজির হলাম দিনাজপুর মহারাজা গিরিজানাথ হাই স্কুলের হেডমাষ্টারের রুমে। করজোড়ে নমস্কার করে হেডমাষ্টারের ভবিষ্যৎবাণী লেখা কাগজটা এগিয়ে দিতেই উনি চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এসে প্রথমে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'আমি কি আর অন্তর থেকে বলছিলাম হে? আমার আজ সবচেয়ে আনন্দের দিন। আমার স্কুলের দুটো মাত্র মুসলমান ছাত্র ম্যাট্রিক দিয়েছিল আর দু'জনই পাস করেছে।'

বুকের মাঝ থেকে ছাড়া পেয়ে তাকিয়ে দেখলাম আমার প্রধান শিক্ষকের চোখ মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এখন তিনি আর হিন্দু নন, তিনি সবার উর্ধে একজন শিক্ষক। আজ থেকে ২৪ বছর আগে সেদিন তিনি আমাকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন, তার কথা আজও আমি ভুলিনি—ভুলতে পারি না। কিন্তু আজকের দিনের শিক্ষকদের মধ্যে সে আন্তরিকতা কোথায়? শিক্ষকতার সে মর্যাদাই বা কোথায়?

শেষ পর্যন্ত আমাকে কলেজে ভর্তি করার ব্যাপারে বাসায় ক্রমাগত ভাই, আব্বা আর আম্মার মধ্যে বৈঠক বসতে শুরু করলো। আব্বা আমাকে আই, এস-সিতে ভর্তি করিয়ে দিতে রাজী হলেন। আব্বার ইচ্ছে আমাকে ডাক্তার বানাবেন। কিন্তু আম্মা জেদ ধরলেন তাঁর মেঝো ছেলেকেও আমার সঙ্গে কলেজে ভর্তি করাবেন। মেঝোভাই তখন দিনাজপুরে মুন্সীপাড়ার এক দোকানে খলিফাগিরি শিখছেন। অবশ্য এজন্য তাকে কম কষ্ট করতে হয়নি। মেজোভাই দিব্যি দোকানের মালিককে ওস্তাদ বলে ডাকতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, ওস্তাদের বাড়ীর বাজার করতে শুরু করেছে,

আর দিনের পর দিন ধরে সার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবী, ফ্রক আর ব্লাউজের বোতামের ঘর টাক্‌তে শুরু করেছে। অর্থাৎ বাপের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। এমনি এক সময়ে একরকম ধরতে গেলে আমারই বদৌলতে ভাগ্যলক্ষ্মী মেঝোভাই-এর দিকে মুখ তুলে তাকালো। আম্মার কান্নাকাটিতে আব্বা মেঝোভাইকেও আমার সঙ্গে কলেজে ভর্তি করাতে সম্মত হলেন। প্রায় দু'বছর লেখাপড়া বন্ধ থাকার পর মেঝোভাই আবার চললো ছাত্র হিসাবে নাম লেখাতে। দু' ভাই-এর মনে আনন্দ আর ধরে না। আব্বার কাছ থেকে কড়কড়ে নোট নিয়ে দু' ভাই আব্বা-আম্মাকে সালাম করে এক শুভদিনে চললাম দিনাজপুর রিপন কলেজ (শাখা)-এ ভর্তি হবার জন্য। এ' কলেজের একটা ছোট্ট ইতিহাস রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন জাপানীরা কলিকাতায় বোমা বর্ষণ শুরু করে, তখন কলিকাতার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক মহানগরী থেকে দূর-দূরান্তরে পৈতৃক জীবনটা নিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ আর রিপন কলেজও কলিকাতার বাইরে স্থানান্তরিত হয়। সমগ্র দিনাজপুর জেলায় কোন কলেজ না থাকায় রিপন কলেজের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত কলেজটাকে দিনাজপুরে স্থানান্তরিত করেন। কলেজের কোন নিজস্ব ভবন না থাকায় মহারাজা গিরিজানাথ হাই স্কুল ভবনে সকালে রিপন কলেজের ক্লাশ করার ব্যবস্থা করা হয়। কিছুদিন পর কলিকাতায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে রিপন কলেজ কলিকাতায় আবার তাদের নিজস্ব ভবনে ফিরে যায়।

কিন্তু যে দিনাজপুর শহর বিপদের দিনে আশ্রয় দিয়েছিল, রিপন কলেজ কর্তৃপক্ষ তা' পরিশোধের ব্যবস্থা করলেন। রিপন কলেজ কলিকাতায় ফিরে গেলেও দিনাজপুরে রিপন কলেজের শাখা স্থাপিত হলো। মেইন ও শাখা রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কলিকাতাতেই থাকলেন। আর ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল এসে

দিনাজপুর শাখার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমরা দু' ভাই যখন কলেজে ভর্তি হ'তে গেলাম, তখন শ্রীঅমর ঠাকুর ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময় ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব মহাশয় দিনাজপুর রিপন কলেজের একজন লেক্চারার ছিলেন মাত্র। তিনি আই-এ ক্লাসে লজিক পড়াতেন। অবশ্য বছর দেড়েকের মধ্যে সম্ভবত ১৯৪৬-৪৭ সালে ডক্টর দেব দিনাজপুর রিপন কলেজ (শাখা)কে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে রূপান্তরিত করে নিজেই প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দিনাজপুরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ স্থাপনে ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব-এর দান অপরিসীম। ডক্টর দেব-এর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সুরেন্দ্রনাথ কলেজ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল তা' স্বীকার করতে বাধ্য। অবশ্য ঐ সময় গ্রামে গ্রামে গিয়ে যে ক'জন ছাত্র কলেজটার জন্য চাঁদা আদায় করেছিল, তার মধ্যে আমরা দু' ভাই ছাড়াও মরহুম দবিরুল ইসলাম, জনাব রিয়াজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মোবারক হোসেন, সৈয়দ শফিকুল হোসেন, শ্রীমান কুমার লোহিয়া, অধ্যাপক মুস্তফা নুরুল ইসলাম, শ্রীগোবিন্দ ব্যানার্জি, জনাব আব্দুল হক (আইনজীবী), জনাব মতিয়ুর রহমান (ব্যবসায়ী), জনাব আব্দুর রহমান চৌধুরী (আইনজীবী) প্রমুখ অন্যতম। দিনাজপুর ত্যাগ করার বহুদিন পরে জানতে পেরেছিলাম যে, দিনাজপুরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের নয়া ভবন নির্মাণ হওয়ার পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগেই বিশেষ কারণবশত ডক্টর দেবকে দিনাজপুর ত্যাগ করতে হয়েছিল।

যাহোক, কলেজে ভর্তি হ'তে এসে দেখলাম আমার যে কয়জন বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, সবাই কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য ফরম-এ দস্তখত করছে। আমি আব্বার অমোঘ নির্দেশ-এর কথা ভুলে গিয়ে আই-এ ক্লাসে ভর্তি হলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আর্টস

পড়ে ভবিষ্যতে আমি কি পেশা গ্রহণ করবো, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। বাসায় ফিরে এসে আম্মার কাছে চুপিসারে কথাটা প্রকাশ করলাম আর আব্বার ভয়ে অস্থির হয়ে পাশের ঘরে পায়চারি করতে লাগলাম। আম্মা যে কিভাবে আব্বাকে বোঝালেন তা' বহুদিন পর্যন্ত আমার আন্দাজের বাইরে বাইরে ছিল। শুধু দেখলাম আব্বা ঐ ব্যাপারে আমাকে আর কোন জেরা পর্যন্ত করলেন না।

হঠাৎ করে বুঝতে আরম্ভ করলাম যে, আব্বার নিজস্ব পারিবারিক আইনগুলো আমাদের দু' ভাই-এর উপর আর কড়াকড়িভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে না। মাসে দু'বার করে চুলের 'হাজী' ছাট না ছাটলেও চলে; শেষ রাতে পড়তে না উঠলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না; মগরেবের নামাজ পড়ে আমাদের দু'জনকে বাসায় হাজির না দেখলেও বেত হাতে আব্বা আর আমাদের আগমন প্রতীক্ষায় বসে থাকেন না। কেবল মাঝে মাঝে ডেকে বলেন, 'মনে রাখিস, যে পয়সায় তোদের পড়াচ্ছি, তা' আমার হালাল রোজগারের পয়সা। রক্ত পানি করে ঐ পয়সা কামাই করছি। আল্লাহ্ এর বিচার করবেন।'

কলেজে ভর্তি হওয়ার পর কিছুদিন পর্যন্ত আব্বার এতদিনকার প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক আইনকানুন ভেঙ্গে দু' ভাই মিলে খুবই হৈ চৈ করে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু যেখানে আইনের কঠোর অনুশাসন প্রযোজ্য নয়, সেখানে আইন লংঘনের কোন আনন্দই নেই। কিছুদিনের মধ্যে বুঝলাম যে, শেষ রাতে না উঠলে শরীর খারাপ করে, সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরলে নিজের বিবেকের কাছেই পরিষ্কারভাবে জবাব দিতে পারি না। সিনেমা দেখলে চোখ ব্যথা করে। কেননা মানুষ হচ্ছে অভ্যাসের দাস। তাই এতোদিনকার সব অভ্যাস ছাড়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। এমনকি আজ

প্রায় ২৪।২৫ বছর পরেও ছাড়া সম্ভব হয়নি। এখনো প্রতিদিন শেষ রাতে শয্যা ত্যাগটা আমার কাছে যেন একটা নেশার মতো হয়ে উঠেছে। আর এতে করে আমি প্রতিদিন আমার সমস্তগুলো কাজ গুছিয়ে করতে পারি, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

যাহোক, প্রথম দিন কলেজে গিয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলাম বৈকী। ফার্স্ট ইয়ার আই-এ এবং আই, এস-সির একই সঙ্গে ইংরেজী ক্লাস। তার উপর সহশিক্ষার ব্যবস্থা। প্রায় তিনশ' ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৫২টি মেয়ে। আর এ ৫২ জন ছাত্রীর মাত্র একজন মুসলমান। ছাত্রদের মধ্যে জনাচল্লিশেক মুসলমান। অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে একমাত্র আরবীর অধ্যাপক ছাড়া বাকী সবাই হিন্দু। এই হচ্ছে ১৯৪৫ সালে বাংলাদেশের একটা কলেজের সাধারণ চিত্র।

প্রতিদিন সকাল সাতটায় কলেজ শুরু হয়ে সাড়ে দশটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। কেননা আমাদের ক্লাস শেষ হওয়ার পর মহারাজা স্কুলের ক্লাস শুরু হয়। সারা বছর ধরে সকালে কলেজ থাকায় দুপুরে হাতে প্রচুর সময় থাকে। তাই দুপুরে সময় কাটানোটাই আমার কাছে এক সমস্যা হয়ে দেখা দিলো। এর মধ্যে মেঝোভাই দিনাজপুরেই একটা চাকরী পেলো। তাই কলেজের পর মেঝোভাই দিব্বি অফিস করতে লাগলো। আর আমি একা একা টো টো কম্পানীর ম্যানেজার হলাম। শেষ পর্যন্ত লালবাগে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে যাতায়াত শুরু করলাম। এখানেই আমার তাস খেলার হাতেখড়ি হলো। অবশ্য খেলাটা হচ্ছে ডিক্লেয়ার অর্থাৎ টুয়েন্টি নাইন খেলা।

এরমধ্যে একদিন বড়ভাই-এর লেখা একটা চিঠি এসে হাজির। তাতে মাত্র দুটো লাইন রয়েছে—'বড্ড অসুবিধায় আছি। যদি ইচ্ছে করেন, তবে নীচের ঠিকানায় কিছু টাকা পাঠাতে পারেন'—

খোকা। ঠিকানাটা রাজশাহীর একটি হিন্দু ভদ্রলোকের। চিঠি পড়ার পরেই আম্মা কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর খোকা অর্থাৎ বড় ছেলে অসুবিধায় আছে। তাই এই মুহূর্তে টাকা পাঠাতেই হবে। আর আব্বা হিমালয় পাহাড়ের মতো নিশ্চুপ নির্বিকার। প্রায় ২৪ ঘণ্টা প্রচেষ্টার পর আব্বাকে রাজী করানো সম্ভব হলো। কাশেম আলী নামে আব্বার এক বন্ধু টাকা নিয়ে রাজশাহী রওনা হলেন। এ রাজশাহীর ব্যাপারে আব্বার যে একটা দুর্বলতা রয়েছে, তা আমরা বহুদিন পরে টের পেয়েছিলাম। আব্বা তখন কলিকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে বি. এ. অনার্স-এর ছাত্র। ইতিহাসে তিনি অনার্স নিয়ে পড়লেও ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে ছিল কেমিষ্ট্রি আর সংস্কৃত। তখনকার দিনে এ ধরনের কম্বিনেশন নেওয়া যেত। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার মাস দুয়েক আগে সম্ভবত গোয়েন্দা পুলিশের খাতায় নাম উঠবার ভয়ে আব্বা এসে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হলেন। তখনকার দিনে সমগ্র উত্তরবঙ্গে একমাত্র রাজশাহী কলেজে অনার্স পড়ার ব্যবস্থা ছিল। পড়াশোনা ভালই করলেন। এদিকে পরীক্ষার ফি দেয়ার শেষ তারিখ এসে গেল। কিন্তু বাড়ী থেকে তখনও পর্যন্ত টাকা এলো না। আব্বা খালি মনিঅর্ডার পিয়নের কাছে খোঁজ নিতে লাগলেন। কিন্তু প্রতিবারেই নিরাশ হলেন। উপায়ান্তরবিহীন অবস্থায় আব্বা সন্ধ্যাবেলায় পদ্মার ধারে চরের মধ্যে একলা বসে কাঁদতে লাগলেন। কেননা পরদিন দুপুরে পরীক্ষার ফি দিতে না পারলে একটা বছর তাঁর নষ্ট হয়ে যাবে। তা'ছাড়া আবার এক বছর পড়ার খরচ বাবা নাও দিতে পারেন। সন্ধ্যা তখন হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে মাথা তুলে আব্বা দেখলেন, একটি বছর চৌদ্দের হিন্দু কিশোর ছেলে তাকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করছে। প্রথমে আব্বা নানা কথায় তাকে বিদায় করার চেষ্টা

করলেন। কিন্তু সে ছেলেও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা সব কিছু জেনে নিয়ে উদাও হয়ে গেল। মিনিট পনেরো পরেই ছেলেটা আবার এসে আব্বাকে এক রকম জোর করেই তাদের বাসায় নিয়ে গেল। ছেলেটার বিধবা মা' বেরিয়ে এসে আব্বার সঙ্গে আলাপ করে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজের ছেলের মতো আপন করে নিলেন। তাই বাধ্য হ'য়ে আব্বা তাঁকে মাসীমা বলে ডেকে বসলেন। নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব অনটনে ভরা একটা পরিবার। তবুও সে দুঃস্থা মহিলা আব্বাকে মুসলমান জেনেও অভয় দিয়ে বললেন, 'লক্ষ্মীসোনা, কাল সকালে আমার এখানে এসো, তোমার পরীক্ষার ফি দেয়ার একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। আর রাতে কিন্তু ভালো করে পড়াশুনা করবে, কেমন? তোমার টাকা তো ২।১ দিনের মধ্যে এসেই যাচ্ছে, হয়তো বা পোষ্ট অফিসের গণ্ডগোলে দেরী হচ্ছে।'

পরদিন আব্বা আর একবার পোষ্ট অফিসে খোঁজ নিয়ে নিরাশ হয়ে মাসীমার কাছে গিয়ে হাজির হলেম। মাসীমা একটা কথাও না বলে একটা সিঁদুর মাখা কৌটা এনে আব্বার হাতে দিয়ে বললেন, 'বাবা, এটার মধ্যে আমার শেষ সম্বল চার ভরির গয়না আছে। তুমি এক্ষুনি গিয়ে কোন দোকানে বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে পরীক্ষার ফি দিয়ে দাও। আর ২।১ দিনের মধ্যে তোমার টাকা এলে এটাকে ছাড়িয়ে নিও, কেমন!'

আব্বা হতভম্বের মতো মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলেন। যন্ত্রচালিতের মতো হাত বাড়িয়ে সিঁদুর মাখানো কৌটাটা নিয়ে বাজারের দিকে পা বাড়ালেন।

এ ঘটনার প্রায় দিন তিনেক পরে বাড়ী থেকে আব্বার টাকা এসে পৌঁছালো। আব্বা আবার বন্ধক দেয়া গয়না উদ্ধার করে মাসীমাকে ফেরত দেন। দারিদ্রে বিপর্যস্ত এক হিন্দু বিধবা সেদিন

তাঁর শেষ সম্বল বন্ধক দিয়ে আব্বার পরীক্ষার ফি যোগাড় না করে দিলে সে বছর আর আব্বার পরীক্ষা দেয়া হতো না। হয়তো বা আর এক বছর খরচ চালানো আমার পিতামহের পক্ষে সম্ভব হতো না। আর তা'হলে আব্বার জীবন দিগ্‌ভ্রান্ত হতো, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু আব্বার মাসীমা সেদিন যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা' শুধুমাত্র ভবিষ্যতের দিকে চিন্তা করেই দিয়েছিলেন। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্নই স্থান পায়নি।

যাহোক, দিন তিনেক পরে কাশেম আলী সাহেব একদিন সকালে অসুস্থ বড়ভাইকে নিয়ে দিনাজপুরে ফিরে এলেন। বড়ভাই-এর স্বাস্থ্য তখন একেবারে ভেঙ্গে গেছে। বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আম্মা দৌড়ে গিয়ে বড়ভাইকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না।

বড়ভাই ফিরে আসার পর বাসায় বিরাট হৈ চৈ পড়ে গেল। আব্বার কড়া নির্দেশের কথা ভুলে গিয়ে আমরা সব ক'টা ভাইবোন নানাভাবে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলাম। এমন কী কেউ কেউ 'ভাই এসেছে, ভাই এসেছে' বলে বিকট চীৎকার করতে আরম্ভ করলাম। তারপর ভাই-এর মুখেই শুনলাম পলাতক অবস্থার দিনগুলো তিনি কিভাবে কাটিয়েছেন। রাজশাহীতে বি. এস-সি পড়ার সময় ভাই-এর সঙ্গে জনাব আতাউর রহমান নামে এক ভদ্রলোকের পরিচয় হয়। ইনি ছিলেন আর্ট-এর ছাত্র। বর্তমানে এই রহমান সাহেব রিকুইজিশনপন্থী ন্যাপ দলের একজন বিশিষ্ট নেতা। পাকিস্তান কায়েম হবার পর মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী হবার ফলে বহুদিন কারাবরণ আর আত্মগোপনের জীবনযাপনের পর ইনি এখন রাজশাহীতে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত রয়েছেন।

এই রহমান সাহেবের কাছেই বড়ভাই রাজনীতির প্রথম দীক্ষা লাভ করেন। তখন বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলনের জোয়ার এসে গেছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগে মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আর জনাব আবুল হাশেম-এর দোর্দণ্ডপ্রতাপ। হাশেম সাহেব ছিলেন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বিভাগ হবার সময় মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ পার্টি পলিটিক্সে 'শহীদ-হাশেম' জুটি 'আকরম-নাজিম-আমিন-মোহন-ইস্পাহানীর' কাছে হেরে যাওয়ায় হাশেম সাহেব কিছুদিন পর্যন্ত স্বাধীন ভারতেই থেকে যান। পরে ঢাকায় এসে খেলাফতে রব্বানী পার্টির জন্ম দেন। পরে প্রথম সামরিক শাসন আমলে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে মুসলিম লীগ পুনরুজ্জীবন ও সংগঠনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এটাই পরে কনভেনশন মুসলিম লীগ হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু হাশেম সাহেব এবারেও কনভেনশন মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ 'পার্টি পলিটিক্সে' প্রাক্তন গভর্নর জনাব মোনেম খানের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেননি। বর্তমানে ইনি অন্ধ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত ইসলামিক একাডেমীর ডিরেক্টরের পদ অলংকৃত করে রয়েছেন। তবে বাংলাদেশের যেসব মুসলমান ছাত্র এসময় পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক আদর্শে দীক্ষা দেয়ার মহান দায়িত্ব এ হাশেম সাহেবই গ্রহণ করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, জনাব আবুল হাশেমের প্রচেষ্টার ফলে এসময় অনেক মুসলমান ছাত্রই রাজনীতি সম্পর্কে পড়াশুনা শুরু করেন। এঁরাই তখনকার দিনে 'হাশেমাইট' বলে পরিচিত ছিলেন। জনাব হাশেমের অলিখিত নির্দেশক্রমে ঐ সব মুসলমান ছাত্ররা তখন বিভিন্ন জেলায় ছাত্র ফেডারেশনের (প্রো-কম্যুনিষ্ট) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কাজ

করতে শুরু করেন। কেননা এ ছাড়া মুসলিম ছাত্র-লীগের পক্ষে ছাত্র কংগ্রেসের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এতে করে মুসলিম ছাত্র-লীগের বিপুল সংখ্যক ছাত্র মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে পড়াশুনার সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তীকালে পাকিস্তান কায়েম হবার পর উভয়বঙ্গের প্রথম ছাত্র আন্দোলন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ধর্মঘট থেকে শুরু করে বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত সবগুলো আন্দোলনে এঁরাই নেতৃত্বদানে সক্ষম হন। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে বাঙ্গালী মুসলমান ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন করার কৃতিত্বের অনেকটাই এই হাশেম সাহেবের।

যাহোক, বড়ভাই ধরতে গেলে রাজশাহীতে জনাব আতাউর রহমানের 'শিষ্যত্ব' গ্রহণ করলেন। আবার রহমান সাহেবের নেতা বলতে শহীদ-হাশেম জুটী। তাই কিছুদিনের মধ্যেই বড়ভাই মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা ভালো 'লাইন' তৈরী করতে সক্ষম হলেন। আর বাড়ী থেকে পালিয়ে সোজা কলিকাতায় মুসলিম লীগ অফিসে হাজির হলেন। জনাব হাশেম তখন বাংলাদেশ চষে বেড়াবার কার্যসূচী তৈরী করছেন। বড়ভাই হাশেম সাহেবের চেলাচামুণ্ডাদের দলে নাম লেখালেন আর আরামসে বাংলাদেশ সফর করে বেড়ালেন। কিন্তু এ আরাম তার বেশীদিন সহ্য হলো না। অবিরাম সফরে করে আর খাওয়া-দাওয়া অনিয়মের দরুন ভাই অর্শরোগে আক্রান্ত হলেন। প্রথমদিকে রোগটাকে অবহেলা করলেও পরে আর এর সঙ্গে পেরে উঠলেন না। তাই দল থেকে বিচ্যুত হ'য়ে রাজশাহীতে এক হিন্দু বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। এখান থেকেই আব্বার বন্ধু কাশেম আলী সাহেব ভাইকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। পরবর্তীকালে ভাই অধুনালুপ্ত 'মাসিক অগত্যায়' এ পলায়নের কাহিনী 'ভান্টু উবাচ' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

পরদিন আব্বার এজলাসে বড়ভাই-এর ডাক পড়লো। আমরা সবাই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, ভাইকে তাহলে এ বয়সে মার খেতে হবে? কিন্তু দেখলাম আব্বা তার বড় ছেলেকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করছেন, 'তাহলে কী তোর পড়াশুনার ইচ্ছে আছে?' ভাই উত্তর দিলেন, 'গোয়ালঘর বদলিয়ে দিলে পড়বো।' আব্বা বিকট চীৎকার করে প্রশ্ন করলেন, 'তার মানে?' ভাই মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাইন্স আর পড়বো না, আমি আর্টস পড়বো।' আম্মা পায়ে পায়ে আব্বার কাছে গিয়ে নীচু গলায় কী যেন বুঝালেন। বুঝলাম এর আগেই বড় ছেলে আর আম্মার মধ্যে একটা গোপন বৈঠকে আলাপ হয়েছে। আব্বা ভারী গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, যা ভাল বুঝিস তাই কর, কিন্তু তোকে অনার্স পড়তেই হবে। অনার্স ছাড়া বি-এ পাস করা অর্থহীন।' শেষ পর্যন্ত ভাই আবার বিছানাপত্র বাঁধা-ছাদা করে চললেন রংপুর কারমাইকেল কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়বার জন্য। কলেজটা নাকি খুবই ভালো। এর আগের বছর রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় একটা হিন্দু ছেলে প্রথম স্থান দখল করেছিল।

মাস ছয়েক পরে একদিন সকালে ভাই তার বইপত্র নিয়ে রংপুর থেকে এসে হাজির। বললেন, 'রংপুরে আর পড়া হবে না। ওখানকার হোষ্টেলের খাওয়া খুবই খারাপ।' আমরা সবাই লক্ষ্য করলাম ভাইএর চেহারার সেই লাবণ্য আর নেই। এরপর কয়েকদিন ধরে বাসায় খালি বৈঠক শুরু হলো। অবশেষে দিনাজপুর রিপন (ব্রাঞ্চ) কলেজে ভাইকে বি-এ (পাস) ভর্তির সিদ্ধান্ত করা হলো। কেননা দিনাজপুরে রিপন কলেজে তখন অনার্স ছিল না। এখনও আছে কিনা জানি না। যাহোক, যে ছাত্র একদিন অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি. এস-সি পড়েছিল, আর

যাকে তাঁর বাবা শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি করার জন্য সব ব্যবস্থা ঠিক করছিলেন, সেই ছাত্রই শেষ পর্যন্ত বি. এ-তে ভর্তি হলো। অবশ্য বড়ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান দখল করেছিলেন। কিন্তু অনার্স না থাকায় করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর তিনি এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন। অবশ্য সম্প্রতি লণ্ডনে ডক্টরেট করার জন্য অধ্যয়ন করছেন।

আমরা দু'ভাই কলেজে ভর্তি হবার পর পরই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো। কয়েক মাসের মধ্যে শীত এসে গেল। দিনাজপুরের শীত পূর্ব বাংলার নামকরা শীত বলতে হয়। এখানকার শীতের তীব্রতা খুবই বেশী। তাই প্রতিদিন সকালে কলেজে হাজির হওয়াটা আমাদের পক্ষে দুঃসহ মনে হলো। কিন্তু উপায় নেই। তীব্র শীত আর ঘন কুয়াশার মধ্যে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যেই দেড় মাইল দূরে কলেজে হেঁটে যেতে হতো। এ সময় আমরা দু' ভাই-ই হাফপ্যান্ট পরেই কলেজ করতাম। কিন্তু সমপাঠীদের বিদ্রূপ আর সমপাঠিনীদের মুচকী হাসির জন্য অস্থির হয়ে দু'ভাই ধুতি পরতে শুরু করলাম আর দু'জনেরই চালচলনে কোন তফাত রইলো না। তাই কলেজের সহপাঠী থেকে অধ্যাপকরা পর্যন্ত আমাদের সনাক্তের ব্যাপারে ভুল করতে লাগলো। আমরা দু'জনেই এসব ভুলের জন্য বহু সুবিধা পেতাম বৈকী।

এমন সময় বগুড়া থেকে আমাদের মামা এসে হাজির হলেন। এই বিশ্বে আপন মামা বলতে এই একজনই ছিলেন। সম্প্রতি ইনি পরলোকগমন করেছেন। কিন্তু আমাদের এ মামার কাহিনী না বলা হলে সব কিছুই অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। ভদ্রলোকের স্ত্রী ভাগ্যটা খুবই খারাপ। পর পর তিনটি বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু তিনজন সহধর্মিণীই অকালে পরপারে চলে যান।

অন্যদিকে আমাদের কোন খালাও নেই। মা আর মামা—এঁরা ছিলেন মাত্র এক ভাই, এক বোন। তাই বলতে গেলে প্রতি বছরই আমার মামা একবার করে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসতেন। আব্বা আর মামা সমসাময়িক হলেও দু'জনের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। কোথাও যেতে হলে আব্বা যেখানে কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে ষ্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করতেন, সেখানে আমার মামা শেষ মুহূর্তে দৌড়া-দৌড়ি করে ট্রেন ফেল করতেনই। বাজারে গেলে মামার পক্ষে তিন-চার ঘণ্টার কমে বাজার শেষ করা সম্ভব হতো না। কেননা সবচেয়ে সস্তায় তাঁকে বাজারের সবচেয়ে ভালো জিনিস কিনতে হবে। আর এসব জিনিস কিনতে গিয়ে দোকানদারদের পারিবারিক ইতিহাসও জেনে আসতে হবে। বাড়ীর অবস্থা ভাল বলে চাকরী করাটা তার কাছে কিছুটা সখের ব্যাপার ছিল। ময়মনসিংহের একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে তিনি কিছুদিন চাকরীও করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোন সময়েই তার ফ্যামিলি কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাননি।

প্রতি শনিবারে তিনি বগুড়ায় যেতেন এবং বছরের পর বছর এ লাইনে এতো বেশী যাতায়াত করেছিলেন যে, রেলের চেকার, গার্ড ছাড়াও ইঞ্জিনের ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানদের সাথেও তিনি অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন। ফলে ট্রেনে যাতায়াতের সময় তাঁর টিকিটের কোন প্রয়োজনই হতো না।

এহেন মামার আগমনে, দিনাজপুরে আমাদের বাসা সরগরম হয়ে উঠলো। মামার সঙ্গে বাজারে যাবো বলে বেরিয়েছি। আমাদের পাশের বাসার নতুন বিয়ে হওয়া বউটি স্বামী অফিসে যাওয়ার পর বাইরের ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এক মনে রাস্তার লোক চলাচল দেখছিল। সুন্দরী নব-বিবাহিত তন্বীকে এভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় আমি হতবাক হয়ে

গেলাম। চলন্ত অবস্থায় মামা আমার মাথাটাকে দু'হাতে ধরে সুন্দরী বউটির দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। বললেন, 'পুরুষের মত পুরুষ হও। আড়চোখে না তাকিয়ে দৃঢ় দৃষ্টিতে সৌন্দর্য উপভোগ করো। এ ব্যাপারে লজ্জার কিছু নেই।' আমি লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলাম।

সত্যি বলতে কি, মামার প্রচেষ্টার জন্যই আব্বার বিয়ে সম্ভব হয়েছিল। বি-এ অনার্স পাস করার পর আব্বা তখন হন্যে হয়ে চাকরী খুঁজছেন। তখনকার দিনে সুপারিশ ছাড়া কারো চাকরী হওয়া মুশকিল ছিল। তার উপর মুসলমান ছেলের পক্ষে চাকরী যোগাড় করাটাও ছিল দুরূহ ব্যাপার।

তাই শেষ পর্যন্ত আব্বা রংপুর জেলার মহিমাগঞ্জ হাই স্কুলে একটা মাষ্টারীর চাকরী নিলেন। খাতাকলমে যে টাকা মাইনে দেয়া হয় বলে লেখা আছে, তা' আসলে দেয়া হয় না। অবশ্য চাকরীতে নিয়োগের সময়েই কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন। এ'ছাড়া বাকী মাইনেটাও একবারে পাওয়ার উপায় ছিল না। প্রতি হাটবার বাজারের ফর্দ দেখে টাকা দেয়া হতো। তাই স্কুল মাষ্টারীতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আব্বা একটা ব্যাংকের ম্যানেজারীর চাকরী নিয়ে বরিশাল জেলার গলাচিপার দক্ষিণাঞ্চলে সুন্দরবনের মধ্যে এক অখ্যাত জায়গায় চলে গেলেন। ব্যাংকের কাজ ছিল ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের টাকা-পয়সা জমা নেয়া। এখানেই আব্বার সঙ্গে মামার পরিচয় হয়। ইনি তখন জীবনে রোমাঞ্চের আশায় ঐ ব্যাংকে কেরানীর চাকরী নিয়ে এসেছিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মামা তাঁর আচার-ব্যবহারে আব্বার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন আর ধীরে ধীরে আব্বাকে তাঁর ভগ্নিপতি করার ব্যাপারটা পাকাপোক্ত করে ফেললেন। পরবর্তীকালে আব্বা দারোগার চাকুরী নিয়ে ৩১ বছর পুলিশে চাকুরী করলেও সারাটা জীবনই মামা সব সময়েই আব্বাকে ম্যানেজার সাহেব নামেই ডাকতেন।

আমাদের এহেন মামা সারাটা জীবন খালি রোমাঞ্চের পিছনেই ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু বোধহয় তিনি বঞ্চিতই থেকে গেছেন। তাই শেষ বয়সে বসে বসে উপন্যাস পড়া, কবিতা লেখা আর বায়োস্কোপ দেখা ঐ ক'টা কাজই করে গেছেন। তবে কারো বিয়ের জন্য পাত্রী দেখে পছন্দ করে দেয়ার ব্যাপারে মামা সব সময়েই অগ্রণী ছিলেন আর কাজটা তিনি খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে করতেন। পাত্রীদের জন্য তার একটা ২৯ দফার প্রশ্নমালা ছিল। এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাবার পর পাত্রী হবে ভোরের শুকতারার মতো নিষ্কলঙ্ক, শরতের শুভ্রমেঘের মতো সরল, হেমন্তের শিশির পরা ভোরের মতো স্নিগ্ধ আর ফাল্গুন পূর্ণিমার মতো সুন্দরী।

মামার চরিত্রের খানিকটা আম্মার মধ্যে রয়েছে। হাজার হলেও তো এক মায়ের পেটের ভাই-বোন। তাই আম্মা হচ্ছেন সব সময়েই ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। উত্তেজনা বলে কোন জিনিস আজও পর্যন্ত তাঁর মধ্যে দেখতে পাইনি। চৌদ্দটা ছেলেমেয়ের মা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঘুণাক্ষরে কোনদিনই কারো গায়ে কখনো হাত তোলেননি। কিন্তু ছেলেমেয়ের যা কিছু শাসন করবার তা আব্বার মারফত করিয়েছেন। বিকেল বেলা আব্বা অফিস থেকে ফিরে আসবার পরেই আম্মা সব কিছুই তাঁকে রিপোর্ট করে দিতেন। আর আব্বা এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই সন্ধ্যেবেলা আমাদের উপর শাসন করতেন। তাই পর্দার আড়াল থেকে যাঁর অঙ্গুলি হেলনে আমাদের পরিবারের প্রতিটা ব্যাপার বছরের পর বছর ধরে ঘটে গেছে, তাঁকে যখন আবিষ্কার করলাম, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। কেননা তখন আমি কলেজের ছাত্র আর আমার মুখে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। আর এদিকে আব্বাও তাঁর শাসনের চৌহদ্দি থেকে আমাদের বের করে দিয়েছেন। এখনও কোন অবসর মুহূর্তে যখন পিছনে ফেলে

আসা দিনগুলোর দিকে তাকাই, তখন মনে হয়, এক অর্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে, দারোগার বধূ হিসেবে এসে কত সন্তর্পণে আর বুদ্ধির প্রখরতা দিয়ে পরোক্ষভাবে শাসন করে এতোগুলো ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমার জন্মদাতার মতো রাশভারী লোককে এখনও পর্যন্ত সামলে চলে সংসার চালাচ্ছেন।

যাহোক, দিনাজপুরে কলেজে পড়ার সময়ই দবিরুল ইসলাম নামে বি-এ ক্লাসের একজন ছাত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো। সত্যি কথা বলতে কি, কলেজের একটা মিটিং-এ ভদ্রলোকের অনলবর্ষী বক্তৃতা শুনে আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এঁর হাতেই রাজনীতিতে আমাদের দু' ভাইয়ের প্রথম হাতেখড়ি হলো। আমরাও বড়ভাইয়ের মতো পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাংলাদেশের ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সময় আব্বা কলকাতার আই. বি. দফতরে পাঁচ বছর চাকরী করেছিলেন বলে ছেলেরা যাতে করে রাজনীতির সংস্পর্শে আসতে না পারে, তার জন্য সারাটা জীবনই চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের জোয়ারে তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো বৈকী! লেখাপড়া এক রকম বাদ দিয়েই আমরা ক'ভাই ছেচল্লিশের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীকে বিজয়ী করবার জন্য আর দশটা মুসলমান ছেলের মতোই গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লাম।

এমনি এক সময়ে মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী দিনাজপুরে এসে হাজির হলেন। শহরের অদূরে বিরল নামে এক জায়গায় মুসলিম লীগের জনসভার আয়োজন করা হলো। কিন্তু সভা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম যে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের জন্য তৎকালীন সরবরাহ বিভাগের

মন্ত্রী জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীকে দায়ী করে হাজার হাজার প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় পাকিস্তান-এর দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণ করে কংগ্রেসের বিলি করা প্রচারপত্রের জবাব দিতে গিয়ে বললেন, 'হামি তো তখন সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ছিলাম না, আমি ছিলাম সর্বহারাদের মন্ত্রী।' মুখ থেকে কথা ক'টা বের হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাজারো কণ্ঠে 'নারায়ে তক্‌বীর আল্লাহ্‌ আক্‌বর' আর 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তাঁকে বক্তৃতা মঞ্চ থেকে কাঁধে তুলে রেল ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হলাম। গ্রামের লোকেরা ভাবলো কলিকাতার এ নেতা মুসলমানদের জন্য একটা কিছু সাংঘাতিক কথা বলেছেন। কিন্তু কি কথা বলছেন তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারলেন না। চারিদিকে শুধু মুসলিম লীগের জয়জয়কার পড়ে গেল। এটাই ছিল ছেচল্লিশের নির্বাচনের প্রচার পদ্ধতির একদিক। আর এ নির্বাচনেই মুসলিম লীগ বাংলাদেশে 'কলা গাছ'কে নমিনেশন দিয়ে নির্বাচিত করতে পেরেছিল। নির্বাচন অন্তে দেখা গেল যে, মুসলিম লীগ মোট ১১৮টা মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৬টার মতো আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছে। কেবলমাত্র শেরে বাংলা দুটো আসন থেকে লীগ প্রার্থীদের পরাজিত করে একাই নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যে দিনাজপুর, রংপুর আর জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত 'তে-ভাগা' আন্দোলনের জোয়ার এসে গেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েৎ রাশিয়া নাৎসীদের পক্ষ ত্যাগ করে মিত্রপক্ষের দিকে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা মার্ক্সীয় দর্শনে দীক্ষিত লোকদের কাছে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা 'হাস্যকর' মনে হলেও মার্ক্সীষ্টদের পক্ষ থেকে এর একটা

কৈফিয়ৎ দেয়া হয় বৈকী। যাহোক বিশ্ব রাজনীতির বৃহত্তর স্বার্থেই বৃটিশ সরকার ভারতে ১৯৪২—৪৩ সাল থেকেই কম্যুনিষ্ট দর্শনে বিশ্বাসী লোকদের প্রকাশ্যেই নিজেদের মতবাদ প্রচারের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়। এ সময়ে বৃটিশ ভারতেয় কারাগারগুলোতে বিশেষ করে আন্দামান, হিজলী, বক্‌সা, বহরমপুর, রাজশাহী, ঢাকা, আলীপুর প্রভৃতি জেল আর 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে' যে সব বাঙালী হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বছরের পর বছর ধরে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। সশস্ত্র বাহিনীর কড়া প্রহরার মধ্যেও প্রতিটি জেলখানা আর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-এ বন্দী সন্ত্রাসবাদীদের কাছে মার্ক্সীয় দর্শনের প্রচারণামূলক বইগুলো হাজির হলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যে বন্দী সন্ত্রাসবাদীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদল চিন্তা করলো মুক্তি লাভের পরও সন্ত্রাসবাদীমূলক কাজ চালিয়ে যেতেই হবে। এদের বিশ্বাস সাদা চামড়ার অফিসারদের একটার পর একটা হত্যা করতে থাকলেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় দল সমাজতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে জনতার বিপ্লবে বিশ্বাসী হলো। ফলে বেশ কয়েক বছর ধরেই এ উপমহাদেশের কারাগারগুলোতে এ দুটো দলের মধ্যে প্রথমে তর্কযুদ্ধ তার পরে সংঘর্ষ হতে থাকলো। ঐ প্রসঙ্গে এ উপমহাদেশ-এর কম্যুনিষ্টদের শিক্ষাগুরু কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদের কথা না বললে সমস্ত ব্যাপারটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইনিই সর্বপ্রথম কলিকাতার রাস্তা-ঘাটে একটা লাল পতাকা নিয়ে একাকী 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' আর 'মেহনতী শ্রমিক এক হও' শ্লোগান দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। অনেকে নোয়াখালীর এ ভদ্রলোককে 'উন্মাদ' আখ্যা পর্যন্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মাত্র ৪৫।৫০ বছরের ব্যবধানে শুধু যে এ উপমহাদেশ-এর সর্বত্র কম্যুনিষ্ট পার্টি তার সংগঠন করতে সক্ষম

হয়েছে, তাই-ই নয়—ভারতের কেরালা রাজ্য, পশ্চিম বাংলায় এরা পার্লামেন্টারী রাজনীতি মারফত ক্ষমতাসীন পর্যন্ত হয়েছেন। কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁরই সৃষ্টি কম্যুনিষ্ট পার্টির এ অগ্রগতি অবলোকন করছেন। অবশ্য তিনি দ্বিধা-বিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির মারপিটও দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে লক্ষ্যও করছেন।

এহেন কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ সম্পর্কে আব্বার কাছ থেকে অনেক গল্পই শুনেছি। কেননা আব্বা ১৯২৬—২৭ সাল থেকে ১৯৩৪—৩৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় গোয়েন্দা পুলিশের চাকরী করেছেন।

আব্বার দফতর ছিল ১৩ নম্বর লর্ড সিংহ রোডে, যে তেরো নম্বরের কথা শুনলে সেকালের বাঙ্গালী শিক্ষিত লোক মাত্রেই ভয়ে আঁৎকে উঠতেন। আর আমাদের বাসাটা ছিল বৈঠকখানা রোডে। এটাকে বাসা না বলে একটা দুর্গ বললেই চলে। কেননা নীচের তলায় প্রায় শ'খানেক 'ওয়াচার'-এর বাসস্থান, দোতলায় চারটা ফ্লাটে চারজন দারোগার ফ্যামেলী কোয়ার্টার, আর তিনতলায় দু'জন ইন্সপেক্টর ও চারতলায় একজন ডি. এস. পি-র থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বাসাটার সামনে রাতদিন ধরে সেন্ট্রী গার্ড দিতো। এখানে আর একজন মুসলমান দারোগা সৈয়দ এমদাদ আলীও ('এইখানে মোঘলের মুকুট রতন' খ্যাত) থাকতেন। তখনকার দিনে বাংলাদেশের মুসলমানদের দু'চারজন নওয়াব আর জমিদার ছাড়া আর কেউই রাজনীতি করতো না। অবশ্য এদের রাজনীতিও ছিল অনেকটা বৃটিশদের মোসাহেবী ধরনের রাজনীতি। তাই এদের সম্পর্কে গোয়েন্দা পুলিশের কোন মাথাব্যথাই ছিল না। গোয়েন্দা পুলিশ কেবলমাত্র সন্ত্রাসী আর কংগ্রেসীদের পিছনে ঘুরে

বেড়াতো। এমন এক সময়ে কম্যুনিষ্টদের উপর লক্ষ্য রাখার জন্য গোয়েন্দা পুলিশদের উপর নির্দেশ এলো। কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশ অনেক চেষ্টা করে দেখলেন যে, নোয়াখালীর অজ পাড়াগাঁ-এর এক যুবক মুজাফ্ফর আহমেদ এই কম্যুনিষ্ট পার্টি সংগঠন করে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামে ফাইল তৈরী হোল আর তাঁর পিছনে টিকটিকি লাগিয়ে দেয়া হলো। এছাড়া পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে গোপন ব্যবস্থা হিসেবে কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ-এর চিঠিপত্র সেন্সার করার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু আশ্চর্য হলেও একথা ঠিক যে, গোয়েন্দা বিভাগের মুসলমান কর্মচারীরা নিজেদের অবচেতন মনে কমরেড আহমেদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলো। কেননা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে ইনি প্রথম সক্রিয় বৈপ্লবিক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তেরো নম্বরের মুসলমান কর্মচারীরা মুজাফ্ফর সাহেবের চিঠিপত্র পড়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। নোয়াখালী থেকে তাঁর স্ত্রীর চিঠিতে পরিবারের আর্থিক অনটনের করুণ কাহিনী ফুটে উঠেছে। তা'ছাড়া মেয়ে তেরো বছর পার হয়ে যাওয়ায় মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য তার স্ত্রী অস্থির হয়ে উঠেছেন। কলিকাতার গোয়েন্দা পুলিশের মুসলমান কর্মচারীরা সলা-পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, একজন মাত্র বাঙ্গালী মুসলমান যেখানে সক্রিয় রাজনীতি করছেন, সেখানে তাঁর মেয়ের একটা ভালো বিয়ে দিতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব আর আব্বা মাসিক সওগাত অফিসে ভরদুপুরবেলায় গিয়ে হাজির হলেন সওগাতের মালিক-সম্পাদক নাসির উদ্দীন সাহেবের কাছে। সবকিছু শুনে নাসির সাহেব বললেন, 'পাশের ঘরের টেবিলের উপর দুটো

বেকার যুবক পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। ওদের মধ্যে যার স্বাস্থ্য ভালো আর বেশ লম্বা-চওড়া সেই হচ্ছে মুসলমান। আপনাদের পছন্দ হয় কিনা দেখতে পারেন। ঐ দু'জনেই পরবর্তীকালে নামকরা সাহিত্যিক হয়েছিলেন। হিন্দু যুবকের নাম হচ্ছে শ্রীপবিত্র গাঙ্গুলী আর মুসলমান যুবকই হচ্ছেন ছন্দের যাদুকর আব্দুল কাদের। ইনি পাকিস্তান কায়েম হবার পর বহুদিন পর্যন্ত সরকার পরিচালিত মাসিক মাহে নও পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

যাহোক, পাত্র পছন্দ হবার পর আব্বা আর এমদাদ আলী সাহেব ঘটকালীর সমস্ত দায়িত্বই নাসির উদ্দিন সাহেবকে দিয়ে বললেন, 'আমরা যে বিয়ের পিছনে আছি, কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ যেন ঘুণাক্ষরে তা টের না পান। যদি কোন রকমে এ গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়, তবে হয়তো এ বিয়েটা ভেঙ্গেই যাবে।' একরকম ধরতে গেলে বিধাতার ইচ্ছাতেই এ বিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যায়। হয়তো কমরেড সাহেব আজও পর্যন্ত এ গোপন ইতিহাস জানতে পারেন নি।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত ছেচল্লিশের নির্বাচনে জয়লাভ করে বাংলাদেশে জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে লীগ মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন হলো। আর শহীদ সাহেব প্রধানমন্ত্রী হবার কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিলেন। এরপর দেখা গেল যে রাজনীতির মোড় এত দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির আর কোন স্থান নেই বললেই চলে। ফলে বহু বছর পর আন্দামান আর ভারতের বিভিন্ন জেল থেকে মুক্ত হয়ে এদের অনেকেই রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। আর বাকীরা সমাজতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন। এমনি এক সময়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি রংপুর, দিনাজপুর আর জলপাইগুড়িতে তে-ভাগা

আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ সব অঞ্চলে জমিদারীর চেয়েও জোতদারী প্রথার প্রচলন খুব বেশী। জোতদারী প্রথায় জোতদাররা শুধুমাত্র জমির মালিক হয়ে বিনা খরচ আর খাটনিতে জমির অর্ধেক ফসলের ভাগ পেতেন। কিন্তু আন্দোলনের মূল শ্লোগানই ছিল যে, জমির উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দু'ভাগ কৃষকের প্রাপ্য। এটাই হচ্ছে 'তে-ভাগা'।

খুব অল্প দিনের মধ্যেই 'তে-ভাগা' আন্দোলনের জোয়ার দিনাজপুর জেলাকে তোলপাড় করে দিলো। হিন্দু, মুসলমান, সাঁওতাল আর পলিয়া সমস্ত শ্রেণীর কৃষকরা এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দিনাজপুর জেলার জোতদারদের শতকরা প্রায় ৭০।৮০ ভাগই মুসলমান হওয়ার জন্য আমরা এ আন্দোলনকে বিশেষ সুনজরে দেখলাম না। কিন্তু আন্দোলনের হোতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ-এর নাম তখন রূপকথার নায়কের মতো লোকের মুখে মুখে চালু হয়ে গেল। এই হাজী সাহেব হচ্ছেন কমরেড মুজাফফর আহমেদ-এর খুবই প্রিয়ভাজন সমর্থক। প্রায় প্রতিদিনই কলেজে গিয়ে হাজী দানেশের সম্পর্কে নিত্য নতুন গল্প শোনার পর এঁকে চর্মচোখে দেখার জন্য আমরা অস্থির হয়ে উঠলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তখন শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে কারও সাহস হচ্ছিল না। গ্রামাঞ্চল থেকে বড় বড় জোতদাররা পালিয়ে শহরে এসে আশ্রয় নিলো। এদের পক্ষে তখন গ্রামে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে উঠলো, কেননা ভাগাওয়ালারা দৈহিক অত্যাচার না করলেও অর্থনৈতিক 'বয়কট' করে জোতদারদের অবস্থা কাহিল করে তুললো। সমস্ত হাটগুলোয় কৃষাণ সমিতির চাঁদার রশিদ না দেখালে ঢুকতে দেয়া হতো না। এ সময় জেলা প্রশাসক জনাব হাসান তোরাব আলী (আই. সি. এস.) উপায়ান্তরবিহীন হয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সশস্ত্র

পুলিশের সাহায্যের জন্য সৈন্যবাহিনী চেয়ে পাঠালেন। সৈন্যবাহিনী যখন এসে পৌঁছুলো তখন সমগ্র ঠাকুরগাঁ মহকুমা তে-ভাগাওয়ালাদের কব্জায় চলে গেছে। এছাড়া বালুরঘাট মহকুমা (বর্তমানে পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত) আর সদর মহকুমার চিরির বন্দর, বিরল ইত্যাদি এলাকার 'তে-ভাগা' আন্দোলনের হিড়িক সরগরম হয়ে উঠেছে। চারদিক থেকে খালি গুলীবর্ষণ, কৃষক হত্যা আর সাপের বিষধর তীরে পুলিশের মৃত্যু সংবাদ আসতে লাগলো। আমরা প্রায়ই বাসার সামনে পুলিশ লাইনে পুলিশের লাশের গার্ড অব অনার আর কলেজ যাওয়ার পথে হাসপাতালে গরুর গাড়ীতে আনা কৃষকের লাশ দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম।

শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সমগ্র ঠাকুরগাঁ মহকুমাটা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অর্থাৎ সমগ্র মহকুমাটার চারদিক দিয়ে আগুন লাগিয়ে সৈন্যবাহিনী আর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মহকুমার অভ্যন্তরের দিকে এগিয়ে যাবে আর পথে সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দিয়ে 'তে-ভাগা' আন্দোলনের নেতাদের গ্রেফতার কিংবা গুলী করে হত্যা করবে।

ছেচল্লিশের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ থেকে জনা তিন-চারেক কম্যুনিষ্ট প্রার্থী পরিষদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ বামপন্থী জননেতা শ্রীজ্যোতি বসু অন্যতম। এ'ছাড়া দার্জিলিং থেকে রতনলাল ব্রাহ্মণ আর দিনাজপুর থেকে রূপনারায়ণ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে দিনাজপুর থেকে রূপনারায়ণ রায়-এর বিজয় সেদিন সমস্ত বাংলাদেশে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কেননা রূপনারায়ণ রায়ই ছিলেন বাংলাদেশের মফস্বল অঞ্চল থেকে নির্বাচিত প্রথম কম্যুনিষ্ট পরিষদ সদস্য। এঁকে নির্বাচিত করার পিছনে হাজী মোহাম্মদ দানেশের অবদান

ছিল সবচেয়ে বেশী। দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে রূপনারায়ণ রায়ের বিজয় লাভের ফলে পার্টির কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে হাজী সাহেবের মনে এ বিশ্বাস স্থাপিত হয় যে, সুষ্ঠুভাবে সংগঠন করতে পারলে এ জেলার কৃষকের মধ্যে একটা গণআন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব। এদিকে সাধারণ নির্বাচনের পরেই মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসের কর্মীরা গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে শহরে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাই খুব অল্প দিনের মধ্যেই 'তে-ভাগা' আন্দোলনের ঢেউ উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে দিনাজপুর জেলার পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লো।

শত শত জোতদার গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করায় তে-ভাগাওয়ালারা এঁদের জমির ধান কেটে নিয়ে কিষাণ সমিতির বারোয়ারী গোলায় উঠাতে লাগলো। কিন্তু বৃটিশ সরকার এ ব্যাপারে খুবই বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

এর মধ্যে একদিন দিনাজপুর শহরে তে-ভাগাওয়ালাদের প্রচারপত্র ছাড়া হলো যে, ওঁরা পরবর্তী রোববারে দিনাজপুর টাউনে 'র‍্যালী' করবে। অর্থাৎ সমস্ত দিন ধরে টাউনে শোভাযাত্রা করবে আর আন্দোলনের সমর্থনে শ্লোগান দেবে। সেদিনকার কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। শহরের লোকজন সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউই বাড়ীর বাইরে পর্যন্ত আসেননি। পুলিশ লাইনে শত শত সশস্ত্র পুলিশ পরিস্থিতির মোকাবেলায় তৈরী রাখা হলো। অবশ্য উপর থেকে নির্দেশ এলো যে, তে-ভাগাওয়ালারা হিংসাত্মক কিছু না করলে অথবা আইন শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটালে যেন সংঘর্ষে না যাওয়া হয়। অন্যদিকে কোতোয়ালী থানা কর্তৃপক্ষকে থানার প্রধান গেট বন্ধ করে থাকার হুকুম দেয়া হলো।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা দলে দলে এসে শহরে ঢুকতে শুরু করলো। বেলা দশটা নাগাদ সমস্ত শহরটা লাল পতাকায় ভরে উঠলো। হাজার হাজার কৃষক বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়ে সমস্ত দিন ধরে শোভাযাত্রা করে সন্ধ্যার আগেই ফিরে গেল। বেসরকারী হিসেবে এদের সংখ্যা দু'লাখের মতো ছিল। কিন্তু এদের শোভাযাত্রার কোথাও সামান্যতম ছন্দপতন হয়নি, কোথাও বিন্দুমাত্র গোলযোগ পর্যন্ত হয়নি। মনে হলো যেন একটা সুশৃঙ্খল সৈন্যদল সমস্ত দিন প্যারেড করে গেল। শহরবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সেদিনকার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যদি সামান্যতম হঠকারিতার পরিচয় দিয়ে এদের বাঁধা দান করতে যেতো, তবে হয়তো দিনাজপুর শহরেই 'জালিয়ানওয়ালাবাগে'র পুনরাবৃত্তি ঘটতো। অথচ এধরনের একটা সিদ্ধান্ত নেয়া তৎকালীন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। কেননা সেদিনকার এ শোভাযাত্রায় যাঁরা নেতৃত্বদান করেছিলেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই পুলিশের হুলিয়া ছিল। কিন্তু সম্ভবত একটা অবাঞ্ছিত ঘটনাকে পরিহার করার জন্যই তৎকালীন প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সযত্নে সংঘর্ষকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। আর 'তে-ভাগা' কর্মীরাও যে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন, তা' অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু এর মধ্যে ঠাকুরগাঁ মহকুমার অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগলো। সমস্ত মহকুমাটা ঘেরাও করে চারদিকে আগুন লাগিয়ে বৃটিশ সরকারের সৈন্যবাহিনী 'তে-ভাগা' আন্দোলন দমাবার জন্য বদ্ধপরিকর হলো। এদিকে রাণী-শঙ্কাইল থানা (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত) থেকে এক দুঃসংবাদ এসে পৌঁছালো। থানার দারোগা সাহেবকে নাকি তে-ভাগাওয়ালারা গ্রেফতার করা ছাড়াও, গোটা দলের রাইফেল নিয়ে চলে গেছে। সৈন্যবাহিনী

আর সশস্ত্র পুলিশের দল প্রায় এক সপ্তাহ প্রচেষ্টার পর যখন দারোগা সাহেবকে উদ্ধার করলো, তখন তাঁর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছিল। শোনা যায় তে-ভাগাওয়ালারা ঐ দারোগা সাহেবের বিচার পর্যন্ত করেছিলেন। কেননা তে-ভাগা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত জনাকয়েক অভিযুক্ত গ্রাম্য নেতাকে গ্রেফতার করতে গিয়ে উনি গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করেছিলেন। তাই বিচারে দারোগা সাহেবের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। ভদ্রলোককে একটা আখক্ষেতের মধ্যে সুরক্ষিত ঘর থেকে হাতবাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

কলেজে গিয়ে প্রতিদিনই 'তে-ভাগা' আন্দোলনের নতুন নতুন আর চাঞ্চল্যকর সংবাদ শুনে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে আলোড়নের সৃষ্টি হলো। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের ঢেউটা যেকোন কারণেই হোক আমাদের মনকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। বোধহয় পরাধীনতার অভিশাপ আর প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের আধিপত্য আর 'অত্যাচার'ই এর জন্য দায়ী। তাই আমরা সবকিছুর উর্ধ্বে পাকিস্তান আন্দোলনের স্বার্থকে স্থান দিলাম। স্কুল-কলেজের প্রতিটি মুসলমান ছাত্রের বই আর খাতায় প্রস্তাবিত পাকিস্তানের হাতে আঁকা ম্যাপ শোভাবর্ধন করতে লাগলো। আমাদের বলা হলো যে, দিনাজপুর আর রংপুরের শতকরা সত্তরজন জোতদার মুসলমান বলে এ'দুটো জেলাতে হিন্দু নেতৃত্বের কম্যুনিষ্ট পার্টি 'তে-ভাগা' আন্দোলন শুরু করেছে। এতে করে মুসলমান জোতদারদের যে কিছুসংখ্যক ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শুরু করেছে, তাদের ভবিষ্যত চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। অথচ বর্ধমান আর প্রেসিডেন্সী বিভাগের অনেক জায়গায় জোতদারী প্রথা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু জোতদারদের সংখ্যা বেশী বলে কিষাণ সমিতি আর কম্যুনিষ্ট পার্টি সে সব অঞ্চলে 'তে-ভাগা' আন্দোলনের প্রচেষ্টা করেনি। মুসলিম লীগ

কর্তৃপক্ষের ঐ ধরনের যুক্তি আর পাকিস্তান আন্দোলনের হিড়িকের জন্যই দিনাজপুরের মুসলমান ছাত্র সমাজ 'তে-ভাগা' আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন তো দিতে পারেইনি, বরং শেষের দিকে এর বিরোধিতা পর্যন্ত করেছিল।

এমন সময় খাঁপুরের (বর্তমানে বালুরঘাট মহকুমায়) লোমহর্ষক ঘটনার খবর এসে পৌঁছালো। যে পশ্চিমা হাবিলদার ঐ পৈশাচিক ঘটনার সময় উপস্থিত থেকে গুলীবর্ষণের নির্দেশ দিয়ে নিজেই অংশ নিয়েছিলেন, সেই হাবিলদার যখন আব্বার কাছে এর বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছিলো, আমি তা' ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম।

ঘটনাটা সেই হাবিলদারের মুখেই বলছি :—"স্যার, জনা পনেরো ফোর্স নিয়ে আমি দু'টো বিরাট গাড়ীতে বালুরঘাট সদর থেকে রওয়ানা হলাম খাঁপুরের দিকে। সঙ্গে আমাদেব কাছে গোটা আষ্টেক ওয়ারেন্ট। এদের সবাইকে রাতের অন্ধকারেই খাঁপুর গ্রাম থেকে গ্রেফতার করতে হবে। এর আগেই আমরা 'তে-ভাগা' আন্দোলনের গণ্ডগোল শুনেছি। তাই খুবই হিসাব করে আমরা গাড়ী দু'টার শুধু ডিম-লাইট জ্বালিয়ে এগুতে লাগলাম। রাত প্রায় দু'টোর দিকে আমরা খাঁপুর গ্রামের পাশে একটা বড় মাঠের মধ্যে হাজির হলাম। চারদিক খুবই অন্ধকার আর কোথাও কোন সাড়া শব্দ পর্যন্ত নেই। অর্ডার মতোই সাদা পোশাকের লোকটাকে আমরা গাড়ী থেকে নামিয়ে দিলাম। সে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ লোকটাই আমাদের রাস্তা দেখিয়ে এনেছিল। কিন্তু লোকটা যাওয়ার আগে আমাদের খাঁপুর গ্রামের রাস্তাঘাটের কথা বলে দিলো। এ'ছাড়া একজন ড্রাইভারও খাঁপুর গ্রামটা চিনতো। মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা আবার রওনা হলাম। যাঁদের গ্রেফতার করতে হবে তাঁদের মধ্যে নীলকণ্ঠ দাস হচ্ছে অন্যতম।

"আমরা একেবারে নীলকণ্ঠ দাসের বাড়ীর সামনে গিয়ে হাজির হলাম। বাড়ীটা ঘেরাও করে কয়েকজন মিলে দরজায় ধাক্কা দিতেই ভিতরে কান্নার রোল পড়ে গেল। আর হঠাৎ করেই রাতের অন্ধকারে শঙ্খধ্বনি আর কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শুরু হলো। মিনিট দশেকের মধ্যেই আশেপাশের সব ক'টা গ্রাম থেকেই কাঁসর-ঘণ্টা বাজতে লাগলো। আমরা বুঝতে পারলাম একটা সাংঘাতিক বিপদ আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে। এর মধ্যে আমরা নীলকণ্ঠের বাড়ীর দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখি, পাখী আগেই হাওয়া হয়ে গেছে। তাই ওর বিবিকে জেরা করতে শুরু করলাম। কিন্তু সে বেটি খালি কাঁদে আর বলে 'আমি কিছু জানি না'। ওকে বুট দিয়ে দু'চারটা লাথি দিয়েও কিছু কাজ হলো না।

"স্যার, তখন কিন্তু ঐ ঘণ্টার আওয়াজ আমাদের পাগল করে দিয়েছে। আর বেশী সময় নষ্ট করা যাবে না দেখে আমরা জলদি করে ও বেটিকে পরে জেরা করার জন্য টেনে গাড়ীতে তুলে গাড়ী ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আধ মাইল গিয়ে দেখি একটা বিরাট গাছ রাস্তার উপর পড়ে আছে, আর ওধারে রাস্তা কেটে একেবারে খাল করে রেখেছে। আমরা বুঝলাম আমাদের 'মউৎ' এসে গেছে। গাড়ী ছুটো থামিয়ে আমরা চিন্তা করলাম এখন কী করা যায়! আমরা ঠিক করলাম, এখন গাড়ী থেকে নামতে হবে। কিন্তু নামার আর সময় পেলাম না। হঠাৎ কয়েকটা তীর এসে আমাদের গাড়ীর উপর পড়লো। বাতি নিবিয়ে আমরা চুপ করে গাড়ীর মধ্যেই বসে রইলাম। এদিকে কিন্তু কাঁসর-ঘণ্টা বেজেই চলেছে। বুঝলাম গ্রামে পুলিশ এলেই এরা ঘণ্টা বাজায়। আর পাশের গ্রাম শব্দ শুনলে তারাও ঘণ্টা বাজায়। এভাবে গ্রামের পর গ্রাম খবর হয়ে যায়। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই দশ-বিশ হাজার কৃষক একত্র হয়ে পড়লো। তবুও সকাল হওয়ার অপেক্ষায় আমরা চুপ করে থাকলাম।

"হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আলো ফুটতে শুরু করেছে, আর আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করলাম, যেদিকে তাকাই সেদিক থেকেই খালি হাজার হাজার মানুষের মাথা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এ অবস্থায় আমার জোয়ানদের কয়েকজন ভয়ে কাপড় নষ্ট করে ফেললো। আমি চীৎকার করে তাদের বললাম যে, এখন নার্ভাস হলে কিন্তু তোমাদের মরণের হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। একবার ভাবলাম রাস্তাটা যেখানে কেটে খাল করে ফেলেছে, সেটাকে ট্রেঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে পারলে ভালোই হয়। কিন্তু দু'দুবার নামার চেষ্টা করতেই সাঁওতালদের বিষাক্ত তীর আমাদের গাড়ীর উপর এসে পড়লো। বুঝলাম সাঁওতাল ছোক্‌রাগুলো গাছের উপর 'পজিশন' নিয়ে আমাদের উপর লক্ষ্য রাখছে।

"এখন দূরের মানুষগুলো ক্ষেতের মাঝ দিয়ে দৌড়ে এসে এক জায়গায় জমায়েত হচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঠিক করে নিলাম যে, ওরা দলে আরও ভারী হওয়ার আগেই ওদের আক্রমণ করে আমাদের পালাবার রাস্তা করে নিতে হবে। যে কথা সেই-ই কাজ। 'ওয়ালী ফায়ারের' নির্দেশ দিলাম। আমাদের সব-গুলো রাইফেল এক সঙ্গে গর্জন করে উঠলো। কয়েক হাজার লোকের আসল দলটা আমাদের রাইফেল রেঞ্জের মধ্যেই ছিল। তাই কয়েকজন ধরাশায়ী হয়ে পড়লো আর বাকীরা দৌড়ে দূরে গিয়ে জমায়েৎ হলো। এদিকে শত শত তীর আমাদের গাড়ী দুটোর উপরে এসে পড়তে লাগলো। শুরু হয়ে গেল এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। অন্যান্য গ্রামের লোকজন আসাতে ওরা দলে আরও ভারী হয়ে উঠলো। এখন ওরা চারদিক থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। আমরাও জানের ভয়ে অবিরাম গুলী চালাতে লাগলাম।

"এর মধ্যে আমি দু'জন জোয়ানকে অর্ডার দিলাম গাছের উপর সাঁওতাল ছোকরাগুলোকে গুলী করতে। কেননা স্যার, বেশীক্ষণ যে গাড়ীর মধ্যে আমরা থাকতে পারবো না, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমার এ অর্ডারেই কাজ হলো। গাছের উপর থেকে গোটা দুই লাশ পড়লো। এরপর তীরের হামলা কমে গেল। সাঁওতাল ছোকরাগুলোর তীর বড্ড সাংঘাতিক জিনিস স্যার! এরা গোক্ষুর সাপের বিষ তীরের মাথায় লাগিয়ে তারপর মারে। তাই তীরের আঘাতে এর মধ্যেই আমাদের কয়েকজন ধরাশায়ী হয়ে পড়লো।

"এদিকে তীরের হামলা কমবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হুকুম-মাফিক জোয়ানরা সব আমার সঙ্গে লাফিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরনের আওয়াজ হতেই দেখি, একটা মাঝ বয়েসী চাষী হামাগুড়ি দিয়ে এসে কখন যে আমাদের গাড়ীর কাছে চলে এসেছে তা' টেরই পায়নি।

"লোকটা আমাদের দু'নম্বর গাড়ীর একটা টায়ারের উপর একটা বদ্ধ উন্মাদের মতো তার কুড়োল দিয়ে আঘাত করেই চলেছে। আমার দু'জন জোয়ান লোকটাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারলো না। শেষে রাইফেলের কুঁদা দিয়ে পিটাতে শুরু করলো। তবু লোকটাকে কাবু করা সম্ভব হলো না। আমি বেয়োনেট চার্জের নির্দেশ দিলাম। কয়েকবার বেয়োনেট চার্জিং—এরপর লোকটার মৃতদেহ এলিয়ে পড়লো। কিন্তু গাড়ীর টায়ারটা যে শুধু বার্ষ্ট করেছে তাই-ই নয়, ও জায়গাটাতে পরে আর স্পেয়ার চাকা লাগানো সম্ভব হয়নি।

"এরপর নিজেদের পালানোর পথ পরিষ্কার করবার জন্য আমি জোয়ানদের দূরে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার লোককে ধাওয়া করে গুলী করার নির্দেশ দিলাম। ঘন্টাখানেকের পর যখন সবকিছু শেষ হলো, তখন তাকিয়ে দেখলাম, এখানে ওখানে সব লাশ

পড়ে আছে আর কিছু জখমী লোক খালি কাতরাচ্ছে। আমাদের পক্ষে জখ্‌মীর কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা যার গায়ে তীর লেগেছে সে-ই শেষ হয়েছে।

“লাশগুলোকে একত্র করে ভালো গাড়ীটাতে যখন তুললাম তখন সকাল প্রায় সাতটা বাজে। গুণতির পর দেখলাম ওদের ২৬টা আর আমাদের ৭টা—এই তেত্রিশটা হয়েছে। আমি রাস্তা ছেড়ে মাঠের মাঝ দিয়ে দৈত্যের মতো গাড়ীটাকে বালুরঘাটের দিকে যেতে নির্দেশ দিলাম।”

দাবাগ্নির মত খাঁপুরের এই পৈশাচিক ঘটনার কথা কলিকাতা তথা সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়লো। আর এদিকে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর দল সমস্ত এলাকাটা কর্ডন দিয়ে বসলো। কারও পক্ষে খাঁপুরে যাওয়া বা বাইরে আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, আহত কৃষকরা হাসপাতালে আসতে চাইলে সৈন্যবাহিনীর কাছে অনুমতি নিয়েই আসতে হবে। তাই আহতদের গ্রেফতার করা সহজ হবে।

কিন্তু এসময়ের একটা ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। খাঁপুর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই ‘ষ্টেটসম্যান’ আর ‘স্বাধীনতা’ এ দুটো কাগজের রিপোর্টার এসে হাজির হলো। ষ্টেটসম্যানের রিপোর্টার ভদ্রলোক ডি. এম-কে ইণ্টারভিউ করে ফিরে গেলেন। কিন্তু ‘স্বাধীনতার’ রিপোর্টারকে কেউ চর্মচক্ষে দেখতে পেলেন না। দু'দিন পরে দুটো কাগজেই এ বীভৎস আর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী বের হলো।

কিন্তু মোটামুটিভাবে সবাই ‘স্বাধীনতার’ রিপোর্টকেই সত্য বলে মেনে নিলো। কেননা এ কাগজের রিপোর্টার কী ভাবে এ রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন, ‘স্বাধীনতায়’ তারও কাহিনী ছাপা হয়েছে। এ থেকেই সবাই জানতে পারলো যে, রিপোর্টার মহাশয় একজন ডাক্তার সঙ্গে করে রাতের অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে

আর বুকে হেঁটে সৈন্যবাহিনীর কর্ডনের মাঝ দিয়ে আহত অবস্থায় খাঁপুরে গিয়ে হাজির হন। আবার রাতেই রিপোর্ট সংগ্রহ করে আর নিহত ও আহতদের তালিকা তৈরী করে একই পদ্ধতিতে সভ্য জগতে ফিরে এসেছেন। অফিসে পুরো রিপোর্টটা দাখিল করবার পরেই রিপোর্টারকে একটা নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। আর এদিকে ডাক্তার সৈন্যবাহিনীর কর্ডন করা খাঁপুরে আহতদের শুশ্রূষা করে তাঁদের গ্রেফতারের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছেন।

এ উপমহাদেশে এধরনের রিপোর্টিং আর ডাক্তারী করার নজীর এই-ই প্রথম। কলিকাতার দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকেই আমরা জানতে পারি যে, অশিক্ষিত গ্রাম্য কৃষক নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে একটা মাত্র কুড়াল হাতে নিয়ে বুলেট বৃষ্টির মধ্যে পুলিশের একটা বিরাট গাড়ীকে অকেজো করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর নাম চেরাগ মোহাম্মদ। বাংলাদেশের কৃষাণ আন্দোলনের ইতিহাসে এঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এখনও যদি কেউ পশ্চিম বাংলার বালুরঘাট মহকুমার খাঁপুরে যান, তবে দেখতে পাবেন, কৃষাণ আন্দোলনের স্বাক্ষর হিসাবে রক্তস্নাত খাঁপুরে ২৬ জন শহীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা শুভ্র স্মৃতিসৌধ। এঁদের মৃত্যু নেই—এঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী।

খাঁপুরের দুঃসংবাদ দিনাজপুর শহরে এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে এ নৃশংস ঘটনায় সবাই শিহরিত হয়ে উঠল আর চারদিকে শোকের ছায়া পড়ে গেল। এর পর জেলার মফস্বল অঞ্চল থেকে প্রায়ই পুলিশ আর তে-ভাগাওয়ালাদের সংঘর্ষের খবর আসতে লাগলো। তবে খাঁপুরের ঘটনা সব কিছুকেই ম্লান করে দিলো। এখনও পশ্চিম বাংলার বালুরঘাটে একটা ছোট্ট শুভ্র সৌধ বৃটিশ আমলের এ নৃশংস ঘটনার স্বাক্ষর বহন করছে।

এ সময় দিনাজপুরের 'তে-ভাগা' আন্দোলনের কথা বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক যুব সংস্থার পক্ষ থেকে ছয় সদস্য-বিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দলকে পুরো আন্দোলনটাকে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখার জন্য পাঠানো হলো। এঁরা যখন দিনাজপুরে এসে হাজির হলেন, তখন সমগ্র ঠাকুরগাঁ মহকুমাটাই তে-ভাগাওয়ালাদের দখলে চলে গেছে। আর তা' পুনরুদ্ধারের জন্য বৃটিশ সৈন্যবাহিনী মহকুমার চারিদিকটা আগুন জ্বালিয়ে আক্রমণ করেছে। আন্তর্জাতিক যুব সংস্থার যে ক'জন সদস্য দিনাজপুরে এসেছিলেন, তার মধ্যে রুশ প্রতিনিধি মিস ওল্গার কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। কেননা ঐ রুশ যুবতী শুধুমাত্র যে প্রতিনিধি দলের নেত্রী ছিলেন তাই-ই নয়, তিনি দিনাজপুরে আয়োজিত জনসভায় রুশ ভাষায় এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের বঙ্কিম চাটুজ্জে ওল্গার বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তা বাংলা ভাষায় তর্জমা করে শুনিয়ে সবাইকে হতবাক্ করে দিলেন। জ্বালাময়ী বক্তৃতা ছাড়াও মিস ওল্গাকে মনে রাখবার আর একটা কারণ হচ্ছে, তাঁর চেহারা ও পরিচ্ছদ। বিশাল দেহাবয়বের অধিকারিণী ঐ মহিলা পুরুষদের মত চুল ছেঁটে খাকি হাফ-প্যান্ট আর বুশ শার্ট পরে মাইকের সামনে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সম্মোহিত অবস্থায় তাঁর বক্তৃতা শুনলাম। পরে জেনেছিলাম, ভদ্রমহিলা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসীদের বিরুদ্ধে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে লড়াই করে নাম করেছিলেন।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যখন এ তে-ভাগা আন্দোলনটা সাফল্যের একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হলো, তখন আকস্মিকভাবে এ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলো। কেননা, আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের একাংশ তৎকালীন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতিশ্রুতির

দরুন তে-ভাগা আন্দোলন প্রত্যাহারে রাজী হলেন। হাজার হাজার সংসার ছারখার করে, শত শত মায়ের কোল শূন্য করে ও নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে, ত্যাগ আর তিতিক্ষার মধ্যে যে আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল, নেতৃত্বের ব্যর্থতার দরুন তার পরিসমাপ্তি ঘটলো। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সে প্রতিশ্রুতি আর কার্যকরী হয়নি। কেননা এর পর ভারত উপমহাদেশে রাজনীতির এত দ্রুত পট পরিবর্তন হয়েছে যে, উত্তরবঙ্গের চাষীদের প্রাণের দাবী 'তে-ভাগা' আর বাস্তবায়িত হয়নি। অবশ্য আজাদী লাভের পর পরই রাজশাহীর একটা এলাকায় এ আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এটাই নাচোল মামলা হিসাবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। 'তে-ভাগা' আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী হচ্ছে এর নেতৃত্ব। কেননা এঁদের প্রায় সবাই ছিলেন শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুব সম্প্রদায়ভুক্ত। সমাজতন্ত্র আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতেই এঁরা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে আন্দোলনের আসল চেহারা দেখে এঁরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। আর দিনের পর দিন ধরে পলাতকের জীবন যাপন করে এঁদের 'মোহ' ভেঙে যায়। মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দীর আশ্বাসবাণীতে এঁরাই আবার দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের আন্দোলন বন্ধ করার আহ্বান জানান। আশ্চর্য মনে হলেও এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য। সর্বহারাদের আন্দোলন কোনোদিনই মধ্যবিত্তদের নেতৃত্বে সম্ভব নয়! তাই আজকের পাকিস্তানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দুটো উপদলই মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের দোষে 'দুষ্ট' হয়ে বার বার সঠিক নেতৃত্বদানে ব্যর্থ হচ্ছে বলেই আমার বিশ্বাস। অথচ এঁরা সর্বহারাদের মুক্তির আন্দোলনের হোতা বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অবিরাম চীৎকার করছে। উগ্র জাতীয়তাবাদী যে

কোন পার্টির শ্লোগানের মুখে এসব 'তথাকথিত' প্রগতিশীল নেতৃত্ব ব্যর্থ হতে বাধ্য। উপরন্তু আজাদী লাভের বাইশ বছর পর খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, এককালের বহু প্রগতিশীল আর ত্যাগী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত নেতা আর কর্মীর দল নানাভাবে আজ সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গাড়ী ও বাড়ীর চিন্তায় 'উন্মত্ত' হয়ে উঠেছেন। এমন কী এঁদের অনেকেই উচ্চ সরকারী পদে পর্যন্ত অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন।

যা'হোক, তেভাগা আন্দোলনের শেষের পর্যায়ে একদিন কলেজে গিয়ে হঠাৎ করে শুনলাম যে, উপকথার 'তেভাগা' আন্দোলনের মধ্যমণি হাজী মোহাম্মদ দানেশ গ্রেফতার হয়েছেন। আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, হাজী সাহেবের মতো লোককে বৃটিশ সরকারের পক্ষে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে। তাই যেদিন হাজী সাহেবকে গ্রেফতার করে দিনাজপুরে আনা হলো, সেদিন সমস্ত শহরটাই তাঁকে শুধুমাত্র একনজর দেখবার জন্য ভেঙে পড়লো। দিনাজপুর জেলখানার জেলর আভ্যন্তরীণ দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ভার একরকমভাবে বলতে গেলে হাজী সাহেবের হাতেই ন্যস্ত করলেন। কেননা, তখন জেলখানা 'তেভাগাওয়ালাদের' দিয়ে ভরে ফেলা হয়েছে। তাই জেলার জেলখানার চারদিকে কড়া পাহারা বসিয়ে প্রত্যেক দিন ভেতরের জেল গেটে হিসেব করে হাজী সাহেবের হাতে ঐ সব 'তেভাগাওয়ালা'দের রেশন দিতে লাগলেন। সম্ভবত হাজী সাহেবের উপস্থিতির জন্যই তখন দিনাজপুরের জেলখানায় শত শত 'তেভাগা' আন্দোলনকারী থাকা সত্ত্বেও কোন রকম গণ্ডগোল হয়নি। হাজী সাহেব জেলে থাকার সময়ই 'তেভাগা' আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। এতে কৃষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও তা' আর শোধরাবার সময় ছিল না।

হাজী সাহেবের গ্রেফতারের ব্যাপারে নানা ধরনের কাহিনী তখন দিনাজপুর শহরে চালু হয়। এর মধ্যে একটা কাহিনীকেই

আমাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে। পুলিশ আর সামরিক বাহিনীর লোকজন সমগ্র ঠাকুরগাঁ মহকুমা চষে ফেলে। তেভাগা-আন্দোলনকারীদের নেতৃস্থানীয় কাউকে ধরতে না পেরে হন্যে হয়ে উঠেছে। এমন সময় একটা আখক্ষেতের পাশে নেংটিপরা একজন কৃষককে পেয়ে তাকেই ধরে এনে থানা-হাজতে রেখে দেয়। সন্ধ্যার পর একজন সহকারী দারোগা রাতের ডিউটি সেরে বাসায় চলে যাওয়ার আগে হাজতী আসামীদের গুণতি করবার জন্য হ্যারিকেনের ফিতাটা বাড়িয়ে নিয়ে হাজতের মোটা লোহার শিকের কাছে এসে হাজির হন। গুণতি করবার সময় হঠাৎ করে সেই নেংটিপরা কৃষকের মুখের উপর হ্যারিকেনের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সহকারী দারোগার সমস্ত দেহটা থর থর করে কেঁপে উঠল। দৌড়ে গিয়ে ভদ্রলোক মোটা বিশেষ লেজারটা টেবিলের উপর নামিয়ে হুমড়ি খেয়ে ফটো খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পুলিশের লেজারের ফটোটার সঙ্গে হাজতে আটকে রাখা নেংটিপরা কৃষকটির চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে সহকারী দারোগা পাহারারত কনস্টেবলদের হুঁশিয়ার করে দৌড়ে গেলেন বড় দারোগার বাসায়। যা আন্দাজ করা হয়েছিল তাই-ই সত্যে পরিণত হলো। নেংটিপরা একহারা চেহারার কৃষকটিই হচ্ছেন বিপ্লবের বহ্নিশিখায় গড়া আর আদর্শের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হাজী মোহাম্মদ দানেশ।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হাজী সাহেব একদিন ঢাকায় কে. এম, দাশ লেনে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। কথায় কথায় শেরেবাংলা বললেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন এলাকা থেকেই তিনি নির্বাচিত হতে সক্ষম। স্বল্পভাষী হাজী সাহেব বললেন, 'আপনার মতো নেতার পক্ষে তা সম্ভব, কিন্তু ঠাকুরগাঁ ছাড়া।' এ ঠাকুরগাঁই হচ্ছে হাজী সাহেবের আসল কর্মক্ষেত্র। এ এলাকার মাটির সঙ্গে

তাঁর নাড়ীর যোগ রয়েছে। তাই তিনি এ এলাকার কৃষকদের একচ্ছত্র নেতা। আর এর বলে বলীয়ান হয়েই তিনি চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের সময় ভোটার তালিকা ছাড়াই নির্বাচনে জয়ী হতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু নিয়তির পরিহাস! সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে এই হাজী সাহেব জনৈক তরুণ আওয়ামী লীগ নেতার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর কর্মতৎপরতায় এটা সম্ভব হয়েছে।

তেভাগা আন্দোলনের আর একজন বলিষ্ঠ নেতার কথা না বললে আমার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এঁর নাম হচ্ছে শ্রীগুরুদাস তালুকদার। তেভাগা আন্দোলনে গুরুদাসবাবুর দান অপরিসীম। বৃটিশ সরকার হাজী সাহেবের মতো এঁর গ্রেফতারের জন্যও বিরাট অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। গুরুদাসবাবু তাঁর যৌবনের কর্মক্ষেত্র দিনাজপুরের কৃষক আন্দোলনকে পরিত্যাগ করে কাপুরুষের মতো সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে যেতে পারেননি। ইনি এখনও সক্রিয় রাজনীতিতেই রয়েছেন। তবে হাজী সাহেব আর গুরুদাসবাবুর মধ্যে এখন এক দুর্ভেদ্য দেয়াল গড়ে উঠেছে। হাজী সাহেব যেখানে 'ভাসানীপন্থী ন্যাপে' রয়েছেন, সেখানে গুরুদাসবাবু 'রিকিউজিশনপন্থী ন্যাপে' কাজ করছেন।

যাহোক, তেভাগা আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে এলো, তখন আমরা মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড সংগঠনে মনস্থ করলাম। কেননা মুসলমান গ্রামবাসীদের 'এভাবে বিপথগামী' হতে দেয়া আর বরদাস্ত করা যায় না। দিনাজপুর জেলার সন্তান জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের অন্যতম নায়েব সালারে সুবা। মরহুম দবিরুল ইসলামের উৎসাহে আমরা দিনাজপুরের মুসলমান জোতদারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ন্যাশনাল গার্ড সংগঠনের জন্য দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লাম।

দিনাজপুরের কথা বলবার সময় একটা পরিবারের কথা না লিখলে আমার এ পরিচ্ছেদই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এঁরাই হচ্ছেন মুন্সীপাড়ার খান পরিবার। কবে আর কিভাবে এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তা আর এত দিন পরে পরিষ্কার মনে নেই। তবে পরিচয়টা যে দিনাজপুরের প্রখ্যাত গায়ক নূরুল ইসলামের মারফতে হয়েছিল তা স্পষ্ট খেয়াল আছে। আমরা দু'ভাই তখন কলেজের আই. এ ক্লাশের ছাত্র। দু'জনের একই রকমের চেহারা, একই ধরনের পরিচ্ছদ, এমন কী একই রকমের কথাবার্তার ধরন। তাই ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব ছাড়া অনেকের পক্ষে আমাদের মধ্যে তফাৎ পর্যন্ত করা মুস্কিল ছিল। আর স্বল্প পরিচয়ের লোকরা প্রায়ই আমাদের দু'ভাইকে সনাক্ত পর্যন্ত করতে ভুল করতো। তাই কলেজে আমরা প্রায়ই একজনের প্রক্সি আর একজন নির্বিকার ভাবে দিতাম। মোটামুটিভাবে অনেকেই আমাদের দু'জনকে যমজভাই বলেই জানতো।

কলেজের একটা ফাংশনে শিল্পী নূরুল ইসলামের গান শুনে রাতারাতি দু'ভাই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। ভদ্রলোক প্রথম পরিচয়ের সময় আমাদের সরাসরি 'তুই' বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। আমরাও তাঁর আন্তরিকতা দেখে আর উচ্চবাচ্য করলাম না। এঁরই সঙ্গে একদিন মুন্সীপাড়ার খান পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হলো। পরিবারটি তিন ভাইয়ের একটি যৌথ পরিবার বলা চলে। খালি রান্নার পাটটাই পৃথক। বাকী সবই যৌথ। অর্থাৎ এক কথায় তিন ঘর। এক উঠান বলা যেতে পারে। একটা বনেদী প্রাচীন বংশ বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এখন পর্যন্তও নিজেদের অস্তিত্ব কিভাবে গর্বের সঙ্গে বজায় রেখেছে, এই খান পরিবারই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দিনাজপুর পরিত্যাগ করার প্রায় কুড়ি বছর পর সেদিন গিয়ে এ পরিবারের একই অবস্থা দেখেছি। খালি সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার সহধর্মিণী অর্থাৎ যাঁকে

আমরা মরিয়ম খালা বলে ডাকতাম, তাঁকে আর দেখতে পাইনি। তিনি বহু বছর আগেই জান্নাতবাসী হয়েছেন। নীরবে দু' ফোঁটা অশ্রুজল ফেলে চলে এসেছি। কেননা এ মরিয়ম খালার স্নেহধন্য না হতে পারলে আমার পক্ষে বি-এ পাশ করাই সম্ভব হতো না।

আজাদী লাভের পরেই আব্বা ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার এস-ডি-পি-ও পদ হিসাবে প্রমোশন পেয়ে বদলী হয়ে যান। মাদারীপুর যাবার মাসখানেকের মধ্যেই যখন জানতে পারলাম যে, আমি আই-এ পরীক্ষায় পাশ করেছি, সেদিনই আবার আমি মাদারীপুর থেকে পালিয়ে দিনাজপুরে এসে হাজির হলাম। কেননা আব্বা আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, থার্ড ডিভিশনে আই. এ. পাশ করে বি. এ. পড়া অর্থহীন। দিনাজপুরে এসে সোজা মরিয়ম খালার কাছে গিয়ে সব খুলে বললাম। উনার টানাটানির সংসার হওয়া সত্ত্বেও আমাকে আশ্রয় দিলেন। এক কথায় বলতে গেলে, এ যৌথ পরিবারেই আমাদের দু'ভাইয়ের লজিং-এর ব্যবস্থা হলো। মেজো ভাইয়ের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হলো বড় খালার সঙ্গে। অবশ্য বড় খালাকে আমরা আজও বড় চাচী বলেই ডাকি। আর আমি রইলাম মরিয়ম খালার সংসারে। দুটো বছর বি. এ. পড়ার সময় অনাত্মীয় দুটো কিশোর হয়ে আমরা যে কত অত্যাচারই তাঁদের প্রতি করেছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সবই তাঁরা মুখ বুজে সহ্য করেছেন। তবে আমরা তাঁদের এটুকুই মান রেখেছিলাম যে, দু'ভাই-ই এ বাড়ীর নুন খেয়ে বি. এ. পাশ করেছিলাম।

যাহোক মরহুম দবিরুল ইসলাম আর জনাব রহিমউদ্দীন উকিল সাহেবের উৎসাহে আমরা সবাই মুসলিম লীগ সংগঠনে মেতে উঠলাম। দিনাজপুরের রুহিয়া থেকে শুরু করে হিলি পর্যন্ত সর্বত্রই আমরা মুসলিম লীগ আর পাকিস্তানের বাণী বয়ে

বেড়ালাম। শেষ পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচনে দিনাজপুর জেলার প্রতিটি মুসলমান আসনেই লীগ প্রার্থী জয়লাভ করলো। কিন্তু সাধারণ আসনে অর্থাৎ অ-মুসলিম আসনে একটাকে কংগ্রেস আর তফশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীকে পরাজিত করে কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীরূপনারায়ণ রায় নির্বাচিত হলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বর্তমান পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত বামপন্থী জননেতা শ্রীজ্যোতি বসু ছাড়া দার্জিলিং থেকে শ্রীরতনলাল ব্রাহ্মণ এবং দিনাজপুর থেকে শ্রীরূপনারায়ণ রায়—এই তিনজন কম্যুনিষ্ট প্রার্থী মাত্র নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন।

এর পর ঘটনাপ্রবাহ অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার প্রধান হয়েই সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্ত করে দিলেন। এ-ছাড়া একটা আশ্বাস দিয়ে 'তেভাগা' আন্দোলন প্রত্যাহার করতে বাধ্য করলেন। এর পরই মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ১৬ই আগস্ট শুক্রবারকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হলো। শুরু হলো এক ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। যে কলিকাতা মহানগরী মাত্র কয়েক মাস আগে 'রশীদ আলী দিবস' হিন্দু-মুসলমানের যৌথ শ্লোগানে ভরপুর হয়ে ছিল আর হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে পুলিশের গুলীর সামনে নির্বিচারে গুলীর মুখোমুখি হয়েছিল, সেই কলিকাতা মহানগরী রাতারাতি ভ্রাতৃহত্যার এক নরককুণ্ডে পরিণত হলো। চোখের নিমিষে নাগিণীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস বঙ্গ-বিহারকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

তাই দিনাজপুরেও চারদিকে খালি সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মুসলিম লীগের 'নির্দেশে' আমরাও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলাম। প্রতিদিনই কলিকাতার দাঙ্গার নতুন নতুন খবর এসে পৌঁছুতে লাগলো। তবে ঐ সময় বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর

অবদানের কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। জনাব সোহ্‌রাওয়ার্দীর কর্মদক্ষতার জন্যই তখন কলিকাতার মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র আঠারো ভাগ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বিপক্ষের সঙ্গে সমান সমান লড়াই করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সুখের কথা, দিনাজপুরে খানিকটা উত্তেজনা দেখা দিলেও সেটার চরম পরিণতি ঘটেনি। কলিকাতার দাঙ্গা কিছু প্রশমিত হবার পরেই নোয়াখালিতে বেশ খানিকটা উত্তেজনা দেখা দিল। এমন কী, বেশ কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ঘটনাও ঘটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার অ-মুসলিম সংবাদপত্রগুলো এ-সব ঘটনার যে অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করলো তাতেই সমস্ত বিহার প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটা হিংস্র দানবের মতো পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লো। অবলা নারী আর মাসুম বাচ্চার ক্রন্দনে বিহারে আকাশ-বাতাস ভরপুর হয়ে উঠলো। বিহারের নিকটবর্তী জেলা বলে একমাত্র দিনাজপুরেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার মোহাজের এসে হাজির হলো। এরা পিছনে ফেলে এলো নিজেদের জন্মভূমি ও শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র আর যৌবনের লীলাক্ষেত্র। আমরা দিনের আহার আর রাতের বিশ্রামকে হারাম করে এ-সব ছিন্নমূল মোহাজেরদের পুনর্বাসনের কাজে মেতে উঠলাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল কালের স্রোতে এরা বাঙালী মুসলমান বলেই একদিন পরিচিত হবেই। কিন্তু দীর্ঘ ২৪ বছর পরে আমাদের সে বিশ্বাস কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে কি?

৩রা জুন তারিখে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটনের ঘোষণায় আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। কেননা আমরা শুধু যে আজাদী লাভ করতে যাচ্ছি তাই-ই নয়, আমাদের স্বপ্নের পাকিস্তান এবার বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। দু'শো বছর ধরে এ উপমহাদেশের চল্লিশ কোটি নরনারী যে পরাধীনতার জিঞ্জির বহন করে চলেছে, সেই জিঞ্জির ছেঁড়ার

দিন এসে গেছে। কিন্তু মাউন্টব্যাটনের ঘোষণায় খুলনা জেলাকে হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত করায় আর কলিকাতা মহানগরী হস্তচ্যুত হওয়ায় আমরা আনন্দটা ভাল করে প্রকাশ করতে পারলাম না। কলিকাতা ছাড়া আমরা কেমন করে বাঁচবো তা চিন্তা করতে পারতাম না। অথচ সেই কলিকাতাই পরিণত হলো একটা বিদেশী শহরে।

মাউন্টব্যাটনের ঘোষণার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 'র‍্যাডক্লিফ এ্যাওয়ার্ড' প্রকাশিত হলো। নতুন ভাবে পাওয়ার মধ্যে পাকিস্তানের ভাগে পড়লো খুলনা জেলা; অবশ্য এর বদলে মুর্শিদাবাদ জেলাকে হারাতে হলো। আর ভাগ হলো নদীয়া, যশোর, মালদহ, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা। কিন্তু এগুলোর চুলচেরা হিসেব করে ভাববার আর কারো সময় নেই। সবাই হৈ-চৈ আর ডামাডোলের মধ্যে যেন দিশেহারা হয়ে পড়লো।

শুধু আব্বার একটা কথায় অবাক হয়ে রইলাম। তিনি একদিন আমাদের বড় ভাই তিনজনকে ডেকে বললেন, "তোরা নারায়ে তক্‌বির আর আল্লাহু আকবর বলে চেঁচিয়ে পাকিস্তান আনলি বটে, কিন্তু এতে তোদের কোনই লাভ হবে না। যেটুকু লাভ হবে আমাদের। পাকিস্তান চালাবার জন্য তো আর রাতারাতি অফিসার পয়দা করতে পারবি না। আমাদেরই প্রমোশন দিয়ে হিন্দু আর বৃটিশদের খালি হওয়া বড় বড় পোস্টে রাখতে হবে। আমরাই আবার তোদের উপর ডাণ্ডা পিটা করবো—তা' বলে রাখছি।"

আজ থেকে প্রায় তেইশ বছর আগে পুলিশ ইন্সপেক্টার হিসাবে আব্বা যে-কথা বলেছিলেন তার হুবহু বাস্তবায়ন দেখে এখনও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাই।

সমস্ত বিশ্ব হতবাক্ হয়ে দেখলো যে, শুধু ভারত উপমহাদেশই স্বাধীন হলো তাই-ই নয়, এ উপমহাদেশের বুক চিরে জন্ম হলো আর একটা নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের। বিশ্বের ইতিহাসে এ এক নতুন ধরনের আজাদী। শাসকগোষ্ঠী বৃটিশ পার্লামেন্টে আইন পাশ করে আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে দিল্লীর বিমান বন্দরে বিদায় সম্বর্ধনা গ্রহণ করে হাওয়াই জাহাজে দেশে ফিরে গেলেন। আজাদী লাভের শেষের পর্যায়ে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর এক বিন্দু রক্তপাতও হলো না। আমরা শুধু নিজেরাই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় লিপ্ত হয়ে পড়লাম। এমন কী আজাদী লাভের পর চেয়ে দেখলাম, হিন্দুস্থানের গভর্ণর জেনারেল পদে একজন বৃটিশ নাগরিক অধিষ্ঠিত হয়েছেন আর একজন বৃটিশ জেনারেল পাকিস্তানের সামরিক প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। সুদীর্ঘ তেইশ বছর পর এ-সব অবিশ্বাস্য মনে হলেও এ-সব হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য। এমন কী কাশ্মীরের প্রথম যুদ্ধের সময়েও এই বৃটিশ জেনারেলই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণে অস্বীকার করেন। কেননা কার্যতঃ ইনি সুপ্রীম কমাণ্ডার ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটনের অধীনে ছিলেন।

যা'হোক, স্বাধীনতার দলিল দস্তখত করে সসম্মানে একটা শাসকগোষ্ঠীর দেশে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী ইতিহাসে বিরল। বৃটিশরা আমাদের দেশ থেকে চলে গেল বটে, কিন্তু ভারত আর পাকিস্তানে তাদের বাণিজ্যিক আর শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ পুরোটাই অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হলো। আজও পর্যন্ত বৃটিশের এ-সব স্বার্থ পুরোমাত্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এটা যে তৎকালীন বৃটিশ শ্রমিক পার্টির কৃতিত্ব, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এসব ডামাডোলের মধ্যে সীমান্ত প্রদেশ আর সিলেট জেলায় গণভোটের ব্যবস্থা হলো। শেষ পর্যন্ত এ দুটো এলাকাই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো। আজাদী লাভের আগে সীমান্ত

প্রদেশে ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন ছিল বিধায় এ প্রদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বলে কংগ্রেসী মহল থেকে বৃটিশ সরকারের কাছে দাবী জানানো হলো। কিন্তু রাজনৈতিক গতিধারার দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে বলে, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সীমান্ত প্রদেশে গণভোটের ব্যবস্থা করলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এ গণভোটকে 'বয়কট' করা হলো। অবশ্য পরবর্তীকালে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ তাঁদের এ ভুল সিদ্ধান্তের কথা স্বীকার করে গেছেন।

সীমান্ত প্রদেশের গণভোটের সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব হচ্ছে মান্‌কী শরীফের পীর, জাকোরী শরীফের পীর আর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের। এ গণভোটে খুবই স্বল্পসংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে মুসলিম লীগ জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। তাই মনে হয় কংগ্রেস এ নির্বাচনে অংশ নিলে ফলাফল কী হতো, তা বলা মুসকিল ছিল।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিলেটের গণভোটে যোগ দিতে পারলাম না বলে দিনাজপুরে আমাদের মনে খুবই দুঃখ হলো। কিন্তু পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশ থেকে এতো বিপুলসংখ্যক মোহাজের কাটিহার হয়ে দিনাজপুরে প্রবেশ করতে লাগলো যে, এদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা দারুণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এর মধ্যে আবার এদিক থেকেও পরিচিত চেহারাগুলোও তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে ও-পারের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে চলে যেতে লাগলো। মনে হলো যেন রাতারাতি এ ভূখণ্ডের ম্যাপটাই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে।

এ সময় প্রায়ই আমরা পার্বতীপুর জংশনে দল বেঁধে অবস্থা দেখতে যেতাম। দেখলাম নানান জায়গা থেকে মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবকের দল ট্রেনযোগে লালমণিরহাট যাচ্ছে।

এক একটা রেলওয়ে কম্পার্টমেন্টে ১৭ জন করে স্বেচ্ছাসেবক স্থান দখল করেছে। এর অতিরিক্ত আর কাউকে কম্পার্টমেন্টে

উঠতে দেওয়া হতো না। বখ্‌তিয়ার খিলজির সতেরো জন মুসলিম অশ্বারোহী সৈন্যের বাংলাদেশ দখলের ইতিহাস স্মরণ করেই সিলেট গণভোটে বিজয়লাভের উদগ্র বাসনায় এঁরা এভাবে ট্রেনযোগে লালকেল্লার দিকে যাচ্ছে।

সবারই একই উদ্দেশ্য। আসামের লালকেল্লায় অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকের কাতারে সামিল হওয়া। এ লালকেল্লার সৃষ্টিই হচ্ছে মওলানা ভাসানীর অন্যতম অবদান। এখান থেকেই মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবকের দল হাজারে হাজারে সিলেটের পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লো।

কংগ্রেসী সমর্থক জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও সিলেটের অধিবাসীরা তাঁদের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তবে এ গণভোটে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রচেষ্টা, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আর অবদানের কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সিলেটের গণভোটে জয়লাভ করা সত্ত্বেও করিমগঞ্জ এলাকাকে বৃটিশ কতৃ'পক্ষ সিলেট থেকে আলাদা করে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। সম্ভবতঃ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এটা করা হয়েছিল।

যা'হোক, আজাদী লাভের ধাক্কায় সমস্ত দিনাজপুর শহরটারই চেহারা একেবারে বদলে গেল। শুধু দিনাজপুরই কেন, বলতে গেলে সমগ্র প্রদেশটার রূপের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো। অ-মুসলিম ধনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা বাড়ী আর জমি বিক্রী করে পশ্চিম বাংলার পথে পাড়ি জমালো।

এ সময়ের একটা কাহিনী না বললে আমার লেখাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দিনাজপুর শহরের নাট্য-সমিতি অবিভক্ত বাংলার একটা বিশিষ্ট নাট্য-সংস্থা হিসেবে পরিগণিত হতে পেরেছিল। এ নাট্য-সমিতির মঞ্চে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীশিশির ভাদুড়ী প্রমুখ বাংলা নাট্য আন্দোলনের স্বনামধন্য ব্যক্তিরা অভিনয় করে গেছেন। স্বাধীনতা লাভের আগে এ নাট্য-সমিতিতে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই

একটা করে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। তাই সপ্তাহের প্রতিদিনই হয় নাট্যাভিনয় না হয় রিহার্সেলের জন্য দিনাজপুর নাট্য-সমিতির পাদপীঠ সরগরম হয়ে থাকতো। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুব সম্প্রদায়ের কাজই ছিল সমস্ত দিন অফিসের পর বাসায় ফিরে জলযোগ করে খেলার মাঠে যাওয়া, আর মাঠ থেকে ফিরে সন্ধ্যার সময় নাট্য-সমিতিতে এসে নাটকের রিহার্সেলে অংশ গ্রহণ করা। আর ছাত্ররা মাঠ থেকে বাসায় ফিরেই হারিকেনের বাতিতে জোরে জোরে ক্লাশের পড়া মুখস্থ করে পাড়া মুখর করে তুলতো। সন্ধ্যায় দূর থেকে আজানের সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসতো আর হিন্দু কুল-বধূদের সন্ধ্যা আরতির উলুধ্বনি ও শঙ্খের শব্দে প্রতিটি পাড়া মাতোয়ারা হয়ে উঠতো। কিন্তু কুড়ি-বাইশ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশের সে চরিত্র কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

আজকের দিনে যখন আশেপাশে তাকাই তখন দেখতে পাই প্রায় সর্বত্রই মর্ণিং স্কুলের ব্যবস্থা রয়েছে ; দুপুরে ম্যাটিনী শো' সিনেমা দেখার (তাও আবার কনসেশনে) সুবিধা রয়েছে আর বিকেলের দিকে নিউ মার্কেটে কিংবা বঙ্গবন্ধু এ্যাভেন্যুর (জিন্না এ্যাভেন্যু) দিকে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে ড্রইং-রুমে টি. ভি. সেটের সামনে দিব্যি চেয়ে বসে রয়েছে। তাই ভাবি, এদের পড়বার সময় কোথায় ? অবস্থার বিপাকে পরে আজকাল আমি তো শেষরাতে ছেলেকে উঠিয়ে পড়বার ব্যবস্থা করেছি।

যাক, যা বলছিলাম। ১৪ই আগস্ট-এ আজাদী লাভের পর যখন চারিদিকে শুধু অস্থিরতায় ভরপুর আর বিত্তশালী অ-মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা 'নিজেদের দেশে' পাড়ি জমাবার জন্য সব কিছু গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তখন একদিন আমরা কয়েক বন্ধু মিলে ভাবলাম, যে নাট্য-সমিতির পাদপীঠে গত কয়েক যুগ ধরে সন্ধ্যাবাতি জ্বলেছে, সেই নাট্য-সমিতির অবস্থাটা সরেজমিনে দেখা প্রয়োজন। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা কয়েকজন

মিলে নাট্য-সমিতিতে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম পশ্চিমা দারোয়ানটা পর্যন্ত নেই। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। হঠাৎ উইংস-এর মাঝ দিয়ে লক্ষ্যকরলাম একটা মৃদু আলো দেখা দিচ্ছে! এগিয়ে ষ্টেজে গিয়ে আমরা ক'জনাই হতভম্ব হয়ে গেলাম। ষ্টেজের এক পাশটায় মোমবাতি জ্বালিয়ে দিনাজপুরের প্রখ্যাত অভিনেতা আমাদের শিবুদা ধ্যানস্থ হয়ে বসে রয়েছেন। আমাদের আসার আওয়াজ পাওয়ার কিছুক্ষণ পর উনি মুখ তুলে বললেন, "ও তোরা এসেছিস, বস বস।" আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর পাশে ষ্টেজের উপরেই বসে জিজ্ঞেস করলাম, "শিবুদা, আপনি এভাবে বসে রয়েছেন? এদিকে যে মিহির, রাণী সেন, ভক্তিময় এঁরা চলে গেলেন?"

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "বুঝেছিস, এ নাট্য-সমিতি হবার পর থেকেই এখানে সন্ধ্যাবাতি জ্বলেছে। তাই আমি বেঁচে থাকতে এখানে সন্ধ্যাবাতি জ্বলবে না, তা কেমন করে হয়? যত দিন বেঁচে আছি দায়িত্বটা পালন করেই যাই।" কথা বলতে বলতে তিনি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন। আমরা তাঁকে অভয় দিয়ে বললাম, "শিবুদা, হয়তো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনিও দেশত্যাগ করবেন। অবশ্যি আত্মীয়স্বজনের চাপেই এটা করতে হবে। তবে এ-কথা জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমরা বাঙালী মুসলমান ছেলেরা একেবারে মরে যাইনি। দিনাজপুরের নাট্য-সমিতির সন্ধ্যাবাতি জ্বালাবার দায়িত্ব আজ থেকে আমরাই গ্রহণ করলাম।"

শিবুদা আমাদের কথায় খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে তিনি তার জন্মভূমি আর যৌবনের কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু আমরা যে ক'জন সেদিন তাঁকে এ আশ্বাস দিয়েছিলাম, তার মধ্যে জনাব আমিনুর রহমান অন্যতম ছিলেন। আমরা রাজনীতি আর নানান কাজে ব্যস্ত থাকায়

আমাদের ওয়াদা পালন করতে পারিনি বটে, কিন্তু আমিনুর রহমান সাহেব যাঁকে আমরা বুলুভাই বলে ডাকতাম, তিনি তা অক্ষরে অক্ষরেপালন করেছেন। আজীবন কুমার এ বুলুভাইয়ের প্রচেষ্টাতেই দিনাজপুরের নাট্য-সমিতি আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। ১৯৫০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে দিনাজপুর ছেড়ে চলে এসেছি। কিন্তু প্রায় ১৮ বছর পর সেদিন যখন কার্যোপলক্ষে দিনাজপুর গিয়েছিলাম তখন এ বুলুভাইকে নাট্য-সমিতিতে একটা নাটকের রিহার্সেল দেয়া অবস্থায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। এর কিছু দিনের মধ্যেই দিনাজপুর নাট্যাভিনয়ের প্রতিযোগিতায় বুলুভাই শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে ভূষিত হন। কিন্তু আফশোস, আজীবন কুমার এ ভদ্রলোক সম্প্রতি মাত্র ৫২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। খবরটা কয়েক সপ্তাহ পরে আমার কাছে এসেছে। আমি শুধু নীরবে দু'ফোঁটা অশ্রুপাত করেছি।

এর মধ্যেই কলিকাতায় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি নেতা নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কে আসন অলঙ্কৃত করবেন তা নির্ধারণের জন্য দুটো উপদল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখী হলো। এক দলে ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী, জনাব নুরুল আমীন, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী ও শাহ মুহম্মদ আজিজুর রহমান প্রমুখ। আর এক দলে ছিলেন জনাব হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, জনাব আবুল হাশিম, জনাব আবুল মনসুর আহম্মদ, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, ডাঃ মালেক, জনাব এ সবুর, সৈয়দ নুরুদ্দীন, জনাব আনোয়ার ও শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখ। এর মধ্যে গণভোটের দরুন সিলেট জেলা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ জেলার মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যরাও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির

সদস্যভুক্ত হন। পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচনে এঁরা যে কারণেই হোক খাজা নাজিমুদ্দীনের পক্ষে ভোট দেন। তাই সিলেট জেলার এসব এম. এল. এ.-রাই সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারিত করে দেন। কেননা এঁরাই ছিলেন 'ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর'। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচনে মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী পরাজিত হয়ে পূর্ব বাংলার 'মসনদ' লাভে বঞ্চিত হলেন। সেদিনের নেতা নির্বাচনের ফলাফল অন্যরকম হলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসই অন্য রকম হতে বাধ্য ছিল।

যা হোক, আমরা 'হাশেমাইট' ছিলাম বলেই জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকার বিরোধী শক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লাম। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কলিকাতা থেকে মুসলিম লীগ নেতাদের হিজরত শুরু হলো। যাঁরা রয়ে গেলেন, তাঁদের মধ্যে মরহুম হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আর জনাব আবুল হাশিম অন্যতম। অবশ্য এঁরাও পরবর্তীকালে পাকিস্তানে হিজরত করেছিলেন। ঘটনার এত দ্রুত পট পরিবর্তন হলো যে, অবিভক্ত বাংলার শতকরা সাড়ে ৬৭ ভাগ সরকারী সম্পদের মালিক পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে বাটোয়ারার ফলে শতকরা কত ভাগ এসেছিল তা সঠিকভাবে হিসাব করে আর দেখবার সময় ছিল না। সবাই ঢাকায় এসে গদী দখলের জন্য উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে শুরু করলেন। পশ্চিম বাংলার ডাঃ ঘোষের 'ছায়া মন্ত্রিসভা' কিছু পুরানো ভাঙ্গা টেবিল, চেয়ার আর 'আলমারী শিয়ালদা থেকে ঢাকা মেলে পাঠিয়ে দিলো। ওতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হলো। অবিভক্ত বাংলার প্রায় সব সরকারী অফিসের হেড ক্লার্ক অ-মুসলিম ছিল বলে হিসেব করার সময় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সরকারী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিগুলোর দাম খাতাকলমে বেশী করে দেখালো আর

পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত সরকারী সম্পত্তিগুলোর দাম কম করে দেখিয়ে আমাদের ঠকাবার ব্যবস্থা করলো। রেলওয়েতেও এই একই ঘটনা ঘটলো। কিন্তু এসব ব্যাপারে তখন মাথা ঘামাবার মত সময় আমাদের নেতৃবৃন্দের ছিল না বললেই চলে। আমাদের পক্ষ থেকে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী আর মিউজিয়ামের দুষ্প্রাপ্য বইপত্র আর জিনিসপত্রের ভাগ না চেয়ে টাকা চাওয়া হলো। এখানেও আগের মতোই হিসাব হলো।

তবুও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, পূর্ব বাংলার নগদ প্রাপ্যের পরিমাণ প্রায় আড়াই কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ টাকা থেকেও পূর্ব পাকিস্তান চিরদিনের জন্য বঞ্চিত থেকে গেছে। কেননা উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব প্রদেশ বিভক্ত হবার পর অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী-শহর লাহোর পাকিস্তানে আসায় হিসেব মতো পূর্ব পাঞ্জাবের পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় আড়াই কোটি টাকা। হিন্দুস্থানের কর্তৃপক্ষ এ দুটো দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলবার প্রস্তাব দিলে পাকিস্তানের শাসন-ক্ষমতায় সদ্য-আগত দল তা গ্রহণ করেন। আর পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে বলা হলো যে, ভবিষ্যতে পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার ক্ষতিপূরণের উল্লিখিত আড়াই কোটি টাকা পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়ার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ রইল। সে অঙ্গীকার আজও পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি।

পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাতের পেছনে যে কটা দল কাজ করেছিল তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, তমুদ্দুন মজলিশ, পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগ আর আওয়ামী মুসলিম লীগ অন্যতম। আজাদী লাভের কিছুদিনের মধ্যেই প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্র লীগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর এক পক্ষ জনাব শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার খাজা নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার সমর্থক হিসাবে কাজ

করতে আরম্ভ করেন। আর এক পক্ষ মেসার্স শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল হামিদ চৌধুরী, মরহুম দবিরুল ইসলাম, মরহুম আবদুল আজিজ, মোল্লা জালাল উদ্দিন, খালেক নেওয়াজ খান, গোলাম মাহবুব প্রমুখের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের নামে এ প্রদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা এ দলের সক্রিয় সমর্থক হিসাবে দিনাজপুরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হই। দিনাজপুরের কৃতি সন্তান মরহুম দবিরুল ইসলামের পরেই ছাত্র লীগের সংগঠনের জন্য জনাব আবদুর রহমান চৌধুরীর নাম করতে হয়। ভদ্রলোক এখন ওকালতী ব্যবসায় নিযুক্ত রয়েছেন।

এ সময় অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলায় প্রথম ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ ও তমুদ্দুন মজলিশ ছাড়াও গোপনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশন সক্রিয়ভাবে সমর্থন যোগাতে থাকে। আটচল্লিশ সালের প্রথম ভাষা আন্দোলনের শ্লোগান ছিল, 'উর্দু আমরা চাই না'—'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।' সুদীর্ঘ চার বছর পর এ শ্লোগানের পরিবর্তন ঘটে। তখন পরিবর্তিত অবস্থায় শ্লোগান হলো—"রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা চাই, উর্দু-বাংলা ভাই ভাই।" আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনের জোয়ার দিনাজপুরেও এসে হাজির হলো। আমরাও এ ব্যাপারে পিছপাও হলাম না। কিন্তু হঠাৎ করে শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হলো। আর দিনাজপুরে সদ্য আগত অবাঙালী মুসলমানেরা আমাদের কার্যকলাপ দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলো। কেননা তাদের ধারণা পাকিস্তান কায়েম হবার পর বাঙালীত্বের আর দরকার কোথায়? আর উর্দুই তো হচ্ছে মুসলমানদের ভাষা। আমরা জবাবে বললাম, 'আমরাই তো হচ্ছি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই কালের স্রোতে তোমাদেরই আমাদের

সাথে মিশে যেতে হবে। আর উর্দু তো হচ্ছে হিন্দুস্থান থেকে আমদানি করা ভাষা। দেখছো না, উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেরই মাতৃভাষা নয়? আর ইসলামের কথা বলিতে গেলে, বাংলাদেশের মুসলমানদের মতো এ রকম পরহেজগার মুসলমান পাবে কোথায়? তাই বলে মাতৃভাষাকে তো আর ভুলতে পারি না।'

বুঝলাম এখন আর যুক্তিতর্কের অবকাশ নেই। তাই আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করে তুললাম। এমন কি ১৪৪ ধারা পর্যন্ত লজ্ঘন করলাম। কিন্তু ছাত্র বলেই হোক অথবা যে-কোন কারণেই হোক, আমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়া হলো না। এ সময় দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জনাব হাসান তোরাব আলী, আই· সি· এস। ইনি একদিন আমাদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'বুঝলেন, আমি বোধ হয় আর এখানে থাকছি না। আমার বদলীর হুকুম হয়েছে। আপনারা এর পর একটু সাবধানে আর হিসেব করে চলবেন। আপনারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাউকে গ্রেফতার পর্যন্ত করিনি বা পুলিশকে লাঠি চার্জ করতে দেইনি। এতে ভাববেন না যে সব ডি. এম.-ই এ রকম করবে। আমরা দিল্লীর অধিবাসী। তোরাব আলী সাহেবের কথায় বিস্মিত ও হতবাক্ হয়ে ফিরে এলাম। এ ভদ্রলোক দিনাজপুরের তে-ভাগা আন্দোলনের সময় থেকেই দিনাজপুরের ডি. এম. ছিলেন।

সপ্তাহখানেকের মধ্যে এক বাঙালী ডি. এম. দিনাজপুরে এসে হাজির হলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা তোরাব আলী সাহেবের হুঁশিয়ারীর কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। এর মধ্যে রাজশাহী কলেজে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য এক ছাত্র-আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো। এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন

অদলীয় ছাত্র নেতা জনাব গোলাম রহমান। ইনি বর্তমানে দিনাজপুর বারে ওকালতী করছেন। রাজশাহী কলেজের ছাত্র আন্দোলন মারাত্মক আকার ধারণ করলে রাজশাহী কলেজ ও ছাত্রাবাসগুলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হলো। শুধু তাই-ই নয়, জনাব গোলাম রহমানকে কয়েকজন সহকর্মীসহ রাজশাহী থেকে বহিষ্কার করা হলো। আমরা এদের দিনাজপুরে আশ্রয় নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। এদের উপস্থিতির জন্যই রাজশাহীর ছাত্র জুলুমের প্রতিবাদে দিনাজপুরে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠলো। এ আন্দোলনের সময় মরহুম দবিরুল ইসলাম, জনাব নূরুল হুদা কাদেরবক্স ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের নেতা হিসাবে আমাকে সহ বেশ কয়েকজনকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হলো। আমাদের গ্রেফতারের খবর ঢাকায় এসে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ মহলে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিলো। আমাদের সাহায্যার্থে যে-সব ছাত্রনেতা সুদূর দিনাজপুরে দৌড়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মেসার্স শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুল হামিদ চৌধুরী, মরহুম আজিজ ভাই অন্যতম ছিলেন। কিন্তু এঁরা দিনাজপুরে পৌছবার মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে এঁদের দিনাজপুর থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর কয়েক দিনের মধ্যেই দিনাজপুর জেলে আমাদের উপর লাঠি চার্জ করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের জেলের ভিতরে রাজবন্দীদের উপর লাঠি চার্জের ঘটনা এটাই প্রথম। আর এদিকে ঢাকায় তৎকালীন প্রাদেশিক জেলমন্ত্রী ঘোষণা করে বসলেন যে, 'বিভাগপূর্ব যুগে যাঁরা সরকারবিরোধী রাজনীতি করতেন তাঁরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই রাজনীতি করতেন, আর আজ যাঁরা সরকারবিরোধী রাজনীতি করছেন তাঁরা অর্জিত স্বাধীনতাকে ধ্বংস করবার জন্যই রাজনীতি করছেন।'

কিছুদিনের মধ্যেই আমরা জেল থেকে ছাড়া পেলাম। দিনাজপুরে তখন ছাত্র আন্দোলন চরমে উঠেছে। আমাদের মুক্তিলাভের ফলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হলো। জেল থেকে বেরিয়ে আব্বার কথা চিন্তা করে মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। কেননা, ভাবলাম, জেলে যাওয়ার ফলে যে 'অপরাধ' করেছি, আব্বা তা কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবেন না। আমাদের ক'ভাইয়ের মনে রাজনীতির সামান্যতম ছোঁয়া যাতে না লাগে আব্বা সারাটা জীবন তার জন্য কত প্রচেষ্টাই না করে গেছেন। কিন্তু তাঁর সব প্রচেষ্টাকেই বিফল করে আমরা বড় তিনজনই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লাম। তাই বাসায় ফিরে আব্বার কাছে জেলখাটার কী জবাব দেব, সে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লাম। এছাড়া চিন্তা করে দেখলাম যে, আব্বার মারের কাছে জেলখানার লাঠি চার্জ তুলনামূলকভাবে শিশুই বলতে হয়। দুরু দুরু বক্ষে রাত প্রায় ন'টার সময় বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। আমাকে আম্মা বুকের মধ্যে চেপে সে কি কান্না! আব্বা দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে আমাকে কিছুই না বলে নিজের পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলেন। আমার বুকের ভিতর থেকে একটা বড় নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। মনে মনে ভাবলাম, যাক, এ যাত্রায় রক্ষা পেলাম।

হঠাৎ করে আব্বা মাদারীপুরে এস-ডি-পি-ও হিসেবে বদলী হলেন। আমরা বড় ক'ভাই বাংলাদেশের একটা ম্যাপের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মাদারীপুরের অবস্থানটা একটু ভাল করে দেখবার জন্য আর দিনাজপুর থেকে যাওয়ার রাস্তাটা খুঁজে বের করবার জন্য। আবার সমস্ত বাসাটাতেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে দিনাজপুরের সমস্ত সম্পর্ক কেটে দিয়ে আমরা এবার পাড়ি জমালাম মাদারীপুরের পথে। প্রথমে গোয়ালন্দ পর্যন্ত ট্রেনে, তারপর 'গারো' স্টীমারে যখন

মাদারীপুর ঘাটে এসে নামলাম তখন হিসেব করে দেখলাম যে, পথে আমাদের প্রায় দেড় দিন সময় কেটে গেছে।

আটচল্লিশ সালের মাদারীপুরকে শহর না বলে একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম বললেই চলে। প্রায় বারো আনা শহরটাই আড়িয়াল খাঁ নদীর গর্ভে চলে গেছে। তাই একটা বিরাট লেক কেটে নতুন শহরের গোড়াপত্তন হয়েছে মাত্র। যে রাতে আড়িয়াল খাঁ মাদারীপুরের জেলখানা গ্রাস করে, সে রাতের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। জেলখানা ভরা কয়েদী। সন্ধ্যার আগেই জেলের মধ্যের আঙ্গিনায় ফাটলের দাগ দেখা দিল। অর্থাৎ সবাই বুঝতে পারলেন যে, জেলের দেয়াল সহ আঙ্গিনার দাগ পর্যন্ত সমস্ত এলাকা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নদীর গর্ভে চলে যাবে। তাই উপায়ান্তরবিহীন অবস্থায় কর্তৃপক্ষ পুলিশ লাইন থেকে আমর্ড ফোর্স চেয়ে পাঠালেন। রাতের বেলাতে অনেক ক'টা হেজাক জ্বালিয়ে সশস্ত্রবাহিনী দিয়ে ঘেরাও করে সমস্ত কয়েদীকে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। রাতভর এদের এভাবেই গার্ড দেয়া হলো। পরদিন সকালে একটা স্টীমারের ব্যবস্থা করে সমস্ত কয়েদীদের ফরিদপুর সদরে পাঠানো হলো।

যাহোক, মাদারীপুর ঘাটে পা দিয়েই বুঝলাম যে, এ শহরে দু'চারটা সরু রাস্তা আছে বটে, কিন্তু যানবাহনের মধ্যে একমাত্র সাইকেল ছাড়া আর কিছুই নেই। বহু কষ্টে একটা পালকী জোগাড় করে আম্মাকে চড়ানো হলো। আর আমরা সবাই হেঁটেই এস-ডি-পি-ও সাহেবের কুঠির দিকে রওয়ানা হলাম। এরও প্রায় বছরখানেক পরে অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশ সালে মাদারীপুরে প্রথম তিনটে পুরানো রিক্সার আমদানি হয়। তবুও রিক্সাওয়ালাদের কষ্ট দেখতে দুঃখ হতো। কেননা, মাদারীপুরের লোকজন পা-হাঁটায় এতোই অভ্যস্ত ছিল যে, পারতপক্ষে কেউই রিক্সায় চড়তো না। দু'চারজন বহিরাগত অফিসাররা রিক্সায় চড়তেন

বটে, কিন্তু ভাড়া দেওয়ার সময় প্রায়ই তাঁরা রিক্সাওয়ালাদের খুশি করতে ব্যর্থ হতেন।

এ হেন মাদারীপুর শহরে দুটো বিরাট আর সুদৃশ্য সিনেমা হল দেখে আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। শুধু তাই নয়, এ দু'টো হলেই অফিসারদের জন্য আলাদা বক্স-এর ব্যবস্থা পর্যন্ত রয়েছে। বুঝলাম, হল দুটোর কর্তৃপক্ষ সব সময়েই স্থানীয় অফিসারদের খুশী করবার জন্য এ ব্যবস্থা চালু করেছেন। মনে খুবই কৌতূহল হলো। তাই মাদারীপুর থানার ও. সি. সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে একদিন কাছের হলটাতে গেলাম। ম্যানেজার সাহেবকে মাদারীপুরের মতো জায়গায় এ রকম সুন্দর আর সুদৃশ্য দুটো সিনেমা হল তৈরীর গোড়ার ইতিহাস জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, আসলে বৃটিশ আমলে মাদারীপুরে একটা মাত্র টিনে-ঘেরা সিনেমা হল ছিল। (সম্ভবতঃ এর নাম ছিল যুধিষ্ঠির হল) এর মালিক ছিলেন হিন্দু। আজাদী লাভের পর নতুন 'প্রভাবশালী' কয়েকজন লোক এ হলে ছবি দেখার জন্য একদিন দাবী করে বসলেন। কিন্তু হল কর্তৃপক্ষ পাশ দিতে অস্বীকার করেন। ফলে দুটো দলের মধ্যেই প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডা হয়। শেষ পর্যন্ত 'প্রভাবশালী' ব্যক্তিরা সেদিনই প্রতিজ্ঞা করলেন যে, নিজেদের সিনেমা হল তৈরী না করা পর্যন্ত মাদারীপুরে আর সিনেমা দেখবো না। যে কথা, সেই-ই কাজ। দিন কয়েকের মধ্যেই দশজন স্থানীয় 'প্রভাবশালী' লোককে একত্র করা হলো। প্রত্যেকেই দশ হাজার করে টাকা দিলেন। আর একজন সিনেমা হলের লাইসেন্স জোগাড় করে এমনিতেই ডিরেক্টার হলেন। এই মোট এগারো জন ডিরেক্টারদের প্রচেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই মাদারীপুর শহরে নতুন সিনেমা হল চালু হলো।

এদিকে অন্য সিনেমা হলের মালিকেরও জেদ চেপে গেল। তিনি নানাভাবে টাকা জোগাড় করে আর একটা নতুন সিনেমা

হলের নির্মাণ কাজ শুরু করে দিলেন। আমরা যখন মাদারীপুর গেলাম তখন এ হলটার নির্মাণকার্য প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছে। মাস দুয়েকের মধ্যেই এ হলটার উদ্বোধন হলো। মাদারীপুরের এ দুটো হলই হচ্ছে 'ইউনাইটেড' আর 'ইউনিভার্সেল'। তখন ভারতীয় ছবি প্রদর্শনের ব্যাপারে কোনরকম নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তাই যে ক'টা দিন মাদারীপুরে ছিলাম, সে ক'টা দিন নিত্যনতুন 'ছবি' দেখে ভালোই কাটাতে লাগলাম।

কিন্তু এর মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যাতে আমার পক্ষে আর মাদারীপুরে থাকা সম্ভব হলো না। ঘটনাটা ঘটেছিল একেবারে ভরসন্ধ্যাবেলায়।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগেই বাসায় ফিরেছি। কিন্তু মুখ-হাত ধোয়ার জন্য আর বাসার মধ্যে যেতে পারলাম না। কেননা বাসার ভিতর থেকে আব্বার বিকট গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। কাদের যেন উদ্দেশ্য করে শাসন করছেন। কান পেতে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করলাম। যখন ব্যাপারটা বোধগম্য হলো তখন আমার সমস্ত শরীরের রক্ত পানি হয়ে গেছে। আমার সিগারেট খাওয়া শেখার কথা টের পেয়ে গেছেন। এক হিন্দু ব্যবসায়ী ভদ্রলোকই আমার এ 'উপকারটা' করেছেন। ভদ্রলোকের বেশ বড়গোছেরই একটা স্টেশনারী দোকান ছিল। তাঁর ইচ্ছে নতুন আগত মহকুমা পুলিশ অধিকর্তা যেন একবারের জন্য হলেও তার দোকানে পদধূলি দেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে আব্বা একেবারেই নারাজ। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক সেদিন আমাদের বাসায় এসে হাজির হলেন আর আব্বাকে বললেন, 'আপনার ছেলে তো পরশুদিনই আমার দোকানে গিয়ে চা-সিগারেট খেয়ে এসেছেন। এবার স্যার আপনাকে একবার পদধূলি দিতেই হবে।' আব্বা তাঁর রাগটাকে চেপে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, 'আপনি এখন আসতে পারেন।' ভদ্রলোক

সুরসুর করে বেরিয়ে গেলেন। আর আব্বা উঠে আমার থাকার ঘরটা সার্চ করে সিগারেটের কয়েকটা টুকরো উদ্ধার করলেন। আর তারপর থেকে শুরু হলো তাঁর গর্জন। একটা হিংস্র ব্যাঘ্রের মতো তিনি খালি রাগে গর্জন করতে লাগলেন। আমাদের সমস্ত বাসাটা নিশ্চুপ হয়ে আব্বার কাণ্ড লক্ষ্য করতে লাগলো। এর পর আব্বা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন যে, আমি বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গুলি করবেন। এখানে আর একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, এ ঘটনার দিন কয়েক আগেই আব্বা বড় ভাইয়ের সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন। আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরীতে আব্বা সেদিন একটা বই খুঁজছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় বইটা পাবার আগেই আর একটা বইয়ের মাঝ থেকে আব্বা একটা হিসাবের স্লিপ উদ্ধার করলেন। স্লিপটা বড় ভাইয়ের হাতের লেখা। তিনদিনের হিসাব। আর প্রতিদিনের হিসাবের ক্ষেত্রেই সাড়ে ছ'আনা ক্যাপস্টান ও দু'পয়সার দিয়াশলাই লেখা রয়েছে। এ থেকেই আব্বার পক্ষে সিদ্ধান্তে আসা স্বাভাবিক যে, তাঁর বড় শ্রীমান ধূমপানে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছেন। আর মেজোভাইয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ। এক নম্বর আর তিন নম্বর সন্তানের যেখানে ধূমপানের হাতেখড়ি হয়েছে, সেখানে দু'নম্বর কিছুতেই স্বাভাবিক হয়ে থাকতে পারে না। অবশ্য বড় দু'জনেই এক মুহূর্তে তাঁর নাগালের বাইরে। একজন ঢাকায় আর একজন দিনাজপুরে।

যা'হোক, যখন বুঝতে পারলাম যে, অব্বার হাতে ধরা পরলে আমার মাংস আর হাড্ডি আলাদা করবেন, তখন আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা আমার পক্ষে নিরাপদ হবে না।

যে চিন্তা, সেই-ই কাজ। আস্তে করে সুটকেস হাতে স্টীমার ঘাটের দিকে রওয়ানা হলাম। তখন মগরেবের আজান পড়তে

শুরু করেছে আর আমি চলেছি নিরুদ্দেশের পথে। প্রায় দেড়দিন পরে ক্ষুধার্ত আর অবসন্ন অবস্থায় এসে হাজির হলাম দিনাজপুর মুন্সীপাড়ার খান লজের মরিয়ম খালার কাছে। তিনি কোন প্রশ্ন না করে আমাকে আশ্রয় দিয়ে বললেন, 'আগে দেখো, তোমার আই-এ'র রেজাল্ট কি হয়? যদি পাশ করতে পার তবে তো কথাই নেই। আমার এখানে থেকেই বি-এ পড়তে পারবে। আর যদি পরীক্ষার ফল অন্য রকম হয় তবে তোমাকে কিন্তু ভালোভাবে পড়াশুনা করতেই হবে। মোট মথা, তুমি লেখা-পড়া ছাড়তে পারবে না। টাকা-পয়সার দরকার থাকলে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিও।' আমি অবাক বিস্ময়ে এ মহীয়সী মহিলার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনার বড়ছেলে তখন স্কুলের ছাত্র।

এর সপ্তাহখানেক পরেই আই-এ'র রেজাল্ট বেরুলো। দিনাজপুর কলেজের বিপুল সংখ্যক ছাত্র ফেল করলেও ভাগ্যলক্ষ্মী আমার প্রতি সুপ্রসন্নই ছিলেন। আমি আই-এ পরীক্ষার বাধা উত্তীর্ণ হলাম। যে-কোন রকমেই হোক আমার দিনাজপুরে চলে আসার খবরটা মাদারীপুরে আব্বার কাছে পৌঁছালো। কিন্তু সেদিক থেকে আর কোন উচ্চবাচ্য হলো না। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

দিন কয়েকের মধ্যেই আমার রাতের ঘুম ছুটে গেল। দিন-রাত শুধু একটাই চিন্তা, বি-এ ক্লাশে ভর্তি হবো কীভাবে? আব্বার কাছে তো আর হাত পাতবার রাস্তা নেই। শেষ পর্যন্ত মেজোভাইয়ের কাছ থেকে গোটা বিশেক, আর এক বন্ধুর কাছ থেকে গোটা পনেরো টাকা নিলাম। তবুও বুঝি আর শেষরক্ষা হয় না। তাই উপায়ান্তরবিহীন অবস্থায় বলতে গেলে খাওয়া দাওয়া এক রকম ছেড়েই দিলাম। মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু মরিয়ম খালা যে আমার গতিবিধি সবই লক্ষ্য

করে চলেছেন তা ঘূর্ণাক্ষরে টের পাইনি। একদিন দুপুরে আমাকে একাকী ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে হাজির হতেই বললেন, 'তোমার বি-এ ক্লাশে ভর্তি হবার কি হলো? মনে রেখো, আমার এখানে পড়াশুনা করার জন্যই তুমি রয়েছো। কোন অসুবিধা থাকলে বলতে পারো।' আমি পাতানো খালাম্মার কাছে আমার বিপদের কথাটা চেপে যাবো বলেই স্থির করেছিলাম। কেননা তাঁদের তো অভাব-অনটনের সংসার। তাই তাঁর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করেই থাকলাম। কিন্তু খুব বেশী চাপাচাপির মুখে আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। সব কিছুই তাঁকে খুলে বললাম। তিনি শুধু বললেন, 'কালই বি-এ ক্লাশে ভর্তি হয়ে যাও। শুধু মনে রেখো, যদি পাশ করতে পারো তবে তুমিই হবে এ-বাড়ী থেকে প্রথম গ্র্যাজুয়েট।' পরদিন সকালে কিছু বলার আগেই মরিয়ম খালা ভর্তি হওয়ার প্রয়োজনীয় টাকা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেলেন।

মরিয়ম খালা আর ইহজগতে নেই। কিন্তু তাঁর অকৃত্রিম মমতার মর্যাদা আমি রাখতে পেরেছিলাম। আমি এ বাড়ীর নুন খেয়ে কলেজের পড়া সাঙ্গ করেছিলাম। নানা ধরনের গণ্ডগোলের জন্য সে বছর নভেম্বর মাসে আমাদের বি-এ পরীক্ষা হলো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমরা বি-এ পরীক্ষা দিলাম। আমাদের কলেজের মোট ৬৫ জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৬ জন উত্তীর্ণ হলো। এ ছ'জনের একজন ছিলাম আমি স্বয়ং। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে বছর উত্তীর্ণের সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র ২১ জন।

বি-এ পরীক্ষা দেয়ার পর একদিন সুপ্রভাতে মাদারীপুরে এসে হাজির হলাম আব্বা-আম্মার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। হঠাৎ করে মাদারীপুরে এসে সংবাদ পৌঁছলো যে, দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মুসলিম লীগ সরকারের দু'-দুজন মন্ত্রী জনাব হাসান আলী

আর জনাব আফজাল সাহেব সফরে আসছেন। চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মাদারীপুর টাউন থেকে মাত্র ছ'মাইল দুরে প্রদেশের এককালীন তৃতীয় বৃহত্তম নদী-বন্দর চরমুগুরিয়ায় মন্ত্রী মহোদয়রা এক জনসভায় বক্তৃতা করবেন। শুনেছি, মাত্র বাইশ বছরের ব্যবধানে নাকি আড়িয়াল খাঁ নদীর এখন সে যৌবন আর নেই এবং তারই ফলে নদীর মধ্যে ছোট-বড় চর পড়ায় চরমুগুরিয়া বন্দরেরও সে জৌলুষ আর নেই। বড় বড় স্টীমার হুইশেল বাজিয়ে এখন আর চরমুগুরিয়ায় ভিড়তে পারে না; শত শত মাল বোঝাই গয়না-নৌকা চরমুগুরিয়ায় ক্রেতার সন্ধানও পাওয়া যায় না। তাই প্রদেশের এককালীন তৃতীর বৃহত্তম নদী-বন্দর এখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছে।

যাক, যা বলছিলাম। এহেন চরমুগুরিয়ায় তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের সফররত মন্ত্রীদ্বয়ের জনসভার আয়োজন করা হলো। স্থানীয় মুসলিম লীগ আর প্রশাসন কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় জনসভায় লোক সমাগম ভালোই হলো আর নেতৃবৃন্দও বেশ জোড়ালো ভাষায় বক্তৃতা করলেন। এদিকে চরমুগুরিয়া বন্দরে ভিড়ানো মন্ত্রী মহোদয়ের লঞ্চেই রাতের ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নদীর পাড় থেকে পোলাও কোরমার খুশবু ভেসে আসছে। মগরেবের নামাজের আগেই মিটিং শেষ হয়ে গেল। লোকেরা সব বাড়ী ফেরার জন্য স্টীমার ঘাটের দিকে যেতে শুরু করেছে আর সভাস্থলে মগরেবের নামাজের কাতার হয়েছে। এমন সময় জনতার মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। ধীরে ধীরে ঘাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একজন বছর বিশেকের ছাত্র একটা জায়গা থেকে তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা করে উপস্থিত জনতাকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করছে। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম, বক্তার সামনে সাদা কাপড়ে একটা লাশ ঢাকা

রয়েছে। কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। বক্তৃতার মর্মার্থ শুনে হতবাক্ হয়ে গেলাম। বক্তা জোর গলায় বলে চললেন, "সমগ্র মাদারীপুর মহকুমায় এখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বজায় রয়েছে। আর এরই শিকার হচ্ছে এই গরীব কৃষক। অনাহারে এই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আর ঐ দেখুন আমাদের নেতাদের জন্য পোলাও কোরমা তৈরী হচ্ছে।" বক্তৃতা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। আর এই মারমুখী জনতা মন্ত্রীমহোদ্বয়ের খোঁজ করতে শুরু করলো। মুহূর্তে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হলো। স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ মন্ত্রীদের নিরাপত্তার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। বহু কষ্টে বিরাট হৈ-চৈ, লাঠি-চার্জ, ধাক্কাধাক্কি, চীৎকার আর ইট-পাটকেলের মধ্যে মন্ত্রীমহোদ্বয়কে এনে লঞ্চে উঠানো হলো। ডিনারের কথা তখন আর কারো খেয়ালই নেই। তখন জান বাঁচানো ফরজ। তাই সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চটা রাতের অন্ধকারেই নারায়ণগঞ্জের পথে পাড়ি জমালো। কিন্তু অনাহারে মৃত্যুর ব্যাপারটা তদন্ত করার পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হতভম্ব হয়ে পড়লেন।

এর মধ্যে মাদারীপুরে পুলিশ আর সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে গণ্ডগোল দেখা দিল। অবশ্য গণ্ডগোলটার সূত্রপাত হয়েছিল কায়েদে আজম রিলিফ ফাণ্ডের চাঁদা আদায় নিয়ে। এস. ডি. ও. সাহেব তাঁর অফিসারদের নিয়ে বেশ উদ্যমের সঙ্গে চাঁদা আদায় শুরু করলেন। আর অন্যদিকে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ঐ ফাণ্ডের জন্য আলাদা করে চাঁদা আদায় আরম্ভ করলো। ফলে পুলিশ আর সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে প্রথমে সুস্থ প্রতিযোগিতা, তারপর রেষারেষি আর শেষ পর্যন্ত জেদাজেদিতে পরিণত হলো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের দল অনেক বেশী টাকা চাঁদা আদায় করে ফরিদপুর হেড কোয়ার্টারে তাঁদের সুপারের কাছে পাঠিয়ে

দিল। চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারে পরাজিত হওয়ায় সিভিল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের দল বেশ ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠলেন। কিন্তু দু'দলের সবাই সরকারী কর্মচারী বলে গোপনে জেদাজেদিটা আর অসহযোগিতা অব্যাহত থাকলো। ফলে বাহ্যিকভাবে কোর্ট অফিসে দু'দলের সদস্যদের মধ্যে চাকুরীর খাতিরে কথাবার্তা হলেও সামাজিক উঠা-বসা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। অন্যদিকে মহকুমার শাসন ব্যবস্থায় প্রায় এর সঙ্গে সঙ্গে মাদারীপুরে দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিল; চালের মণ চল্লিশের উপরে গিয়ে দাঁড়ালো। তখনকার দিনে ৪৫৲ টাকা মণ চাল একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল। ফলে মহকুমার শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বেশ উদ্বেগ দেখা দিল। বহু লেখালেখির পর সরকারী পর্যায়ে প্রচুর পরিমাণে আটা মাদারীপুরে পাঠানো হল। কিন্তু সাধারণ মানুষের অনেকেই আটা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলো। কেননা এখনও পর্যন্ত মাদারীপুরের গ্রামাঞ্চলে প্রধান খাদ্য হিসাবে আটা ভক্ষণ তো দূরের কথা, আটার ব্যবহার পর্যন্ত অনেকের কাছে অজানা ছিল। তাই স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ আটা বিক্রীর ব্যাপারে এক নাজুক অবস্থার সম্মুখীন হলো। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন সিভিল সাপ্লাই বিভাগের ইন্সপেক্টরকে বেলুন-পিঁড়ি নিয়ে গ্রামাঞ্চলে জনসভা করে রুটি বানাবার পদ্ধতি দেখাবার নির্দেশ দেয়া হলো। কিন্তু এতেও অবস্থার কোন উন্নতি হলো না। জনসাধারণ ক্রমাগত চালের জন্য দাবী জানিয়ে যেতে লাগলো।

ঠিক এমনি সময়ে সরকার বিরোধী কয়েকজন ছাত্র মিলে এমন একটা কাণ্ড করে বসলো যাকে অচিন্তনীয় বলে আখ্যায়িত করা যায়। এরা কর্তৃপক্ষের অজান্তে মহকুমার চরাঞ্চলে কয়েকদিন ধরে ঢোল দিয়ে জানিয়ে দিলো যে, পরবর্তী শুক্রবার বাদ জুমা মাদারীপুর টাউনে এস. ডি. ও. সাহেবের বাংলো থেকে

সাড়ে তেরো আনায় মাথাপিছু দু'সের করে চাল দেয়া হবে। ফল দাঁড়ালো এই যে, শুক্রবার দিন সকাল থেকেই হাজার হাজার অভুক্ত নর-নারীর দল দূর-দূরান্ত থেকে হাজির হলো মাদারীপুর টাউনে আর তারা জমায়েত হতে লাগলো এস ডি. ও. সাহেবের বাংলোর চারপাশে। প্রথমে অনেকেই ভেবেছিল যে, জুমার দিন বলে ফকিরের আগমন ঘটেছে। কিন্তু বেলা বারোটা নাগাদ যখন এদের সংখ্যা পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে গেল, তখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এরা সবাই ঢোল শুনে চাল নিতে এসেছে। এ ঘটনায় মহকুমা কর্তৃপক্ষ একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়লো। আর এস. ডি. ও. সাহেবের বাংলো ঘেরাও হয়ে রইলো। বহু অনুরোধ উপরোধেও কাজ হলো না। শেষ পর্যন্ত এস. ডি. ও সাহেব আব্বাকে নির্দেশ দিলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল পুলিশ এসে এ অভুক্ত জনতাকে লাঠি-চার্জ করে হটিয়ে দিলো। পুলিশের মার খেয়ে জনতা এস ডি ও.-বিরোধী ধ্বনি তুলে মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণ করলো।

এ ঘটনার দিন কয়েক পরে আব্বা আমাকে আর মেজোভাইকে বললেন, 'তোরা দু'জন তো বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বসেই রয়েছিস, সাবডিভিশনাল কন্ট্রোলারকে বলে তোদের কন্ট্রোলের ব্যবসায় লাগিয়ে দিতে চাই। আমরা দু'জনেই আব্বার এ প্রস্তাবে রাজী হলাম। পরদিন কন্ট্রোলার সাহেবের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি আমাদের খুবই উৎসাহ দিয়ে কিছু কাগজপত্র দিলেন। আমরা দু'ভাই মহাআনন্দে সকল কাগজপত্র নিয়ে বাসায় ফিরে এসে আব্বাকে দিলাম। আব্বা হিসেব করে দেখলেন যে, আমাদের আপাততঃ প্রায় দু'হাজার টাকা মূলধনের প্রয়োজন। আমরা টাকাটা নিয়ে ট্রেজারীতে জমা দিয়ে কন্ট্রোলার অফিস থেকে পারমিট বের করে চরমুগুরিয়ার ইস্পাহানীর গুদাম থেকে একশত মণ চাল আর আটা নিয়ে

পালং থানার দিকে রওয়ানা হলাম। আমাদের উপর নির্দেশ, এ একশ' মণ আটা আর চাল কন্ট্রোল দরে পালং থানায় হাটের দিন বিক্রী করতে হবে। নৌকার ছাদে বসে দু'ভাই গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগলাম,

'ভালবাসা মোরে ভিখারী করেছে,
তোমারে করেছে রাণী···।'

বড় ব্যবসায়ী হওয়ার আনন্দে দুজনেই বিভোর হয়ে গেলাম। পালং থানার ঘাটে নেমেই সোজা বাজারে চলে গেলাম। এক সাহার গদিতে মাল তুলে আট আনা পয়সা দিয়ে ঢোল দিয়ে দিলাম। সেদিন বিকেলেই হাট। সাহামশায় আমাদের বার বার আশ্বাস দিতে লাগলেন যে, কোনোরকম গণ্ডগোল হবে না। তাই আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন। কিন্তু সাহামশায়ের আশ্বাস সত্ত্বেও আমরা নিশ্চিত হতে পারলাম না। তাই থানায় গেলাম দু'জনে। দারোগা সাহেব যখন জানতে পারলেন যে, আমরা দু'জনেই হচ্ছি এস. ডি. পি. ও. সাহেবের ছেলে, তখন তিনি কিছুতেই আর আমাদের সাহার গদিতে থাকতে দিলেন না। একরকম জোর করে এনে থানার ইন্সপেকশন রুমে উঠিয়ে পোলাও কোরমার ব্যবস্থা করলেন। আমরা দু'জনেই আব্বার অমোঘ নির্দেশের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে থানার আতিথ্য গ্রহণ করলাম। কিন্তু কিছুতেই মনে আর শান্তি পেলাম না। খালি ভয় হতে লাগলো, সাহা যদি কিছু মাল 'ব্ল্যাক' করে দেয়! তাই বেলা তিনটে নাগাদ অর্থাৎ হাট আরম্ভ হওয়ার আগেই আমরা সাহার গদিতে গিয়ে হাজির হলাম। দু'জন কনষ্টেবল দিয়ে লাইন বানিয়ে দিলাম আর ঠিক করলাম মাথাপিছু এক সের করে চাল দেওয়া হবে। চাল দেয়া শেষ হলে, এক সের করে আটা দেয়া হবে। কিন্তু গোলমাল বাঁধলো খুচরো পয়সা নিয়ে। সাহামশায় এক পয়সা ফেরত দেয়ার বদলে একটা

করে পয়সা বেশী নিতে লাগলেন। সন্ধ্যা সাতটায় যখন সব বিক্রী শেষ হয়ে গেল, তখন হিসেব করে দেখলাম, সের প্রতি এক পয়সা বেশী নেওয়ার জন্য একশ' মণে অতিরিক্ত সাড়ে ৬২৲ টাকা পাওয়া গেছে। এছাড়াও কিছু চাল আর আটা অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আমরা দুজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। যেখানে হিসেব করে একশ' মণ আটা, চাল আনা হয়েছে, সেখানে এ অতিরিক্ত চাল আর আটা এলো কোত্থেকে। তাকিয়ে দেখলাম, সাহামশায় মুচকী হাসছেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করতেই তিনি যা বললেন, তাতে হতভম্ব হয়ে গেলাম। মাপের সাহায্যেই এটুকু আটা আর চাল বেঁচে গেছে আর এটাই নাকি ব্যবসায়ের প্রথম 'ছবক'। আমরা দু'ভাই তখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত বাড়তি চাল আর আটা ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করে দিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর রাতে হিসাব করে দেখলাম আমাদের ন্যায্য মুনাফা আর অতিরিক্ত এক পয়সা করে রাখার দরুন একদিনে আমাদের মুনাফার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২৫৲ টাকার মতো। এর মধ্যে সমস্ত খরচা বাদ দিয়ে আমাদের হাতে থাকছে প্রায় ১০৫৲ টাকা। মাত্র দু'হাজার টাকা মূলধনে একদিনে মুনাফা ১০৫৲ টাকা—একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বৈকী!

পরদিন সকালে যখন আবার মাদারীপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য নৌকায় চড়লাম, তখন থানার ও. সি. সাহেব ছাড়াও সেই সাহামশায়ও ঘাটে এলেন বিদায় দিতে। হাত কচলিয়ে সাহামশায় বললেন, 'স্যার, ব্যবসার মত জিনিস আর নেই। তবে রক্তটা আর একটু ঠাণ্ডা হলে ব্যবসায়ের আরও বুদ্ধি নিজে নিজে ঠিক করতে পারবেন। হেঁ, হেঁ, হেঁ।' আজ থেকে প্রায় একুশ বছর আগে পালং থানার ঘাটে দাঁড়িয়ে এক সাহা যে কথা বলেছিলেন, তা' এখন শুধু ব্যবসায়ে কেন, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই হুবহু চালু হয়েছে। তাই নয় কী?

দিন চারেক পর কন্ট্রোলে চাল আর আটা বিক্রী করবার আর একটা পারমিট পেলাম। এবার আমাদের নির্দেশ দেয়া হ'ল যে, রাজৈর থানা এলাকায় এ সব চাল আর আটা কন্ট্রোল দরে বিক্রী করতে হবে। আমরা এ নির্দেশ শিরোধার্য করে নৌকায় রাজৈর রওয়ানা হলাম। যখন রাজৈর থানার ঘাটে আমাদের নৌকা ভিড়লো, তখন বেলা প্রায় তিনটা বাজে। আমরা নৌকা থেকে নামতে গিয়ে শুনলাম যে, কিসের যেন একটা ঘোষণা করে ঢোল দেয়া হচ্ছে। ঘোষণাটা ভালো করে যখন শুনলাম তখন দু'ভাই-এর মুখ শুকিয়ে গেল। ঢোলের মর্মার্থ হলো যে, রাজৈর থানা কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন যে, বেলা তিনটার পর কেউ নৌকা ছেড়ে গন্তব্যস্থলে রওয়ানা হলে এবং সে নৌকায় ডাকাতি হলে পুলিশ দায়ী থাকবেন না। অর্থাৎ চুরি-ডাকাতি রাহাজানি এ সব বন্ধ করা পুলিশের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। ঘাটে দাঁড়িয়েই শুনলাম যে, দিন কয়েক আগে রাজৈর বাজারের এক মাছ ব্যবসায়ীর বাড়ীতে সন্ধ্যারাতেই ডাকাতি হয়েছে। এখানে ডাকাতরা কুড়াল দিয়ে সদর দরজা কেটে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ডাকাতি করে প্রায় দশ হাজার টাকার মাল ও নগদ টাকা নিয়ে গেছে। অথচ ঘটনাস্থল থেকে থানার দূরত্ব ৩—৫ ফার্লং-এর বেশী নয়। বুঝলাম এ অঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে! আরও বুঝলাম যে, ভক্ষকদের সঙ্গে রক্ষকদের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে।

অবস্থার গুরুত্ব চিন্তা করে নৌকার মধ্যে মাল রেখে আমি থানায় গিয়ে হাজির হলাম। দারোগা সাহেব আমার মুখচেনা। মাদারীপুরে আব্বার অফিসে ভদ্রলোককে দেখেছি। কিছু বলবার আগেই দারোগা সাহেব লাফিয়ে উঠে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। মনে হলো যেন বহুদিন পরে ভদ্রলোকের মায়ের

পেটের ভাই বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আমি তাঁকে অনেক কষ্টে আমাদের অবস্থা বুঝিয়ে পরামর্শ চাইলাম। ভদ্রলোক তখনিই ঘাটে জনাকয়েক কনষ্টেবল আর কুলী পাঠিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের চাল ও আটা থানার বারান্দায় উঠানো হলো আর আমরা দু'ভাই দারোগা সাহেবের বাসায় মহা-সম্মানিত অতিথি হলাম।

বিকেলেই বাজারে গিয়ে পালং থানার মতোই একটা গদী ঠিক করলাম। গদীর মালিক মুসলমান। তিনি সরাসরি আমাদের সমস্ত চাল আর আটা 'হাই রেটে' কেনার প্রস্তাব করলেন। মেজোভাই গম্ভীরভাবে বললেন, 'সেটা সম্ভব নয়। আপনার গদীতে রেখে মাল বিক্রী করার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন কিনা তা বলেন।' ভদ্রলোক সানন্দে আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে আমাদের সন্দেশ খাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। আমরা সন্ধ্যার আগেই কণ্ট্রোলে চাল আর আটা বিক্রীর জন্য ঢোল দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। পর-দিন রাজৈর হাট। দুপুর থেকেই লাইন করে পালং থানার মতোই প্রথমে চাল আর পরে আটা কণ্ট্রোল দরে বিক্রী করে দিলাম। সন্ধ্যার আগেই বিক্রী শেষ হয়ে গেল। এখানেও খুচরো জমার পয়সার অভাবে প্রতি সেরে এক পয়সা করে বেশী নিতে হলো। যখন হিসাবপত্র শেষ হয়ে আসছে, তখন গদীর মালিক মাটির দিকে চোখ রেখে বললেন, 'স্যার একটা কথা ছিল।' আমি বললাম, 'এখানে বলতে তো কোন আপত্তি নেই?' ভদ্রলোক বললেন, 'স্যার একটু বাইরে আসুন।'

যখন সবকিছু শুনলাম, তখন আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। ভদ্রলোক আমাদের সব মাল কণ্ট্রোল দরে বিক্রী করেননি। মণ পাঁচেক চাল আলাদা করে রেখে দিয়েছেন; উনিই 'আলাদা দরে' কিনবেন বলে। বাদ মগরেবের পর আবার এ পাঁচ মণ চাল

বাজারের লোকদের মধ্যে মাথাপিছু হু'সের করে কন্ট্রোল দরে বিক্রীর ব্যবস্থা করলাম। আর দোকানে গদীতে বসে মালিকের স্বগত উক্তি শুনলাম, 'এ্যাগো দিয়ে আর যাই-ই হউক বিজিনেস্ হইব না।' ভদ্রলোক ঠিক কথাই বলেছিলেন, অবশ্য কথাটার অর্থ তখন ঠিকভাবে না বুঝলেও আজ ২১ বছর পর তা ভালোভাবেই বুঝতে পারছি।

এর দিনকয়েকের মধ্যেই চাঁদপুর থেকে পাঁচ হাজার টিন কেরোসিন তেল আনার 'ক্যারিং কন্ট্রাক্ট' পেলাম। প্রতি বিশ টিনে এক টিন 'লিকেজ' ছাড়াও নৌকা ভাড়ার 'মার্জিন' সবকিছু হিসাব করে দেখলাম, কাজটা করতে পারলে মুনাফা ভালই হবে। চরমুগুরিয়ার এক ব্যবসায়ী কেমন করে যেন ব্যাপারটা জানতে পারলেন। ভদ্রলোক সরাসরি আমাদের বাসায় এসে এমন এক প্রস্তাব দিলেন, যাতে আমরা দু' ভাই-ই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। এই-ই কী আমাদের দেশের ব্যবসার অবস্থা?

পান চিবুতে চিবুতে ভদ্রলোক যা' বললেন, তার অর্থ দাঁড়ালো যে, কেরোসিনের টিনগুলো তো কয়েকটা নৌকায় আসবে। তাই একটা ভাঙ্গা ধরনের নৌকা জোগাড় করতে হবে আর নৌকাটাকে মাদারীপুর মহকুমার এলাকায় এনে যেখানে নদীর গভীরতা খুব বেশী সেখানে ডুবিয়ে দিতে হবে। অবশ্য ভাঙ্গা নৌকাটাতে কোন তেলের টিন থাকবে না। তেল ভর্তি কিছু সংখ্যক টিন আগেই সরিয়ে রাখতে হবে। পরে নৌকা ডুবানোর খবরটা নিকটবর্তী থানায় ডাইরী করতে হবে। আর যেহেতু আমার আব্বা মাদারীপুর মহকুমার পুলিশ অধিকর্তা, সেইহেতু থানা কর্তৃপক্ষ রিপোর্টটা 'মনের মতোই' দিবে। আর সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা নিয়ে আর কেউ বিশেষ ঘাঁটাঘাঁটি করবে না। মাঝখান থেকে মুফতে কয়েক হাজার টাকা লাভ হবে। এরপর ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে যুক্তভাবে এ ব্যবসাটা

করার প্রস্তাব দিলেন। আর বললেন যে, পয়সাকড়ি বানাতে হলে এভাবেই ব্যবসা করতে হয়।

প্রস্তাবটা চিন্তা করে দেখার জন্য সময় চেয়ে ভদ্রলোককে বিদায় করলাম। কিন্তু দু' ভাইয়ের বুকের ভিতরটা তখন ভয়ে শুকিয়ে গেছে। লোকটা ডাকাত নাকি? খালি চিন্তা করতে লাগলাম, একেই কি ব্যবসা বলে না দিনে-দুপুরে ডাকাতি বলে? এ প্রশ্নের জবাব আজও পাইনি। কেবল আইয়ুব দশকে, বড় আকারে এ ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য হয়েছে বলে শুনতে পেয়েছি। অবশ্য সেটাকে সরাসরি 'লুণ্ঠন' ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বাইশটা সুখী পরিবারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এ ধরনের ব্যবসা আর ভাল লাগলো না। তাই অব্বার মূলধন ফেরত দিয়ে আমরা দুজনেই আবার দিনাজপুরে পাড়ি জমালাম। দিনাজপুরে পৌঁছে দেখি শহরটা থমথম করছে। খানিকটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। কেননা কলিকাতায় আবার দাঙ্গা শুরু হয়েছে। ছাত্র লীগ আর প্রগতিশীল চিন্তাধারার অদলীয় কিছু ছাত্রকর্মীদের নিয়ে এক বৈঠকে নিজেদের কর্তব্য স্থির করলাম। দিনাজপুরে কিছুতেই দাঙ্গা হতে দেওয়া হবে না। আর ঐ ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের সমর্থন না পেলে শুধু মাত্র কিছু সংখ্যক বহিরাগতদের দিয়ে দাঙ্গা হতে পারে না। তাই আমরা স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদের কাছে ধর্ণা দিয়ে জানালাম যে, দিনাজপুরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুনাম কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। কিন্তু কলিকাতার দাঙ্গার নানা রকমের মুখরোচক গল্পে ছোট দিনাজপুর শহরটা সরগরম হয়ে উঠলো। এর উপর তখন পর্যন্ত পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে পাসপোর্ট পদ্ধতি চালু হয়নি। ফলে কলিকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে যে লোকে যে গুজবই ছাড়ুক না কেন, তাই-ই

বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল। অবস্থা ধীরে ধীরে চরম আকার ধারণ করলো।

দিনাজপুরের পরের ষ্টেশন বিরলই হচ্ছে সীমান্ত ষ্টেশন। এরপর পশ্চিম বাংলার রাধিকাপুর। আমরা ভাবলাম, এতো লোকই তো গুজব রটনা করছে। আমরাও না হয় একটা গুজব রটিয়ে দেখি? যেমন কথা, তেমন কাজ।

পরদিন যেখানেই যাই, ওই একটিই মাত্র কথা। আরে শুনছেন, রাধিকাপুরে নাকি কামান নিয়ে এক ব্যাটালিয়ন শিখ সৈন্য এসেছে? মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিনাজপুরে উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটলো। শুধু তাই-ই নয়, আজও পর্যন্ত দিনাজপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে। কিন্তু গত ২০।২২ বছরের মধ্যে একটা কথার জবাব পাইনি। মানবতার প্রতি প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ কথাগুলো কি শুধু অভিধানেই রয়ে যাবে!

এর মধ্যে আমাদের বি-এ পরীক্ষার ফল বেরুলো। আমরা দিনাজপুর কলেজ থেকে ৬৫ জন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম। এর মধ্যে মাত্র ছয়জন পাশ করেছিলাম। এ ছ'জনার মধ্যে নিজের নাম দেখে প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে পারিনি। দৌড়ে গিয়ে মরিয়ম খালা আর বড় চাচীকে বললাম, 'আপনাদের বাড়ীর নুনের দাম রেখেছি।' দু'জনেই আমাকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন। কেননা আমিই হচ্ছি দিনাজপুর মুন্সীপাড়ার 'খান লজের' প্রথম গ্র্যাজুয়েট। এরপর মরিয়ম খালার সঙ্গে আর একবার মাত্র দেখা হয়েছিল।

১৯৫০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী গুরুজনদের সালাম পর্ব শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার জন্য ঢাকায় রওয়ানা হলাম। যখন এসে ঢাকা পৌঁছলাম, তখন কলিকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া

হিসাবে ঢাকাতেও দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। পুরানো ঢাকার রেল ষ্টেশনে ফুলবাড়িয়াতে কারফিউএর জন্য আটকা পড়ে গেলাম।

যখন ১১ নম্বর জয়নাগ রোডের ইকবাল হলে গিয়ে পৌঁছুলাম তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। কিন্তু রিক্সায় যাওয়ার সময় রাস্তা প্রায় জনমানবশূন্য দেখলাম। সপ্তাহখানেক ঢাকায় থাকার পর হাঁপিয়ে উঠলাম। তাই ভাবলাম আব্বা-আম্মার কাছ থেকে একটু ঘুরেই আসি। এদিকে তো ইউনিভার্সিটিতে কোন ক্লাশই হচ্ছে না। আব্বা তখন বরিশালের সদর ডি. এস. পি. হিসেবে বদলী হয়ে গেছেন। তাই একদিন বাদামতলীঘাট থেকে বরিশাল রওয়ানা হলাম। রাত সাড়ে তিনটায় বরিশাল ঘাটে ষ্টীমার পৌঁছালো। কিন্তু ষ্টীমার আর ঘাটে লাগানো হলো না। প্যাসেঞ্জাররা সব রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। তখন সারেং আর খালাসীরা মিলে আমাদের যা বুঝালো তাতে অর্থ দাঁড়ায় এই, গত কয়েকদিন থেকে বরিশাল শহরে দাঙ্গা শুরু হয়েছে।

তাই সকাল আটটায় কারফিউ-এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর ষ্টীমার ঘাটে লাগানো হবে। আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

বাইরের দুনিয়ার সাথে বরিশালের যোগাযোগ ব্যবস্থাটা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। পূর্ববাংলার 'ভেনিস' বলে পরিচিত এ জেলায় এক ইঞ্চি পরিমাণ রেলওয়ে লাইন নাই। অবশ্য ফরিদপুর আর গোপালগঞ্জ মহকুমাতেও রেলওয়ে লাইনের নাম পর্যন্ত নাই। বরিশাল থেকে শুনেছি ছাত্ররা নাকি মাঝে মাঝে দল বেঁধে চাঁদপুরে ট্রেণ দেখার জন্য আসে। অবশ্য এতে লজ্জার কিই বা থাকতে পারে? এহেন বরিশাল জেলায় যখন প্রথম পদার্পণ করতে গেলাম, তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র এ জেলার আকাশ-বাতাস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলুষিত হয়ে গেছে।

এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য কে বা কারা দায়ী, সে বিতর্কমূলক প্রশ্নের অভ্যন্তরে না গিয়েও এটুকু বলা যায় যে, মোটামোটিভাবে

অর্থনৈতিক বৈষম্যই এর মূল কারণ। সামাজিক উঠা-বসা থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থানীয় অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত সরলমনা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকদের যুগের পর যুগ ধরে এমনভাবে বঞ্চনা করা হয়েছে যে, সামান্যতম ইন্ধনেই এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনার বিস্ফোরণ ঘটেছে। তবে একটা ব্যাপারে হত-বাক্, না হয়ে পারি না যে, যাঁরা এসময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের ইন্ধন জুগিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ শুধুমাত্র যে প্রগতিশীল ক্যাম্পের চৌহদ্দিতে রয়েছেন তাই-ই নয়, প্রগতিশীল সংশোধনবাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব-দান পর্যন্ত করছেন। আর যাঁরা মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, এদের মতে তাঁরাই হচ্ছেন প্রতিক্রিয়াশীল। সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এ দেশ!

একদিন শুনলাম এক মুসলমান জমিদার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমাল বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন দিতে বাধ্য হয়েছেন। মনটা গর্বে ভরে উঠলো, অজানা এ নিঃস্বার্থ মানব-প্রেমিকের কথা মনে করে। তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো। দিন কয়েক পরে জানতে পারলাম এ মুসলমান জমিদার হত্যার কাহিনী। আসলে নাকি এ জমিদারই ছিলেন তাঁর এলাকার সমাজ-বিরোধীদের নেতা। বহু কষ্টে জোগাড় করা অস্থাবর সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্নে একরাতে নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি হয়। উনি তখন উপায়ন্তর-বিহীন অবস্থায় একটা একনলা বন্দুক দিয়ে এককালীন সহকর্মী-দের তাড়িয়ে দেয়ার জন্য তাদের মাথার উপর দিয়ে শূন্যে গুলী করে বসেন। আর যায় কোথায়? রাতের ঘন অন্ধকারে কখন যে তাঁর এক সহকর্মী নিঃশব্দে যমদুতের মতো তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তা তিনি ঘূর্ণাক্ষরেও টের পান নি। পুলিশ যখন

তাঁর লাশ উদ্ধার করলো, তখন সেটাকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

জেলা প্রশাসনিক কতৃ'পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলেন। এমন সুযোগ আর নাও পাওয়া যেতে পারে। পাকিস্তানের সংবাদপত্রে তো বটেই, ভারতীয় সংবাদপত্রে পর্যন্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমাল রক্ষার জন্য মানব-প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত ঐ জমিদারের আত্মত্যাগের কাহিনী ফলাও করে বেরুলো। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল।

কলিকাতা আর জলপাইগুড়ির দাঙ্গা প্রশমিত হবার দিন দুয়েকের মধ্যে বরিশালের অবস্থা শান্ত আকার ধারণ করলো। এর মধ্যে মরহুম লিয়াকত আলী খান বরিশাল সফর করে গেছেন ও যোগেন মণ্ডল দেশত্যাগ করেছেন। আর বরিশালের উপদ্রুত অঞ্চলে সশস্ত্রবাহিনী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

এমনি সময়ে বরিশালের উদ্বাস্তু নিয়ে যাওয়ার জন্য কলিকাতা থেকে চারটা ষ্টিমার এসে হাজির হলো। আমরা এর নাম দিয়েছিলাম 'খয়রাতি জাহাজ' অর্থাৎ এসব ষ্টিমারে যে সব উদ্বাস্তু ওপারের হাতছানিতে চলে যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য কোন পয়সা লাগবে না।

সেদিনের কথা এখনও স্পষ্ট মনে রয়েছে। আমরা জনকয়েক বন্ধু মিলে অনেক আগেই গিয়ে ষ্টিমারঘাটে হাজির হলাম। চেয়ে দেখলাম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার নর-নারী তাঁদের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি আর যৌবনের লীলাক্ষেত্র পিছনে ফেলে এক অজানার আহ্বান সীমান্তের ওপারে পাড়ি জমাতে চলছেন। যত টুকু সম্ভব ততটুকু অস্থাবর সম্পত্তি এঁরা সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। এঁদের অধিকাংশই জানে না যে, ওপারে তাঁদের জন্য কী ধরনের সমাদর অপেক্ষা করছে। বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষের ভিটা-মাটি ছেড়ে এক মরীচিকার পিছনে ধেয়ে এঁরা ছিন্নমূলে পরিণত

হলো। এঁরাই পরবর্তীকালে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চালের শিকার হল।

শিয়ালদা থেকে শুরু করে পশ্চিম বাঙলার পথে প্রান্তরে যুগের পর যুগ ধরে এঁরা চৈত্রের ঝরা পাতার মতোই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর শেষ কোথায় কে জানে? এঁদের একদল বসতি স্থাপন করেছে কালোপানির দেশ আন্দামানে, আর একদল গিয়েছে মধ্য ভারতের অভিশপ্ত দণ্ডকারণ্যে। আর একদলকে পাঠানো হয়েছে রাজপুতনার ধুসর মরুভূমিতে। বছরের পর বছর ধরে অনিশ্চিত জীবনযাপন করতে গিয়ে এ সব ছিন্নমূল পরিবারের কত নারীকে যে সতীত্ব হারাতে হয়েছে, কত বৃদ্ধকে যে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়েছে, কত কিশোর যে শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কত শিক্ষিত যুবক বেকারত্বের অভিশাপে তিল তিল করে দগ্ধ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

হঠাৎ ষ্টীমারের হুইসেলের শব্দে খেয়াল করে দেখলাম যে, এক নম্বর খয়রাতি জাহাজটা লংগড় তুলতে শুরু করেছে। ষ্টীমারের চাকা দুটো প্রবলভাবে পানি কাটতে শুরু করলো। নদীর শান্ত পানির বুকে বিরাট তোলপাড় শুরু করে দিয়ে ষ্টীমারটা রওয়ানা হল। পানির তোলপাড়ের দিকে তাকিয়ে মনে হল, আমি যেন বাস্তুত্যাগীদের মনের গহনের তোলপাড়টাই দেখছি। হঠাৎ বিরাট জোরে সমস্বরে ষ্টীমারের লোকগুলো কেঁদে উঠলো। মা, মাগো'। সবাই অশ্রুসজল নয়নে নারিকেল গাছে ঘেরা নদীর পাড়টার দিকে তাকিয়ে রইলো। ধীরে ধীরে তাঁদের চোখের সামনে সব কিছুই ঝাপসা হয়ে উঠলো। ইতিহাসের পাতায় আমরা শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করলাম। এ জনাকীর্ণ বিশ্বে এ সব বাস্তহারার দল কোথায় যে হারিয়ে যাবে, তা কে বলতে পারে। কোন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় হয়ত দণ্ডকারণ্যের নিবিড় জঙ্গলের এক উদ্বাস্তু শিবিরের পর্ণকুটিরে কোন

বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা তার নাতি-নাতনীদের মায়ায় ঘেরা, ছায়ায় ঢাকা পূর্ব বাংলায় তাদের আদি জন্মভূমির গল্প করবে। নতুন বংশধরেরা রূপকথার মতই অবাক বিস্ময়ে সে গল্প শুনবে।

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে দাঙ্গাবিধ্বস্ত 'ধ্যরেনস' রেষ্টুরেণ্টে এসে বসলাম। বাহাউদ্দীন সাহেবই প্রথমে কথা বলতে শুরু করলেন। (বর্তমানে ইনি ঢাকায় পাসপোর্ট অফিসার হিসাবে কাজ করছেন)। এমন সময় আমাদের আর এক বন্ধু এসে একটা কথা বলবার জন্য আমাকে বাইরে নিয়ে গেল। হঠাৎ করে তিনি আমার কাছে পড়বার জন্য 'ছোটদের অর্থনীতি', 'ছোটদের রাজনীতি', 'মধ্যবিত্ত কোন পথে?' এসব বই চেয়ে বসলেন। আমি প্রথমে নিজের কানকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কেননা বন্ধুবর ছিলেন মুসলিম লীগের একজন পাণ্ডা গোছের লোক। আর তাঁর নেতা ও অন্যান্য সহকর্মীরা দাঙ্গার অভিযোগে কারাগারে রয়েছে। বন্ধুবর আর কোন রকম লুকোচুরি না করে পরিষ্কার বলেই বসলেন, 'জেলখানার ভিতর থেকে খবর এসেছে এসব বই পড়তে হবে।' বুঝলাম বন্ধুর নেতা আর সহকর্মীরা জেলখানায় কম্যুনিষ্ট বন্দীদের পাল্লায় পড়েছে আর তাঁরা এঁদের 'ব্রেণ-ওয়াশ' করে দিয়েছে। পরবর্তীকালে এঁরা সবাই প্রগতিশীল সংশোধনবাদ রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন।

দাঙ্গা প্রশমিত হবার সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই বরিশালে বসন্ত রোগের মহামারী দেখা দিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ধরনের মহামারী আর হয়নি বললেই চলে। স্কুল কলেজ, হাট-বাজার ও সিনেমা হল বন্ধ করার পরেও যখন দেখা গেল যে মহামারী বেড়েই চলছে তখন জেলা প্রশাসনিক কতৃ'পক্ষ শহরে ১৪৪ ধারা জারী করলেন। এতেও ফল না হওয়ায় 'কারফিউ' জারী করতে হলো। বরিশাল শহরে বসন্ত রোগে এতো লোক মারা যেতে লাগলো যে, শেষ পর্যন্ত কবর দেয়াই মুস্কিল হয়ে পড়লো।

আমাদের সবাইকে আব্বা বাসা থেকে বেরুনো বন্ধ করে দিলেন। কর্তৃপক্ষ রাস্তা দিয়ে লাশ নিয়ে যাবার সময় ঘণ্টা বাজাবার ব্যবস্থা করলেন। যাতে করে আশেপাশের লোকজন সব সাবধান হয়ে যায়।

সমগ্র বরিশাল শহরটাই একটা ভৌতিক শহরে পরিণত হলো। একদিন দুপুরে ঘণ্টার শব্দ শুনে আমাদের আলেকান্দার দোতালা বাসার জানালার একটা কপাট খুলে যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে বুকটা শিউরে উঠলো। একটা ঠেলাগাড়ীতে ৮।১০টা লাশ ত্রিপল দিয়ে ঢেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সামনে একজন আর পিছনে দু'জন ধাঙ্গর সমস্ত মুখে গালপাট্টা বেঁধে লাশগুলো ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আর একজন চৌকিদার লাঠির মাথায় রাখা ঘণ্টাটা ঠুং ঠুং করে বাজিয়ে হেঁটে চলেছে। পরে শুনেছি সব লাশ কবর দেয়া সম্ভব হয়নি। বিরাট এক গর্ত করে লাশগুলোকে কোনরকমে পোঁতা হয়েছে মাত্র। বেসরকারী হিসাবে শুধুমাত্র বরিশাল শহরেই এ মহামারীতে প্রায় কয়েক হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছিল। তাই ভাবী, কে জিতলো—দাঙ্গা না মহামারী?

আবার ঢাকায় ফিরে এলাম। কোন রকম বার্ষিক পরীক্ষা ছাড়াই দ্বিতীয় বর্ষ আইন ক্লাশে উত্তীর্ণ হলাম। খাতায় বহু ছাত্রের নাম থাকা সত্ত্বেও এক-দশমাংশ ছাত্রও ক্লাশে হাজির হয় কিনা সন্দেহ। অথচ 'প্রক্সির জোরে প্রায় সবাই ক্লাশে উপস্থিত চিহ্নিত হচ্ছেন। একজনের মুখে গল্প শুনলাম যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্লাশে তবুও তো ছাত্ররা 'প্রক্সি' দেয়; কলিকাতার রিপন ল' কলেজে নাকি সব মেসের ঠাকুর আর বাবুর্চিরা ক্লাস রুমের দরজায় এসে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকে আর ঠিক যার যার সাহেবের রোল নম্বর ডাকার সঙ্গে সঙ্গে 'ইয়েস স্যার' বলে বৈঠকখানায় বাজারে বাজার করতে চলে যায়!

লক্ষ্য করে দেখলাম, সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্রদের কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে বেশী অবহেলা করছেন। শুধুমাত্র আইন ক্লাশের ছাত্র হলে মুসলিম হল বা ফজলুল হক হলে সিট পাওয়া যাবে না। আইনের ছাত্রদের লাইব্রেরীর কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে না; কেননা ল' ডিপার্টমেন্টের কোন নিজস্ব লাইব্রেরী নাই। উপরন্তু আইন ক্লাশ শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীও বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি মধুর ষ্টলেও দু'রকম ব্যবস্থা। সারাদিন ধরে বাকী চলছে, কিন্তু ল' ক্লাশ শুরু হলেই বাকী বন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্রদের প্রতি ঐ ব্যবহারের দরুণ মনটা বিষিয়ে উঠলো। এ সময়ে এক বন্ধুর মুখে কবিতার দু'টো লাইন শুনলাম,

'যার নেই কোন গতি
সে করে ওকালতি।'

আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে এক সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নাম ছিল। কিন্তু বিভাগোত্তর যুগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার ছাত্র এসে হাজির হওয়ায় কর্তৃপক্ষ সমস্ত ছাত্রদের আবাসিক ব্যবস্থা করে তাদের পড়াশুনার দিকে সুষ্ঠুভাবে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হলেন। অথচ সাতচল্লিশ সালে আমাদের এক বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে তার প্রথম অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে এক চিঠিতে দিনাজপুরে আমাদের জানিয়েছিল যে, '—হলের অনেক ছেলেই শ্বশুরের টাকায় লেখাপড়া করছে। এঁরা রাজনীতির ধার ধারে না। হলের বাথরুমে গোছল করার পর পাজামা আর সার্ট পরে রুমে ফিরে আসতে হয়। ডাইনিং হলে লুংগি কিংবা গেঞ্জি পরে খেতে গেলে তার নামে পোষ্টার পড়ে। নারী হস্তাক্ষরের ঠিকানা লেখা চিঠি লেটার-বক্স থেকে প্রায় গায়েব হয়ে যায়। আর লাইব্রেরী ওয়ার্ক করতে গেলে এঁদের অনেকেই দুর্লভ বইয়ের পাতা কেটে নিয়ে

আসে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এঁরা আড্ডা দিতে জানে না, তবে অধ্যাপকের সঙ্গে উঠাবসা করতে খুবই পারদর্শী।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে দেখলাম, আমাদের বন্ধুবরের কয়েক বছর আগেকার কথাগুলো একেবারে নেহায়েত মিথ্যা ছিল না। কলিকাতা আর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এসে প্রথমে মধুর ষ্টল সরগরম করে তুললো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু আড্ডা মেরে রাজনীতি চর্চা করার মধ্যে একটা মাদকতা রয়েছে। তাই আড্ডার নেশায় যাকে একবার পেয়ে বসেছে, তাকে সময়মত সে বিশেষ জায়গাটাতেও আড্ডা দিতে আসতেই হবে। আড্ডার একটা অদৃশ্য টান রয়েছে। অবশ্য আজকাল তেমন আড্ডা আর চোখে পড়ে না। রেষ্টুরেণ্টে আড্ডা মারা একরকম বন্ধ হয়েছে বললেই চলে। কেননা মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য যে সব রেষ্টুরেণ্ট রয়েছে, সেগুলোতে গ্রাহকের চাপ এতো বেশী যে, এক কিংবা দু'রাউণ্ড চায়ের অর্ডার দিয়ে বেশীক্ষণ টেবিলে দখল করে আড্ডা মারা সম্ভব নয়। আর যে সব রেষ্টুরেণ্টে টেবিল খালিই থাকে, সেখানে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের ঢোকা সম্ভব নয়। কেননা এক টাকা চার আনা পট দামের চা খেয়ে প্রেমালাপ হতে পারে, আড্ডা হতে পারে না।

যা'হোক এর মধ্যে একদিন মধুর ষ্টলে গিয়ে শুনলাম যে, মুসলিম হলের ইলেকশন হচ্ছে। আলী আহাদ সাহেব আমাদের দলের চীপ হুইপ নির্বাচিত হলেন। জনাব আহাদ বর্তমানে জাতীয় প্রগতি লীগে রয়েছেন। অবশ্য ইনি বাহান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করে এক সময়ে নাম করেছিলেন। পরে ইনি কিছুদিন আওয়ামী লীগের সদস্যও ছিলেন। বিরোধী দলের চীফ হুইপ পদে নির্বাচিত হলেন জনাব এস. এম. আলী। জনাব আলী বর্তমানে ম্যানিলায় একটা দৈনিক পত্রিকার সম্পা-

দকের পদ অলঙ্কৃত করে রয়েছেন। বহু আলাপ-আলোচনার পর আমাদের দল থেকে আমার বড় ভাই মুস্তফা নুরুল ইসলামকে হলের সহ-সভাপতি পদে নমিনেশন দেয়া হলো। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ আর কিছু প্রগতিশীল ছাত্রের সমন্বয়ে আমাদের দল গঠন করা হলো। (ছাত্র ইউনিয়নের তখনও জন্ম হয়নি)। অবশ্য ফেডারেশন গোপনে আমাদের সমর্থন দিল। আর তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার সমর্থনকারী নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগেও ইসলামিক ব্রাদার হুড সমন্বয়ে এস. এম. আলীর দল গড়ে উঠলো। তমুদ্দিন মজলিস গোপনে এ দলকে সমর্থন জোগালো।

একদিন রাতে আমাদের নির্বাচনী অফিসের কোণায় দেখলাম একজন ছাত্র মাথা নীচু করে একমনে পোষ্টার লিখছেন। প্রথমে ব্যাপারটা অত লক্ষ্য করিনি। রাত দু'টোয় কিছু পোষ্টার লাগিয়ে আমরা ক' বন্ধু যখন নির্বাচনী অফিসে ফিরে এলাম তখনও দেখলাম ছেলেটার পোষ্টার লেখার বিরতি নেই। সে রাত্রে আমরা নির্বাচনী অফিসেই ঘুমালাম। সোবেহ ছাদেকের সময় দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম সারা রাত ধরে একনাগাড়ে পোষ্টার লিখে ছেলেটা চলে গেল। পরে জেনেছিলাম ছেলেটা আণ্ডার গ্রাজুয়েট রয়েছে। এর নাম সাদেক খান। কিছুদিন পর ভদ্রলোক পুলিশের হাতে ধরা পরে কারাযাপন করেন। বর্তমানে ইনি ঢাকার নিও সমাজ'এ উঠাবসা করছেন আর রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন।

মুসলিম হলের ইলেকশনে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো দলের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি হলো। চুক্তিতে স্থির করা হলো যে, ওরা আমাদের 'কম্যুনিষ্ট বলবে না আর আমরা ওদের নুরুল আমীনের 'দালাল' বলবো না। তখনকার দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাসার ছাত্রদেরও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আর এসব

ছাত্রদের (সম্ভবতঃ ১৩৭ জন) মুসলিম হলে ভোটাধিকার ছিল। তাই এসব ছাত্রদের ভোট আদায় করার জন্য আমরা আমাদের এক মওলবী মার্কা সমর্থককেও সহ-সভাপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য গোপন ঘ্যবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিলাম। ভদ্রলোকের কোন ক্যাবিনেট সদস্য নেই। শুধু উনি একাই সহ-সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আমরা জনাকয়েক মিলে চাঁদা করে উনার জন্য একটা মাইক ভাড়া করারও ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু এতো করেও বুঝি শেষ রক্ষা হল না।

নির্বাচনের দিন ভোট শুরু হবার পর হঠাৎ দেখলাম, একটা প্রচারপত্রে আমাদের কম্যুনিষ্ট আখ্যায়িত করে 'বিপ্লবী' মুস্তাফা নুরুল ইসলাম মন্ত্রিসভাকে ভোট দিয়ে হাজং কৃষকদের হত্যার জবাব দিন' বলে ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এ প্রচারপত্র যে বিরোধী পক্ষ থেকেই ছাপানো হয়েছে, তা আমরা পরিস্কার বুঝতে পারলাম। আর আমাদের নেতৃস্থানীয় ছাত্র নেতারা নির্বাচনে পরাজয় একরকম মেনে নিয়ে হতাশ হয়ে পড়লো। এমনি একটা অবস্থায় আমরা দিনাজপুর-বগুড়ার জনাচারেক ছেলে একটা শেষ প্রচেষ্টা নিলাম। দৌড়ে সেন্ট্রাল জেলের সামনে ক্যাপিটাল প্রেসে গিয়ে হাজির হলাম। বহু অনুনয় করে তিন লাইনের একটা ছোট্ট প্রচারপত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছাপাবার ব্যবস্থা করলাম। এতে ছাপা হলো,

'রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাই'
'আরবী হরফে বাংলা চাই'
'সৈয়দ মকসুদ আলী মন্ত্রিসভা জিন্দাবাদ'।

বেলা দেড়টা নাগাদ এ প্রচারপত্র আমরা ভোটারের মধ্যে বিলি করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ধন্বন্তরির মতো কাজ হলো। ছাত্র-সমাজ মকসুদ মন্ত্রিসভার 'আসল' রূপ দেখে ঘাবড়ে গেল। ঠিক এমনি সময় দল বেঁধে আদিবকামাল বিভাগের ছাত্ররা ভোট

দিতে এলো। আমাদের মাইক থেকে অবিরামভাবে 'মওলানা মুস্তাফা নুরুল ইসলামকে ভোট দিন' বলে চীৎকার শুরু হয়ে গেল। বিপক্ষের মাইক থেকে 'অজ্ঞাত' দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে সমানে গর্জন তুলতে থাকলো। নির্বাচনের ফল যখন বেরুলো, তখন আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। মুস্তাফা নুরুল ইসলাম মাত্র সাত ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছে।

আইন ক্লাশে লক্ষ্য করে দেখলাম যে, প্রায় ছাত্রই চাকুরী করছে আর তখনকার দিনে ঢাকায় গ্রাজুয়েটের পক্ষে চাকুরী পাওয়াটা খুবই সোজা ছিল। তাই একদিন এ. জি. ই. পি. অফিসে গিয়ে চাকুরীর জন্য ইণ্টারভিউ দিলাম। দিন দশেকের মধ্যেই একটা আপার ডিভিশন কেরাণীর চাকুরী পেলাম। মাইনে একশ' পয়ত্রিশ টাকা। চাকুরী পাওয়ার খবর আব্বার কাছে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে আব্বা আমাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। আর আমি এগারো নম্বর জয়নাগ রোডের ইকবাল হল থেকে ব্যারাক ইকবাল হলে উঠে এলাম। ব্যারাক ইকবাল হলের সুবিধা ছিল এই যে, এখানে সিটরেণ্ট দেয়ার কোন বালাই ছিল না। দিনকাল ভালই কাটছিল। অফিসে হাজিরা দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক থাকতে হ'ত আর তারপর চলে আসতাম নিরবিচ্ছিন্ন আড্ডা মারার জন্য মধুর ষ্টলে। এই মধুর ষ্টলেই হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে একদিন আলাপ হলো। ভদ্রলোক তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু আমি নিজ চোখে উনাকে কোনদিন ক্লাশে যেতে দেখেছি কিনা সন্দেহ। জীবনে যত আড্ডাবাজের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তার মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমান অন্যতম। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ল' ক্লাশ করার নামে যখন মধুর ষ্টলে এসে হাজির হতাম, তখন দেখতাম মধু সন্ধ্যা আরতি করেই বাকি খাতা বের করে সমস্তদিনের বাকীর হিসাব লিখতে বসে চীৎকার করে জিজ্ঞেস করছে,

“আরে ওই বলাই, আজগে হাছন সাবে আইছিলো? বলাই-এর তরফ থেকে উত্তর এলো, হ ‘একবার যেমন দেখছিলাম।’ আর অমনি মধুবাবু তার বাকীর খাতায় হাসান সাহেবের নামে লিখে রাখলেন সোয়া দু’টাকা। একদিন মধুকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম! মধু নির্বিকারভাবে যা’ বললো তাতে হতভম্ব হয়ে গেলাম—‘দেখেন মুকুলদা, কেডা আইলে কত খায়, তা আমাগো জানা আছে। ধরেন যে রহমান সাবে আইলে চার আনার বেশী খাইব না; আর হাসান সাবে আইলে লগে কমপক্ষে এক-হালি লোক থাকবো। হের লাইগাই তো সোয়া দুই টাকা লিখ্‌খা রাখলাম।’ মধুর ষ্টলে বাকী খাওয়ার একটা অদৃশ্য মোহ রয়েছে। এর মায়াডোরে যে একবার বাঁধা পড়েছে, তার সহজে নিস্তার নেই। কেননা, মধুর স্থির বিশ্বাস যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা উচ্চশিক্ষার জন্য আসে, তারা সবাই ভবিষ্যতে সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে। এতে মধুর দু’ তরফা লাভ। এক তরফা হচ্ছে বাকীর খাতায় যা লেখা আছে, তা স্বাভাবিকভাবেই ‘যৎ-কিঞ্চিৎ’ বেশী করেই লেখা আছে। তাই ছাত্র থাকা অবস্থাতেই মধুর আসল পয়সা আদায় করে নেয়। আর উপরিটুকু চাকুরী পাবার পর আদায় করে। অবশ্য এরকম ছাত্রের সঙ্গেও মধুর বাকীর কারবার হয়েছে, যারা তাকে আসল পয়সাই দেয়নি। এদের নাম মধুর একেবারে মুখস্থ রয়েছে। কেউ জিজ্ঞেস করলেই হুড়হুড় করে নামগুলো বলে যায়।

ছাত্র-জীবন শেষ করবার পর আমি তখন বিয়ে করে ঢাকার দৈনিক ইত্তেফাকে চাকুরী করছি। এমনি সময়ে একদিন মধু আমার বাসায় এসে হাজির হলো। এ-কথা সে-কথার পর সরাসরি আমার নববধুকে বললো, ‘বৌদি, মুকুলদার কাছে ক’টা টাকা পাইতাম যে।’ আমার জীবনসঙ্গিনীর কাছে আগেই মধুর গল্প করেছিলাম। তাই তিনি কিছুমাত্র বিস্মিত না হয়ে

টাকার পরিমাণটা জিজ্ঞেস করে হিসেব মিটিয়ে দিলেন। তবে প্রাপ্তি স্বীকার একটা রসিদ লিখিয়ে নিলেন—'মুকুলদার কাছ থেকে বাকীর টাকা সব বুঝে পেলাম।' এর প্রায় বছর পাঁচেক পর হঠাৎ একদিন প্রেস ক্লাবে মধুর সঙ্গে দেখা। কেন্দ্রীয় সরকারের চলচ্চিত্র দপ্তরের জনৈক বাঙালী অফিসার কার্যোপলক্ষে ঢাকায় এসেছেন। মধু সে ভদ্রলোককে পাওনার তাগাদা দেয়ার জন্ত প্রেস ক্লাবে গিয়ে হাজির হয়েছে। ক্লাবে ঢুকতেই আমার সঙ্গে দেখা। সেই চিরপরিচিত অমায়িক হাসি দিয়ে মধু আমাকে একপাশে ডেকে মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "মুকুলদা, আপনার কাছে যেন ক'টা টাকা 'রইয়া গেছে।' আমি বুঝলাম মধু অন্ধকারে ঢিল মারছে। আমি শুধু মধুকে সেই রসিদটার কথা মনে করিয়ে দিলাম। মধু তার ফোকলা দাঁত বের করে হেসে আমার হাত দুটো চেপে ধরলো।

মধুর কথা লিখতে গিয়ে ব্যারাক ইকবাল হলের ক্যান্টিনের মালিক মুন্সীর কথা না লিখলে আমার এ কাহিনীটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মুন্সীর দোকানে 'মেনু' ছিল পরোটা হালুয়া আর পরোটা-ডিম। রোজ বেলা সাড়ে ন'টা দশটায় দেখতাম একজন মনিঅর্ডার পিয়ন মুন্সীর দোকানে বসে আরামসে পরোটা-হালুয়া খাচ্ছে। কিন্তু কোনদিনই মনিঅর্ডার পিয়নটাকে পয়সা দিতে দেখতাম না। প্রথম প্রথম ভাবতাম বোধহয় মাসকাবারী পয়সা দেয়। পরে বুঝলাম মুন্সীই আদর করে পিওনটাকে পরোটা-হালুয়া খাওয়ায়। কেননা, যে সব ছেলের নামে মনিঅর্ডার আসতো, পিওন সাহেব রোজ মুন্সীকে সে সব ছেলের নাম আর রুম নম্বর দিয়ে যেতো। মুন্সীও বাকীর খাতা বগলে করে পিওনের পিছনে পিছনে টাকা পাওয়া ছেলেদের রুমে গিয়ে হাজির হতো। এরকম এক অদ্ভুত ব্যবস্থায় মুন্সী বাকীর টাকা আদায় করতো। কিন্তু আমাদের মতো কিছু ছাত্র ছিল, যাদের

বাড়ী থেকে মনিঅর্ডার আসার বালাই ছিল না। তাই আমাদের সম্বন্ধে মুন্সী খুবই হুশিয়ার ছিল। অবশ্য এতো হুশিয়ার থাকা সত্ত্বেও বাকীর খাতায় আমাদের নামের পাশের অঙ্ক বড় হয়েই চললো।

দোকানে কীভাবে বাকী করতে হয়, আর কোন ধরনের দোকানে বাকী করতে হয়, এসব ব্যাপারে আমাদের যিনি মন্ত্রণা দিতেন তিনি হচ্ছেন তাসিকুল আলম। ভদ্রলোকের চেহারা খুবই গম্ভীর ধরনের ছিল। তাঁর প্রথম 'ছবক' ছিল, বড় রাস্তা আর যেসব রাস্তা দিয়ে রোজ যাতায়াত করতে হয়, সে সব রাস্তার কোন দোকানে বাকী করতে নেই। এ সব রাস্তার দোকানে বাকী করলে জীবনটা তাগাদার ঠেলায় অস্থির হয়ে যাবে।' তাসিকুল সাহেবের দ্বিতীয় ছবক' হচ্ছে, 'ঢাকা শহরের জিওগ্রাফী মুখস্ত রাখতে হবে। কেননা ঢাকা শহরটাই হচ্ছে বাহান্ন বাজার আর তিপ্পান্ন গলির শহর। তাই শহরের গলি-ঘুঁজি মুখস্থ থাকলে পাওনাদারদের সাথে দেখা হলেও কেটে পড়ার সুবিধা থাকে।'

এহেন তাসিকুল সাহেব একদিন মুন্সীর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। নগদ দশটা টাকা দিয়ে একটা 'বয়কে' এক প্যাকেট ক্যাপষ্টান সিগারেট আনতে পাঠিয়েছেন। সিগারেটের দোকানটা ছিল মুন্সীর রেষ্টুরেন্টের হাত কয়েক দূরে। কিন্তু তখন ছিল ভর দুপুর; চারদিকে চৈত্রের রোদ খাঁ খাঁ করছে। আর এ ভর দুপুরে মুন্সীর দোকান সাধারণত বন্ধই থাকে। তাই তাসিকুল সাহেব নিশ্চিন্ত মনে 'বয়কে' দিয়ে বহু কষ্টে সংগ্রহ করা দশ টাকার নোট ভাঙ্গিয়ে সিগারেট আনতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সেদিন বোধহয় তাসিকুল সাহেবের কপালটা একটু খারাপ ছিল বলতে হয়। কেননা, এ ভর দুপুরে আমাদের মুন্সী সাহেব একটা ভাঙ্গা আয়না নিয়ে দোকানের দুটো পাল্লা খুলে যে 'সন'

দিয়ে দাড়ি তুলছিলেন আর আড়চোখে মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিলেন, সেটা তো আর তাসিকুল সাহেবের জানা ছিল না। হঠাৎ মুন্সীর গলার আওয়াজ শোনা গেল।

‘এই কদ্দ্চ্যা, কার লোট লইয়া সিগারেট আনতে যাইতাছস রে ?’

‘মুন্সী সাব নি!……নম্বরের তাসিক সাবের সিগারেট আনতে যাইতেছি।’

‘কী কইলি ? তাসিক সাবের সিগারেট আনধার জন্য দশ টাকার লোট লইয়া যাইতাছস ? কুদ্দ্চ্যা, এদিক হুইন্যা যা দেহি। আমরা কাছেই ভাংতি আছে।’

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কুদ্দ্চ্যার খালি হাতে প্রত্যাবর্তন এবং একটা স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে ও লুংগি পরিহিত অবস্থায় তাসিক সাহেবের হন্ত-দন্ত হয়ে মুন্সীর দোকানে আগমন। এরপর কথোপকথনটা নিম্নরূপ :

‘আরে মুন্সী, ব্যাপার কী ?’

‘ঘ্যাপার কিছুই না। আপনার নামে বাকী হইছে বাহান্ন টাকা ছয় আনা। আজ উশুল দিলেন দশ টাকা। তা’ হইলে আপনার কাছে পাওনা রইল ঘিয়াল্লিশ টাকা ছয় আনা।’

মুন্সী তুমি একটা ঘোকাই। তোমারে কইছি না আজই বিকালে অফিসে মাইনা পামু। আর মাইনে পাইলেই এবারে তোমারে দিমু পঞ্চাশ টাকা। অখন এ দশটা টাকা ফেরত দেওঁ দেখি।’

‘ঠিক আছে, তা’ হইলে বিকালে আর চল্লিশ টাকা দিয়েন।’

‘মুন্সী, তা হইলে তো আর আমি অফিসেই যাইতে পারমু না। এ্যার থাইকা এক কাম কর’

‘কাম তো যা করার কইরাই দিলাম।’

‘একটু মন দিয়া আমার কথাটা হোনই না ? তোমারে কসম

কইরা কইতেছি, এখন যদি হেই দশ টাকা আমারে ফেরত দাও তা হইলে ঐ দশ টাকা উশুল লইয়া খুশী থাকো। খাওয়া তো এমনেই বন্ধ কইরা দিছো।'

এরপর মুন্সী খানিকক্ষণ নিশ্চুপ থাকলো। তারপর আয়নাটা একপাশে সরিয়ে রেখে বললো, 'আচ্ছা আপনার কথাই রাখলাম। টাকা দশটা ফেরতই দিলাম। কিন্তু বিকালের মধ্যেই পঞ্চাশটা টাকা চাই।'

তাসিক সাহেবের মুখের কোণে একটা মুচকী হাসির রেখা ফুটে উঠলো ?

ইকবাল হলের কথা বলতে হলে অনেক কথাই বলতে হয়। আজ যেখানে পুকুরের ওপাশটায় বিরাট প্রাসাদসম ত্রিতল ইকবাল হল শোভা বর্ধন করছে, আমাদের সময় সেখানটা ব্যারাক ইকবাল হলের শেষ সীমা ছিল। আর এই শেষ সীমার পরই জঙ্গলে ও আগাছায় ভরপুর ছিল। আসল ইকবাল হল পুকুরের এপাশটায় ছিল। তবে ছাত্ররা আবার নিজেরাই ব্যারাক ইকবাল হলকে নিজেদের ইচ্ছায় দু'ভাগ করে এক ভাগের নাম বেসরকারী ভাবে স্যার এ. রহমান হল নাম দিয়েছিল। তবে মোটামুটি ভাবে এখানে বসবাসকারী অনেকেই সিট-রেন্ট দিতো না, তা বলাই বাহুল্য।

আজকের দিনে বকশী বাজারের যেখানটায় কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের উচ্চ' সেকশনের ক্লাশ হচ্ছে, সেখানটায় এক সময় ইডেন কলেজের ছাত্রী-নিবাস ছিল। তারও আগে অর্থাৎ পাকিস্তান কায়েম হবার পর এখানে ২নং ইকবাল হল ছিল। ১নং ইকবাল হল ছিল ১১নং জয়নাগ রোডে।

এ সময়টা ছিল 'জোর যার মুলুক তার' অবস্থার মতো। রাজনীতি করতে গিয়ে ছাত্র জীবনে অনেক ক'টা বছর নষ্ট করেছে (কলিকাতা থেকে আগত), ঐ ধরনের কিছু সংখ্যক ছাত্র বক্‌শী-

বাজারে পাশাপাশি দুটো দোতলা বাড়ী দখল করে কর্তৃপক্ষের কাছে ইকবাল হল হিসেবে স্বীকৃত আদায় করে নিয়েছিল। এক দিন হঠাৎ করে ইডেন গার্ল'স কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষা ১১নং জয়নাগ রোডের ইকবাল হলে গিয়ে হাজির হলেন। কেননা, দুটো ইকবাল হলের মধ্যে এটাতেই হোমড়া-চোমড়া তৎকালীন ছাত্র নেতাদের বাস ছিল। এদের মধ্যে মেসার্স শাহ আজিজুর রহমান, দবিরুল ইসলাম (মরহুম) সাইদুর রহমান, আহম্মদ সোবহান (এ্যাডভোকেট), মোহাম্মদ ইমাদুল্লাহ (মরহুম) অন্যতম। অধ্যক্ষা সাহেবা সরকারী মহলে দহুদেন-দরবার করে বিফল হয়ে শেষ পর্যন্ত এঁদের দরবারে এসে হাজির হলেন। তিনি বিনীতভাবে এঁদের দরবারে আর্জি পেশ করে বললেন, 'আপনারা থাকবেন দোতালা বাড়ীতে, আর আপনাদের বোনেরা কলেজে পড়তে এসে সমস্ত ঢাকা শহরে মাথা গুঁজবার ঠাঁই করতে না পেরে হয় লেখাপড়া বন্ধ করে দেবে, নয় গাছতলায় আশ্রয় নিবে?'

ছাত্র নেতৃবৃন্দ একবাক্যে বললেন, 'তা তো ঠিক কথাই। এখন এর কোন সুরাহা চিন্তা করেছেন কী!' অধ্যক্ষা মহোদয়া অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, 'মুসলিম হলটার পাশটায় গোটা বিশেক ব্যারাক রয়েছে, কলেজে পড়া মেয়েদের পক্ষে ওখানে বেআব্রুর জন্য থাকা সম্ভব নয়। তাই আপনারা যদি বোনদের লেখাপড়া আর আব্রুর প্রতি লক্ষ্য রেখে একটা ইকবাল হল ছেড়ে দিতেন, তা' হলেই শুধু সমস্যার সমাধান হতে পারে।'

ছাত্র নেতৃবৃন্দরা নিজেদের মধ্যে দু'চার মিনিট আলাপ করে অধ্যক্ষা মহোদয়াকে বললেন, 'আপনি ২নং ইকবাল হল খালি করে ইডেন কলেজের ছাত্রীনিবাসে পরিণত করাবার অর্ডার করিয়ে নেন, বাকীটা আমরা দেখবো'।

দিন কয়েকের মধ্যেই পর্দার অন্তরালে সব ঘটনা ঘটে গেল।

২নং ইকবাল হলের ছাত্রদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই কর্তৃপক্ষের নির্দেশ এসে হাজির হলো। সবাই দৌড়ে ১নং ইকবাল হলে ছাত্র নেতৃবৃন্দের কাছে আসতে লাগলেন। কিন্তু নেতৃবৃন্দ পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন যে, কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে আলাপ করেই নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যারাকে অনেক বেশী ছাত্রের জায়গা হওয়া ছাড়াও ইডেন কলেজের মেয়েদের একটা ছাত্রী-নিবাসেরও ব্যবস্থা হবে। তাই এ ব্যাপারে সম্মতিদান করা হয়েছে। এটাই হচ্ছে ব্যারাক ইকবাল হল আর ইডেন ছাত্রী-নিবাসের গোড়ার কথা। পরবর্তীকালে ইকবাল হল আর ইডেন ছাত্রী-নিবাস ছুটোই তাদের নয়াভবনে স্থনান্তরিত হয়েছে।

আজকের দিনে সমগ্র বক্‌শীবাজার এলাকাটাকেই একটা ছাত্র শহর হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। অথচ আজকের দিনে যাঁরা হলে বাস করছেন, তাঁরা কী একমুহূর্তের জন্য চিন্তা করে দেখেছেন যে তাঁদের পূর্বসূরীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকায় এসে কী দুর্বিষহ কষ্টই না ভোগ করেছেন। মাঘের তুহিন শীতের হিমেল হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শুধু ব্যারাক ইকবাল হলই নয়, শহীদ মিনারের পিছনে অবস্থিত ব্যারাক মেডিক্যাল হোষ্টেলের ছাত্ররাও পুরানো ন্যাকড়া দিয়ে ভাঙ্গা ভেড়ার ছিদ্র বন্ধ করার কতই না প্রচেষ্টা করেছেন। তবুও তাঁরা অধ্যয়ন করে গেছেন, তবুও তাঁরা সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

হল আর হোষ্টেলের প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে কলিকাতার কারমাইকেল হোষ্টেলের কথা না লিখলে আমার ঐ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আজ থেকে আঠারো বছর আগের কথা। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর পুলিশের ধাওয়া খেয়ে ভারতের আসাম ও বিহার রাজ্য ঘুরে শেষ পর্যন্ত একদিন কলিকাতায় এসে হাজির হলাম।

তখনও পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়নি। কলিকাতায় এসে কারমাইকেল হোষ্টেলে আমার পরিচিত গোলামদা অর্থাৎ গোলাম রহমানের কাছে আশ্রয় নিলাম। পাকিস্তান অর্জনের পর পরই উত্তরবঙ্গে যে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল এই গোলাম রহমানই ছিলেন তার হোতা। শেষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রহমান সাহেবকে 'রাসটিকেট' করা হয়। বহু দেন-দরবার করে এ নির্দেশ প্রত্যাহার করানো হয়, আর গোলামদা কলিকাতায় পাড়ি জমান।

আমি যখন কারমাইকেল হোষ্টেলে গোলামদার আশ্রয় নিলাম, তখন তিনি মির্জাপুর স্কুলে মাষ্টারী করছেন, আর আইন পড়াশুনা করছেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর গোলামদা দিনাজপুরে এসে ওকালতি পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে ইনি পরোক্ষভাবে সব সময়েই যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

যাহোক, কারমাইকেল হোষ্টেলে থাকার সময়েই কর্তৃপক্ষের এক নির্দেশের ফলে সমগ্র হোষ্টেলে বিষাদের ছায়া নেমে এলো। কেননা, নির্দেশনামায় বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র মুসলমান ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট কারমাইকেল হোষ্টেলকে সার্বজনীন হোষ্টেলে পরিণত করা হবে। এর অর্থই হচ্ছে মুসলমান ছাত্রদের তাদের প্রাণপ্রিয় কারমাইকেল হোষ্টেল ছেড়ে চলে যেতে হবে। দিন কয়েকের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ নারিকেলডাঙ্গায় একটা জীর্ণ দোতলা বাড়ী মুসলমান ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। আর বাইরে থেকে আগত হিন্দু ছেলেরা প্রায় প্রতিদিনই বিকেলে কারমাইকেল হোষ্টেল দেখে যেতে লাগলো। এছাড়া বিকেলে পটলডাঙ্গার ছেলেরা এসে একরকম জোর করেই দুর্গের মতো সুরক্ষিত কারমাইকেলের প্রাঙ্গনে ফুটবল খেলতে শুরু করলো।

এহেন এক পরিস্থিতিতে মুসলমান ছাত্ররা রোজ রাতে বৈঠকে মিলিত হয়ে শলাপরামর্শ করতে লাগলো। প্রথমে আবেদন করা হলো তৎকালীন সংখ্যালঘু মন্ত্রী সি. সি. বিশ্বাসের কাছে। শ্রীবিশ্বাস এক সময় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি অমায়িক ব্যবহারের জন্য অনেকেরই হৃদয় জয় করেছিলেন। সি. সি. বিশ্বাস সরজমিনে তদন্ত করতে এসে কারমাইকেল হোষ্টেলের মুসলমান ছাত্রদের প্রতি খুব সহানুভূতি প্রদর্শন করলেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না। কেননা সমস্ত বিষয়টাই নাকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মানেই হচ্ছে হিন্দু মহাসভা। তাই আমরা সংখ্যালঘু মন্ত্রীর কাছে বিফল হয়ে ভারতের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদের কাছে এক তারবার্তা পাঠালাম। কেননা আমরা ঠিক করলাম যে, কারমাইকেল হোষ্টেল যখন ছেড়েই দিতে হবে, তখন একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলে দোষ কী! মওলানা আজাদ কোন রকম ঝামেলায় না গিয়ে সেই তারবার্তা পশ্চিম বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে আমরা উপায়ান্তরবিহীন অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের সাক্ষাতপ্রার্থী হয়ে চিঠি দিলাম। ডাঃ রায় দিনক্ষণ ঠিক করে আমাদের এক প্রতিনিধি দলকে ডেকে পাঠালেন। ঘটনা শোনবার পর ডাঃ রায় একটা প্রচণ্ড চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'যাও না যাও না, তোমাদের গার্জিয়ান মওলানা আজাদের কাছে যাও। আমি তো তোমাদের কেউই না? আমার কাছে এসেছো কেন? ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে তো ঘাস খাওয়া বহুদিন আগেই শিখেছো।'

আমাদের প্রতিনিধি দল মুখ কালো করে ফিরে এসে সমস্ত সাক্ষাৎকার বর্ণনা করলেন। সেদিন রাতেই আবার দ্বিতীয় দফা

বৈঠক হলো। এবারকার বৈঠকে ঠিক হলো যে, শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর শরণাপন্ন হতে হবে। অবশ্য আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ সমস্যার সমাধান হওয়া আর সম্ভব নয়। তবুও নিজেদের মনকে প্রবোধ দেয়ার জন্য শেষ প্রচেষ্টা করতেই হবে। পরদিন সকালে একটা বিরাট টেলিগ্রামে সব কিছু উল্লেখ করে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর কাছে পাঠানো হলো। আমাদের সবাইকে হতবাক্ করে দিয়ে সন্ধ্যার সময় দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রীর টেলিগ্রাম এসে হাজির, সামনের সপ্তাহে শ্রীনেহরু স্বয়ং কলকাতা সফরে আসছেন। এ সময় কারমাইকেল হোষ্টেলের মুসলমান ছাত্রদের তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দলকে দশ মিনিটের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

এর পর দুই-তিনদিন ধরে হোষ্টেলে আমাদের উপর্যুপরি বৈঠক বসলো। এসব বৈঠকে তিনজন সদস্য মনোনীত করা হলো আর মুসলমান ছাত্রদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হলো।

সেদিন ছিল শুক্রবার। আমাদের শুভেচ্ছা আর উপদেশ নিয়ে প্রতিনিধি দল গভর্ণর ভবনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গমন করলেন। এদিকে আমরা সাক্ষাতের ফলাফল জানবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে প্রতিনিধি দল কারমাইকেল হোষ্টেলে ফিরে এলেন। এঁরা যা বললেন তার অর্থ দাঁড়ায় যে, প্রথমে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের বক্তব্য শুনে তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারীকে সব নোট করতে বললেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের অবস্থা জানবার জন্য অবিরাম হিন্দীতে প্রতিনিধি দলকে প্রশ্ন করে এর পর সাক্ষাতের শেষ পর্যায়ে বললেন, 'ঠিক হ্যায়, ম্যায় দেখুংগা তুমলোককো লিয়ে ক্যা্যা কর সিকতা হু।'

আমরা এ সাক্ষাতের ফলাফল শুভ হয়েছে কিনা কিছুই বুঝতে পারলাম না। অথচ আর মাত্র দিন সাতেকের মধ্যেই আমাদের কারমাইকেল হোষ্টেল চিরদিনের জন্য ছেড়ে যেতে হবে। উপায়ান্তরবিহীন অবস্থায় আমরা সব বিছানাপত্র বাঁধতে শুরু করলাম। এমন কী, আমাদের জনাকয়েক তো নারিকেল-ডাঙ্গায় গিয়ে বরাদ্দকৃত দোতলা বাড়ীর কোন কোন দরজায় চক দিয়ে নিজেদের নাম পর্যন্ত লিখে আসলেন।

এহেন এক অবস্থায় একদিন সকালে দিল্লী থেকে কারমাইকেল হোস্টেলে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির হলো, টেলিগ্রামের মর্মার্থ হচ্ছে—'কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতার বৈঠকখানা রোডের কারমাইকেল হোস্টেল ভবন রিক্যুইজিশন করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ করেছে।'

আজ আঠারো বছর পরে এখনও যখন অতীতের দিনগুলোর কথা মনে করি তখন পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর এ সিদ্ধান্তের কথা মনে করে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। মনে হয় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবতার প্রতি মমত্ববোধের ফলেই শ্রীনেহরু সাফল্যের চরম শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৫১ সালের মাঝামাঝি সময়ে ব্যারাক ইকবাল হলে এসে আস্তানা গাড়লাম। তখন আমি এ. জি. ই. বি. অফিস থেকে সিভিল সাপ্লাই একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে বদলী হয়েছি। দিনের বেলা ঘন্টা তিনেকের জন্য অফিসে হাজির থাকতে হয়, আর সন্ধ্যার পর আইন ক্লাশ করতে হয়। এ-ছাড়া বাকী সময় আড্ডা মেরে কাটাতে হয়। দিনকাল ভালই যাচ্ছিল। কিন্তু তবুও মনে হতো আমি যেন দিন দিন অকর্মণ্য হয়ে পড়ছি। এ রকম রুটিন বাঁধা জীবন আমার কাছে বড্ড একঘেয়ে মনে হতে লাগলো। মাস কয়েকের মধ্যে দুর্নীতি দমন বিভাগে একটা চাকুরী পেলাম। আজকের দিনে বায়তুল মোকাররমের পিছনে

যে লাল দালানটায় ইসলামিক একাডেমী রয়েছে, তখনকার দিনে এ দালানটার নাম ছিল বিধবা আশ্রম'। আর এ 'বিধবা আশ্রমেই ছিল পুলিশের দুর্নীতি দমন বিভাগ ও 'ফিংগার প্রিন্ট ব্যুরো'।

দুর্নীতি দমন বিভাগে আমার কাজটা ছিল একটু অদ্ভুত ধরনের। স্বনামে আর বেনামে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকার দুর্নীতি সম্পর্কে আগত প্রতিটি নালিশ আমাকে সবচেয়ে প্রথমে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়তে হতো। এর পর যে-সব নালিশ সম্পর্কে তদন্ত শুরু করা নিতান্তই অপরিহার্য তার প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করতে হতো। প্রতিদিনই বহুসংখ্যক চিঠিপত্র আমার হাতে এসে পৌঁছাতো।

এ সব চিঠির অধিকাংশই ছিল মফঃস্বল অঞ্চলে কার্যরত অফিসারদের বিরুদ্ধে। ঘুষ ছাড়াও অনেক চিঠিতেই অফিসার-দের বিরুদ্ধে নারীঘটিত দুর্নীতির অভিযোগ থাকতো। এমন কী, কোন কোন অফিসারের পারিবারিক দুর্নীতি সম্পর্কেও নালিশ এসে হাজির হতে লাগলো। আমি অফিসে গিয়ে তন্ময় হয়ে এ সব চিঠি পড়তাম আর স্বাধীনতাত্তোর যুগের নব্য সমাজের একটা বাস্তবচিত্র আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠতো।

আজ প্রায় বিশ বছর পরে সেদিনকার সেই নব্য সমাজের প্রকট রূপ নগ্নভাবেই ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনার ক্লাব আর হোটেল-রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়াতে দেখতে পাচ্ছি। এরা প্রাচুর্যের অহ-মিকায় সমাজের সব রকম শাসনকেই সরাসরিভাবে উপেক্ষা করে চলেছে।

সম্প্রতি ঢাকার সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেলে একটা সান্ধ্য-পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়ে সস্ত্রীক গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। সুইমিং পুলের ধারে চাঁদনী রাতে এ পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল।

পার্টিতে অফিসার থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী পর্যন্ত, আর শিল্পপতি থেকে শুরু করে সাংধাদিক পর্যন্ত নধ্য সমাজের প্রায় সমস্ত পেশার লোককেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। একটা বিশিষ্ট পাকিস্তানী কোম্পানীর নতুন মডেলের মোটরগাড়ী প্রবর্তনের উপলক্ষ্যেই এ সান্ধ্য সুরা-পার্টির ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় তিনশ' লোকের এ পার্টিতে আমরা যখন গিয়ে হাজির হলাম, তখন পার্টির একেবারে জমজমাট অবস্থা। সুইমিং পুলের চার কোণে চারটা অস্থায়ী 'বারের ব্যধস্থা করা হয়েছে আর আমন্ত্রিত অতিথিরা এসব 'বার' থেকে বেসুমার সুরা পান করতে শুরু করেছেন। অন্যদিকে পরিধেয় বস্ত্রে কৃচ্ছসাধনে নিপুণা সুন্দরী মহিলারা দল বেঁধে নতুন মডেলের গাড়ীতে নানান ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আর বসে ফটো উঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এর মধ্যে আবার হোটেলের নৈশ ক্লাবের তিনজন বিদেশী নর্তকী মিনি স্কার্ট পরে পার্টির অতিথিদের মাঝ দিয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলো। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এরা তিনজন নতুন মডেলের একটা গাড়ীর 'হুড'-এর উপর তাদের জঙ্ঘাদেশ প্রদর্শন করে বসে পড়লো আর তির্যকভাবে এদের উপর ফ্লাড লাইট ঝলমল করে উঠলো। আমরা দু'জনে হতভম্বের মতো এক কোণায় দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলাম।

গরমের দিন বলেই আমি পাঞ্জাবী-পাজামা পরে গিয়েছিলাম। কিন্তু পার্টিতে ঢুকেই বুঝলাম এই পোষাকের জন্য আমরা দু'জন একঘরে হয়ে পড়েছি। এমন সময় আমার এক সাংবাদিক বন্ধু আমাকে হরহর করে টেনে সুইমিং পুলের ও-পাশের লনে নিয়ে গেল। আমরা দু'জনে দুটো চেয়ার দখল করে বসলাম। রাত সাড়ে আটটার মধ্যেই ধিদেশী অতিথিরা বিদায়পর্ব সমাধা করে ঘরের পানে ফিরে গেল। ধাকী যাঁরা গেলেন তাঁদের মধ্যে জনাকয়েক অবাঙালী ছাড়া সধাই

বঙ্গভাষী।

এবার শুরু হলো পার্টির দ্বিতীয় পর্যায়। আমার সাংবাদিক বন্ধুটি আমাদের জন্য দু'-গ্লাস 'সেভেন আপ' নিয়ে এলেন। আমি উঠে গিয়ে কিছু স্ন্যাকস নিয়ে আসতে গেলাম। কিন্তু হতবাক হয়ে গেলাম আমাদের বহু দিনের পরিচিত এক বাঙালী মহিলাকে সুরা পান করতে দেখে। মনে পড়লো বছর সতেরো আগে মফঃস্বল এক জেলা শহরে এ মহিলার জন্মদাতাকে কেরাণীগিরির চাকুরী করে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে সংসার চালাতে দেখেছি। আর এর পতিদেবতা তখন টিউশনী করে খরচা চালাতেন। কিন্তু মাত্র সতেরো বছরের মধ্যে এঁদের কী অদ্ভুত পরিবর্তনই না হয়েছে? মহিলাটি তাঁর ভ্রূযুগল কামিয়ে নকল ভ্রূ তৈরী করেছেন, পরচুলার বদৌলতে কেশদামের অপূর্ব কবরী রচনা করেছেন আর পাশ্চাত্য সভ্যতার আবিষ্কারের সাহায্যে দেহের স্থানবিশেষকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। শুধু কী তাই? সুরা পানরতা অবস্থায় মহিলাটি এমন ভঙীমায় কথা বলে চলেছেন তাতে মনে হচ্ছিলো, উনি বোধহয় সবেমাত্র কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম, আমাদের পরিচিত এক বাঙালী দম্পুতি ছাড়াও আরও এক দল বাঙালী দম্পতি সুরাপানের মহোৎসবে মেতে উঠেছেন। মনে হলো স্বামী-স্ত্রী একত্রে মদ্যপান ছাড়া কারো পক্ষে জাতে ওঠা— অর্থাৎ নব্য-সমাজের সদস্য হওয়া সম্ভব নয়।

আমরা লনের যে কোণটায় বসেছিলাম ধীরে ধীরে সেখানেও ভালো আড্ডা জমে উঠলো। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব থেকে শুরু করে পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। অবশ্য এর মধ্যে সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপারেও সবাই যথেচ্ছভাবে মন্তব্য প্রকাশ করে চলেছেন। একজন প্রাক্তন সাংবাদিক তো মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে

নির্বাচন সম্পর্কে একটা ঝাড়া লেকচার মেরে ঢক ঢক করে খানিকটা 'স্কচ হুইস্কি' গিলে নিলেন। আমার সাংবাদিক বন্ধুটি কানে কানে বললেন, 'ছোকড়া মার্ক্সীস্ট হলে কি হবে, প্রায় প্রতিটি পার্টি'তেই অসম্ভব গিলতে পারে। এ-ছাড়া ওর বাড়ীতেও 'সেলার' আছে। আমি আনমনে পাকিস্তানের সংস্কারপন্থী মার্ক্সীস্টদের অবস্থা চিন্তা করতে লাগলাম।

বুঝলাম, মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাস হয়ে নির্বিকারভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসরণকারী নব্য-সমাজে উঠা-বসা করা অত্যন্ত সহজ-সাধ্য ব্যাপার। এঁদের কেউ কেউ আবার সস্ত্রীক বল-নৃত্যেও আজকাল শরিক হচ্ছেন। অবশ্য সম্প্রতি বিলাত প্রত্যাগত এক শ্রেণীর যুবক এসব ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন।

হঠাৎ করে চিন্তার খেই হারিয়ে ফেললাম। মাথাটা ঘুরিয়ে দেখলাম আমাদের আড্ডায় সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পাকিস্তানের একটা প্রগতিশীল ব্যাঙ্কের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার এসে হাজির হয়েছেন। বলা বাহুল্য, তিনি একজন বাঙালী। ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে বড্ড করুণা হতে লাগলো। কিন্তু ভদ্রলোক এক নিশ্বাসে তাঁর হাতের গ্লাসের বাকী মদটুকু শেষ করে ইংরেজীতে অশ্রাব্য ভাষায় কাকে যেন উদ্দেশ করে গালাগালি করতে লাগলেন। বুঝলাম ভদ্রলোক উচ্চাভিলাষী।

হঠাৎ করে তিনি আরও এক পেয়ালা হুইস্কি চেয়ে বসলেন। কিন্তু রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। তাই পার্টি'র অস্থায়ী 'বার'গুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

কেবলমাত্র উপস্থিত সাংবাদিকদের খাতিরে কয়েক পেগ 'স্কচ' আলাদা করে রাখা হয়েছে। আমার বন্ধুটি ওখান থেকে কিছুটা ভদ্রলোকের গ্লাসে ঢালতে লাগলেন। এমন সময় আমাদের আড্ডায় আর এক সাহিত্যিক ভদ্রলোক এসে তাঁর গ্লাসটা বাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের নির্লজ্জতায় আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম।

আর অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁকে জানানো হলো যে, তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে এ ভদ্রলোক রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত সমস্ত রকমের শালীনতা পরিহার করে ভদ্রলোককে কয়েক জন মিলে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। আর ভদ্রলোক বিরাট চীৎকার করে এ 'অন্যায়ের' প্রতিবাদ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। বুঝলাম, ভদ্রলোক 'তুমি খাবে আর আমি খাবো না—তা হবে না' শেলাগানের সমর্থক (?)।

এ ঘটনার পর আমরা সবাই ঘরে ফেরার উদ্যোগ করলাম। দেখলাম লনের আশেপাশে আমাদের পরিচিত আর এক বাঙালী মহিলা তাঁর অপ্রকৃতিস্থ স্বামীকে নিয়ে বিব্রত অবস্থায় বসে রয়েছেন। অবশ্য কয়েক জন বন্ধু ও'দের সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেছেন। ধীর পদক্ষেপে আমরা দু'জনে বিলাসবহুল হোটেল থেকে বেরিয়ে আসলাম। তখন হোটেলের ডাইনিং হল থেকে ক্যাবারে নৃত্যের বাজনার আওয়াজ ভেসে আসতে শুরু করেছে।

দু'জনে একটা রিক্সায় বসে চাঁদের ঝলমলে আলোতে সবুজের সমারোহে ঘেরা রমনার পীচঢালা পথ দিয়ে বক্সীবাজারের দিকে এগিয়ে চললাম। শুধু ভাবলাম, আইয়ুব সরকারের আমলের সুপরিকল্পিত পূর্ব বাংলায় যে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়েছিল, আগামী সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা কী সেই নব্য-সমাজের কর্তৃত্বকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চলেছি?

এত ত্যাগ, এত তিতিক্ষা আর এত রক্তের বিনিময়ের এই কী হবে পরিণতি?

দুর্নীতি দমন বিভাগে মাস কয়েক চাকুরী করার পর আমার বদলীর হুকুম এলো সুদূর নোয়াখালীতে নাকি। এ চাকরীর মোহে আমাকে যেতে হবে। আমি কর্তৃপক্ষকে পরিষ্কার জানিয়ে

দিলাম যে, আমার পক্ষে নোয়াখালীতে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে বাধ্য হয়েই চাকুরীতে ইস্তফা দিলাম। সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে দু-একদিন আইন ক্লাসে হাজিরা দেই আর বাকী সময় আড্ডা মারি—এটাই হলো আমার দৈনন্দিন রুটিন। এমন সময় পলাশী ব্যারাকের এল. এম. এফ. ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতে একটা প্রাইভেট টিউশনী পেলাম। প্রথমে কথা ছিল একজন অষ্টম শ্রেণীর বালক আর একজন পঞ্চম শ্রেণীর বালিকাকে পড়াতে হবে। এর পরিশ্রমিক হিসেবে দু'বেলা সেই ডাক্তারের বাসায় আমার খাবার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু আমার ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে এসে দেখলাম, এদের সঙ্গে আরও 'দুজনকে 'ফাও' হিসাবে পড়াতে হবে। এ দুজনের একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং আর একজনের সবেমাত্র হাতেখড়ি হয়েছে। সর্ব কনিষ্ঠ-জন সব সময়েই তার জিহ্বাগ্র নিয়ে নিজস্ব নাসারন্ধ্র থেকে আগত গলিত পদার্থ ভক্ষণরত। আর এর বয়োজ্যেষ্ঠার কর্ণমূলে গলিত পুঁজের সৃষ্টি হয়েছে। তবুও নিজের মনকে ইস্পাতকঠিন করে আমি জাতি গঠনের সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম।

এমন সময় আমার এক বন্ধু আমিনুল ইসলাম চৌধুরী এক-দিন আমাকে তাঁর ভাই সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির হলো। এই আমিনুল ইসলাম চৌধুরী তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কার্টুন চৌধুরী' নামে সমধিক পরিচিত ছিল। ভদ্রলোক পরে সি. এস. পি. হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম মার্শাল ল' জারী হবার পর 'অজ্ঞাত কারণে' আমিনুল ইসলাম আত্মহত্যা করেন। যা হোক, এই সিরাজুল ইসলামের কাছেই সাংবাদিকতায় আমার প্রথম হাতেখড়ি। তিনি তখন ইংরেজী সাপ্তাহিক 'পাকিস্তান পোস্ট' পত্রিকার মালিক-সম্পাদক। এ পত্রিকা পরে কিছুদিনের জন্য দৈনিক পত্রিকা হিসেবেও প্রকাশিত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের বর্তমান অধ্যক্ষ

জনাব আতিকুজ্জামান খান এ পত্রিকায় কিছুদিনের জন্য বার্তা-সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং এ সময় আমি তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম।

যা হোক অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমি 'পাকিস্তান পোস্টের' সংসর ত্যাগ করতে বাধ্য হই। কেননা সারা মাস কাজ করার পর সঠিক সময়ে বেতন না পাওয়াটা এতোই নিয়মিতভাবে হতে লাগলো যে, তাতে আমার 'পক্ষে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আর সম্ভব হলো না।

এদিকে প্রাইভেট টিউশনীতে এক বিপদ দেখা দিল। অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত আমার ছাত্রটি বার বার তাকে আরবী পড়া বুঝিয়ে দেবার জন্য জোর তাগিদ শুরু করলো। আমি নানা-ভাবে তাকে বুঝাতে লাগলাম যে, আরবীর মত সহজ বিষয় আর কোনটাই নয়। তাই পরীক্ষার আগে আরবী পড়া সপ্তাহখানেক দেখিয়ে দিলেই চলবে। এখন অন্যান্য বিষয় পড়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আপাততঃ পরিস্থিতির মোকাবেলা করলাম বটে, কিন্তু শেষরক্ষা বোধহয় আর হয় না। কেননা ছাত্রটির বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগলো।

এমনি এক সময়ে আমি অধুনালুপ্ত পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠলাম। তখন যোগীনগরে ভাষানী ন্যাপের পদত্যাগকারী সাধারণ সম্পাদক তোয়াহা সাহেবের বাসার নীচের তলায় যুব লীগের অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এখানেই একদিন এক কিশোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম কারো সঙ্গে বোধ হয় দেখা করতে এসেছে। কিন্তু দু-চার কথার পর জানতে পারলাম যে, ইনি ঢাকা কলেজে আই. এ. পড়ছেন এবং সম্প্রতি যুব লীগের সদস্য হয়েছেন। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম যে ছেলেটার মুখে সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। আলাপ করে দেখলাম ছেলেটা সমাজ-

ব্যবস্থা সম্পর্কে খুবই সচেতন আর রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশ ভালো পড়াশুনা রয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রয়েছে। ইনিই হচ্ছেন বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার এবং বিশিষ্ট চিন্তাশীল সাহিত্যিক ডক্টর আনিসুজ্জামান।

এখানে যুব লীগ সম্পর্কে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে যুব লীগ কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায়ের একটা 'প্লাটফরম' মাত্র। তাই আজকের 'পিডিপি'র জনাব মাহমুদ আলী তখন যুব লীগের সভাপতি হতে পেরেছিলেন আর বর্তমান এন. পি. এল-এর জনাব ওলি আহাদ সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই যুব লীগ সংগঠনের জন্য আমাকে উত্তরবঙ্গে পাঠানো হলো। আর আমিও কালবিলম্ব না করে যুব লীগের ম্যানিফেস্টো আর অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে উত্তরবঙ্গে রওয়ানা হলাম। তবে আমি এ সময়ে ছাত্র লীগের সক্রিয় সদস্য ছিলাম।

দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া সফরান্তে শেষ পর্যন্ত রাজশাহীতে এসে হাজির হলাম। রাজশাহীর রাজনৈতিক পরিবেশ তখন খুবই উত্তপ্ত। কেননা এর আগে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে নিরস্ত্র রাজবন্দীদের গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। আর নাচোলের 'দুঃখজনক' ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। আমি রাজশাহী উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলাম 'নাচোলে হত্যা মামলার' শুনানী শুরু হয়েছে আর চারদিকে একটা থমথমে ভাব।

রাজশাহী থেকে যখন ঢাকায় ফিরে এলাম তখন সমগ্র প্রদেশে লবণের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দিন দশেক সময়ের মধ্যেই দু-তিন আনা সেরের লবণ ষোল টাকায় দাঁড়ালো। সে এক অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কোন কিছু বোঝার আগেই

সব কিছু ঘটে গেল। একরকমভাবে বলতে গেলে সব কাজকর্মই বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ীর কর্তারা যাঁদের অনেকেই সম্মানহানির ভয়ে বহুদিন পর্যন্ত বাজারমুখো হননি, সবাই এক মুঠো লবণের খোঁজে কাজকর্ম সব বন্ধ করে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ইকবাল হলে আমরা যে মেসটার সদস্য ছিলাম, সে মেসে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে লবণ ছাড়াই তরকারী রান্না করা হবে আর মেসের সদস্যরা নিজ নিজ দায়িত্বে লবণ জোগাড় করে খেতে আসবেন। ফলে লবণ চুরির খবর পাওয়া যেতে লাগলো। হলের ছাত্ররা চুরির আশংকায় সংগৃহীত লবণ যার যার ট্রাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে রাখলো। আমার রুমমেট রংপুরের মান্নান সাহেব একদিন বিরক্ত হয়ে মৌলবীবাজার থেকে তিন টাকা বারো আনা দিয়ে এক পোয়া লবণ কিনে আনলেন। আমি উপায়ান্তরবিহীন হয়ে দু-বেলাই মান্নান সাহেবের প্রতীক্ষায় থাকতাম; উনি মেসে খেতে গেলেই আমিও খাবার জন্য গিয়ে হাজির হতাম। হাজার হলেও তো আমি তাঁর রুম-মেট। তাই একজন শিক্ষিত আর মার্জিত রুচির ভদ্রলোকের পক্ষে খেতে বসে অন্ততঃ তাঁর রুম-মেটকে সামান্য একটু লবণের জন্য নিরাশ করা সম্ভব হতো না।

হঠাৎ একদিন সকালে হৈ-চৈ আর শ্লোগানের শব্দে নিজের রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের কয়েক শো ছাত্র 'লবণ চাই', 'লবণ চাই', শ্লোগান দিতে দিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন সাহেবের বাসস্থান বর্ধমান হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ইকবাল হল থেকেও অনেক ছাত্র দৌড়ে গিয়ে সেই মিছিলের শরিক হলো। শুনলাম গত দু'দিন থেকেই মুসলীম হলে এক চমকপ্রদ ব্যাপার চলছে। হলের কতৃ'পক্ষ লবণ সংগ্রহ করতে না পেরে দু'বেলাই ছাত্রদের জন্য শুধু মাত্র দৈ-ভাতের ব্যবস্থা

করেছেন। পর পর চারবেলা দৈ-ভাত খাওয়ার পর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় ছাত্ররা এখন রাস্তায় বেড়িয়েছে। এই ক্ষোভ-মিছিলেই কাজ হলো। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার সময় চাওয়া হলো। কিন্তু ছাত্ররা ২৪ ঘণ্টার চরমপত্র দিয়ে এসে আবার দৈ-ভাত খেতে বসলো। পর দিনই দেখলাম ঢাকার হাসপাতাল আর ছাত্রাবাসগুলোতে ট্রাকে করে লবণ সরবরাহ করা হলো। আর আমরাও হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

লবণ 'কেলেঙ্কারী'র জন্য প্রধানতঃ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীনকে দায়ী করা হলেও কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মরহুম ফজলুর রহমান এর জন্য কম দায়ী ছিলেন না। কেননা করাচীর ব্যবসায়ী মহলের প্রভাবে জনাব রহমান পূর্ব বাংলাকে সব সময়েই করাচীর লবণের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছিলেন। অন্য দিকে জনাব নুরুল আমীনের প্রাদেশিক সরকারও প্রদেশকে লবণে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার কোন প্রচেষ্টাই করেননি।

নিয়তির পরিহাস, আজ পর্যন্তও পূর্ব বাংলার লবণ সরবরাহের একই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। শুধু তাই নয়, কক্সবাজারে যে সীমাবদ্ধ পরিমাণ সামুদ্রিক লবণ তৈরী হচ্ছে আবগারী করের 'যন্ত্রণায়' তা আজ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে। জানি না, কবে এ-সবের একটা সুরাহা হবে।

ধীরে ধীরে আমার আর্থিক অবস্থাটা খারাপ হয়ে আসতে লাগলো। বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার নিয়ে ঋণে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম। এদিকে মেসের টাকা দিতে না পারলে খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এমনি এক সময়ে বর্তমান পি-ডি-পি নেতা মাহমুদ আলী সাহেবের সাপ্তাহিক 'নওবেলালে' সাব-এডিটরের একটা চাকুরী জুটিয়ে নিলাম। মাহমুদ আলী সাহেব তখন পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের সভাপতি আর অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রী দল গঠনের পাঁয়তারা কষছেন। সাপ্তাহিক 'নওবেলাল-এ চাকুরী

হবার পর আইন পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরী হতে লাগলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হলো না।

১৯৫২ সালে ৩১ শে জানুয়ারী। পল্টনের জনসভায় পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হবে বলে ঘোষণা করে বসলেন। পরদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট আর বটতলায় ছাত্রসভা হলো। এ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ইতিহাসের ছাত্র হাবিবুর রহমান শেলী এক চরম বিতর্কমূলক বক্তৃতা দিয়ে বসলেন। বক্তৃতায় তিনি কায়েদে আজমকেও ছেড়ে কথা কইলেন না। অনেক কষ্টে সভায় শান্তি স্থাপন করা হলো এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নাজিমউদ্দীনের উক্তির প্রতিবাদে সমগ্র ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ছাত্র হাবিবুর রহমান শেলী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ অনার্স পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান দখল করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি এম-এ পরীক্ষায় রেকর্ড মার্ক পেয়ে প্রথম স্থান দখল করেন। এক বছর শেলী সাহেব সলিমুল্লাহ্ হলের সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিতও হয়েছিলেন। এহেন ছাত্র এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা লেকচারের পদের জন্য দরখাস্ত করলেন। কিন্তু প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এই অপরাধে তাঁকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী দেয়া হলো না। উপায়ান্তরবিহীন অবস্থায় হাবিবুর রহমান Shelley's 'Own Shop' নাম দিয়ে একটা ভ্রাম্যমান সিগারেটের দোকান খুলে দিলো। আজকের দিনে রেলওয়ে ষ্টেশনে গামছা দিয়ে ঘাড়ের সঙ্গে ঝুলানো টিনের পান-বিড়ির দোকান দিয়ে অশিক্ষিত ভেণ্ডাররা যেভাবে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে বেড়ায় শেলীও তেমনি তাঁর

দোকানটা নিয়ে কার্জন হল থেকে শুরু করে ইকবাল হল পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ছাত্রীদের কমনরুম থেকে মধুর ষ্টল পর্যন্ত সর্বত্র খালি শেলীর কাণ্ডকারখানার আলোচনা চলতে লাগলো। আর ছাত্ররাও খুঁজেপেতে কেবল শেলীর কাছ থেকে সিগারেট কিনতে লাগলো। ফলে শেলীও দুটো পয়সা মুনাফা করতে লাগলো। কিন্তু বেশী দিন এ আরাম আর তাঁর কপালে সইলো কই!

শেলীর এ ব্যাপারে শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই উদ্বিগ্ন হলেন তাই-ই নয়, প্রাদেশিক সরকারও একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মোকাবেলা করলো। শেষ পর্যন্ত একদিন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির একজন ইন্সপেক্টর এসে শেলীর কাছে শপ লাইসেন্স চেয়ে বসলেন। অন্যদিকে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরাও তাঁকে অবিরাম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো। তাই শেলীর অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে উঠলো। কাউকে কিছু না বলেই একদিন শেলী সাহেব ঢাকা থেকে উধাও হয়ে গেলেন। পরে শুনলাম তিনি একটা বিদেশী ফার্মে চাকুরী জোগাড় করেছেন। যে ছাত্র একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করবার জন্য স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন আজও সফল হয়নি। যতদূর জানি তিনি এরপর অসুস্থ হয়ে অনেকদিন পর্যন্ত হাসপাতালে অবস্থান করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি আইন পাশ করে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারে গিয়ে হাজির হন। এরপর যখন তাঁর খবর পেলাম, তখন তিনি ব্যারিষ্টার হয়ে ঢাকা হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে ইনি সরকারী এডভোকেট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

বিধাতার বিধান কে খণ্ডাতে পারে! যে হাবিবুর রহমান শেলীকে একদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা প্রাদেশিক সরকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকুরী দিতে সাহসী হননি, সেই শেলী সাহেব আজ ঢাকা হাইকোর্টে প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত মামলা মোকদ্দমায় শলাপরামর্শ দেওয়া থেকে শুরু করে আইনের সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে এজলাসে সরকারকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

ভাষার প্রশ্নে আমরা একটা বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য মনস্থ করলাম। আজাদী লাভের পর থেকে শুরু করে বাহান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় পর্যন্ত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া খুবই নাজুক ছিল। মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে ঢাকার রোজ-গার্ডেনে বগুড়ার মুহম্মদ আলী, এ মালেক, জনাব টি আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমবায়ে সর্বপ্রথম বিরোধী দল গঠনের যে প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা সে প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার জন্য ডাঃ মালেক ও জনাব টি. আলীকে মন্ত্রিত্বের টোপ দিয়ে নিয়ে গেলেন। আর বগুড়ার মুহম্মদ আলীকে বর্মায় পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ করলেন। টাঙ্গাইলের প্রথম উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীতপ্রার্থী খান পন্নী সাহেব বিরোধী দলের উদীয়মান যুব নেতা শামসুল হকের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে, ক্ষমতাসীন দল চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত সমস্ত উপনির্বাচন বন্ধ করে দিলেন। সরকারের তখন নীতিই হচ্ছে বিরোধী দল গঠন করতে দেয়া হবে না আর সরকারের সমালোচনা সহ্য করা হবে না। তাই যখন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে কোন জন সভার আয়োজন করা হয়েছে, তখনই 'শান্তি-রক্ষা'র নামে চুয়াল্লিশ ধারা জারী করা হয়েছে, না হয় গুণ্ডা লেলিয়ে এসব জনসভা পণ্ড করা হয়েছে। জননিরাপত্তা আইনে এ সময়ে যথেচ্ছভাবে বিরোধী দলীয় কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতো নেতাকে

পূর্ব বাংলা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন একরকমভাবে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে বুদ্ধিজীবীদের জন্য তখন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এরই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার স্বার্থ-বিরোধী একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মরহুম লিয়াকত আলী খান জোর প্রচেষ্টা চালালেন।

এদিকে পূর্ব বাংলার প্রথম রেলওয়ে আর পুলিশ ধর্মঘটকে সরকার কঠোর হস্তে দমন করলেন। উপরন্তু দিনাজপুর জেলে রাজবন্দীদের উপর লাঠি চার্জ ও রাজশাহী জেলে গুলীবর্ষণ ছাড়াও খুলনা আর ময়মনসিংহের হাজং এলাকায় গুলীবর্ষণ করে সরকার আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের বিরোধীদলগুলো বিশেষ করে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, তমুদ্দন মজলিশ আর নিজামে ইসলাম সরকার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে কিছু করতে সাহসী হলেন না। এটা এমন একটা সময় ছিল যখন আর্মানীটোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভায় রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করে প্রস্তাব উত্থাপন পর্যন্ত করা যায়নি। এ সময় রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীর উদ্যোক্তাদের গ্রেফতারী পরোয়ানার ভয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হতো। বরিশালে তো এক পুস্তক ব্যবসায়ীকে ম্যাক্সীম গর্কির 'মা উপন্যাসের বাংলা অনুবাদের বই বিক্রীর অপরাধে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হলো।

এমনি এক পরিবেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় দফায় ভাষা আন্দোলনের জোয়ার এলো। ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার আপামর জন সাধারণের মধ্যে যেভাবে সাড়া জাগাতে পেরেছিল, একমাত্র উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ছাড়া আর কোন আন্দোলনে তা' সম্ভব হয়নি। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্য

ব্যাপার, এ আন্দোলনকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব কোন রাজনৈতিক দলের নেই। ভাষা আন্দোলন যখন এক চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, তখন এখানকার রাজনৈতিক দলগুলোর সমবায়ে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির সিদ্ধান্ত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, ভাষা আন্দোলনকারী ছাত্ররা সেদিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির গৃহীত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে ঐ প্রদেশের রাজনৈতিক আর সমাজ-জীবনের ইতিহাস অন্ধ-কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়তো, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভাষা আন্দোলনের প্রায় দেড় যুগ পরে এ সব কথা লিখতে বসে আজ অনেকের কথাই মনে পড়ছে। এঁদের কে কোথায় এখন কীভাবে রয়েছে, তার বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলমতনির্বিশেষে একদল ছাত্র যেভাবে এ আন্দোলনকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এঁদের চোখে মুখে ছিল আগুনের ভাষা। এক একজন ছাত্র যেন এক একটা জলন্ত আগ্নেয়গিরি কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা আর কী সাহসই না এঁদের মধ্যে দেখেছি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যেই রয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁরা এখন অনেকটা স্তিমিত; এঁদের অনেকেই সরকারী উচ্চপদে সমাসীন রয়েছেন। আবার কেউ বা জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার জীবনমরণ সন্ধিক্ষণে এঁরা যে ত্যাগস্বীকার করে গেছেন, তা সত্যিই অতুলনীয়।

১৯৫২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ করে দেয়া হলো। আর সশস্ত্র পুলিশ আন্দোলন-

কারী ছাত্র নেতা আর কর্মীদের গ্রেফতার করবার জন্য শহরের প্রতিটি এলাকা চষে ফেলতে শুরু করলো। পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য চকবাজারের ওধারে ডালপট্টিতে একটা বাড়ীতে আত্মগোপন করলাম। বাড়ীর মালিক বার বার করে আমাকে অভয় দিতে লাগলেন। কিন্তু তবুও কেন জানি আমি নিজেকে আর নিরাপদ মনে করতে পারলাম না। এদিকে আমার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের যাঁরা ঐ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেছিলেন, তাঁরা হয় এর মধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন, না হয় আত্মগোপন করে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। তাই উপায়ান্তরবিহীন অবস্থায় ঢাকা ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এখানে একটা ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। একুশে ফেব্রুয়ারী পুলিশের গুলীবর্ষণের পর সন্ধ্যার একটু আগে চা খাওয়ার জন্য পলাশী ব্যারাকের রেলওয়ে ক্রশিং-এর ঠিক উল্টোধারে একটা সাধারণ হোটেলে একাকী বসে এক আনা দামের এক কাপ চা খাচ্ছিলাম। এমন সময় প্রাদেশিক সরকারের প্রচার দফতরের একটা ভ্যান রেলওয়ে ক্রশিং-এর ধারে এসে হাজির হলো। ভ্যানের মাইক থেকে শহরে সান্ধ্য আইন জারীর নির্দেশনামা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে আবার পরিস্থিতি গরম হয়ে উঠলো। নিরাপদ দূরত্ব থেকে একদল ছাত্র জনতা ভ্যানটাকে লক্ষ্য করে ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগলো। আর একটা জীপে ই. পি. আর বাহিনীর জনাকয়েক সৈন্য গুলি ভর্তি ষ্টেনগান আর রাইফেল নিয়ে ভ্যানটাকে পাহারা দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। ভ্যানটা আজিমপুরের দিকে রওয়ানা হবার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলে আমার অদূরে উপবিষ্ট একজন স্থানীয় লোক স্বগত উক্তি করতে লাগলেন, ‘ইস কারফিউ দিছে। হালারা কারফিউ দিয়া আমাগো ভয় দেখায়। বাইশ শাল থাইকা হালায় কারফিউ দেখাইতেছে। হেই কারফিউর মধ্যেই তো আমার

মাইয়া হইল। মহলার মাইনষে মাইয়ার নাম কি রাখছি জানবার চাইলে, কইয়া দিলাম—'কারফিউ বিবি'। আর হেই কারফিউ দিয়া আমাগো ভয় দেখাইতেছে।' স্থানীয় ভদ্রলোকের এ উক্তির মাঝ দিয়েই বুঝতে পারলাম মাত্র ৩।৪ বছরের ব্যবধানে অবস্থার কত পরিবর্তন ঘটতে পারে। ১৯৫৮ সালের প্রথম ভাষা আন্দোলনে যেখানে ছাত্ররা ঢাকার স্থানীয় লোকদের কাছে মার খেয়েছে, সেখানে বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের সময় এই স্থানীয় লোকেরাই সক্রিয় সহযোগিতা করে আন্দোলনকে সাফল্যের চরম শিখরে এগিয়ে নিয়ে যেতে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। ঢাকার স্থানীয় মনোভাবের পরিবর্তনের ফলে পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার সব ক'টি গণতান্ত্রিক আন্দোলন সহজেই করা সম্ভব হয়েছে। একটা কথা, এখনও ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, সাত বছর ধরে গভর্ণরগিরি করলেও জনাব মোনেম খাঁর মতো প্রতাপশালী লোকের পক্ষেও ঢাকার পল্টন ময়দানের কোন জনসভায় বক্তৃতা দেয়া সম্ভব হয়নি। অবশ্য একটা বিশেষ ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের প্রধানও আজ পর্যন্ত পল্টনের জনসভার মোকাবেলা করতে পারেন নি। মাত্র কিছুদিন আগে এ দলের পক্ষ থেকে পল্টনে জনসভা অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু তাতে দুজন নিহত হয় এবং পল্টন ময়দান একটা রণক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়।

যাহোক, যা বলছিলাম। বাহান্ন সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী কারফিউ শুরু হবার কিছুক্ষণ আগে চকবাজার থেকে টাউন সার্ভিসের বাসে গেণ্ডারিয়া লোহার পুলে এসে নামলাম। চিন্তা করে দেখলাম ঢাকার ফুলবাড়ী ষ্টেশনের চেয়ে গেণ্ডারিয়া থেকে ট্রেনে ওঠা অনেকটা নিরাপদ। শেষ পর্যন্ত যখন গেণ্ডারিয়া ষ্টেশনে এসে হাজির হলাম, তখন ঢাকা শহরে কারফিউ শুরু হয়ে গেছে আর রাতের ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে। গেণ্ডারিয়া

ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে টিমটিম করে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। এতে খুব সুবিধা হলো। কেননা প্ল্যাটফরমে এ কেরোসিনের আলোর দরুণ পরিষ্কারভাবে কারও চেহারা দেখা সম্ভব হচ্ছিল না। রাত প্রায় এগারোটার সময় নারায়ণগঞ্জ থেকে উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনটা এসে হাজির হলো। আমি একটা ইণ্টার ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টের বাংকে উঠে পড়লাম। সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বুঝতেই পারিনি। যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন ট্রেনটা ময়মনসিংহ পোঁছেছে। পরে জেনেছিলাম সেদিনও ফুলবাড়ী ষ্টেশনে অনেক ক'জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। হল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এরা সবাই যার যার দেশে ফিরে যাচ্ছিল।

ফুলবাড়ী পোঁছানোর পর আপাততঃ কোথায় যাব সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লাম। নিজের স্থায়ী বাসস্থান বগুড়ায় যাওয়ার সাহস হ'লো না। কলেজ জীবনের লীলাক্ষেত্র দিনাজপুরের কথা চিন্তাই করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত সীমান্তের ওপারে চলে যাওয়া মনস্থ করলাম।

বিকালের পড়ন্ত রোদে লালমণিরহাট হয়ে পাটগ্রাম দহগ্রাম এসে পৌঁছালাম। আমার এক বন্ধুর বড় ভাই এ পাটগ্রামেই ডাক্তারী ব্যবসা করছেন। সোজা গিয়ে সেই ডাক্তার সোলেমানের বাড়ীতে উঠলাম। ভদ্রলোক জলপাইগুড়ি থেকে আগত উদ্বাস্তু। রাতে খেতে বসে আমার আগমনের কারণ জানলাম আর ডাক্তার সাহেবের কাছে সরাসরি কুড়িটা ভারতীয় মুদ্রা চেয়ে বসলাম। এ ডাক্তার সাহেব শুধু যে আমাকে প্রার্থিত টাকা দিলেন তাই-ই নয়, পরদিন সকালে সীমান্তের ওপারে যাওয়ার ট্রেনটাতে উঠিয়ে দিলেন। সকাল সাড়ে ন'টায় আমি সীমান্ত অতিক্রম করে মাল জংশনে এসে পৌঁছলাম। এখান থেকেই আমার নতুন জীবনের শুরু হলো। আমি এক অজানা

ভবিষ্যতে গা ভাসিয়ে দিলাম। বাহান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ডামাডোলে আমার আর আইন পরীক্ষা দেয়া হলো না। যে পাকিস্তান আন্দোলনের জন্য একদিন উল্কার মত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মুসলিম লীগের পতাকা বহন করে নিয়ে বেড়িয়েছিলাম, আর যে পাকিস্তান কায়েম হওয়াতে একদিন উল্লাসে ফেটে পরেছিলাম, মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে সেই পাকিস্তানে একটা স্বৈরাচারী সরকার দেশের অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষাকে হত্যা করবার জন্য জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ছাত্রদের বুকের তাজা লহুতে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত করে দিল। শুধু তাই-ই নয়, শত সহস্র ছাত্রকে গ্রেফতারের জন্য হুলিয়া বের করলো। তাই অকালেই আমার ছাত্র-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। আমি এ বিরাট বিশ্বের জনারণ্যে হারিয়ে গেলাম। আমি পলাতক হয়ে দেশ ত্যাগ করলাম, আর আমার 'রূপালী বাতাসে'র পরিসমাপ্তি ঘটলো।

সোনালী আকাশ

বিহার রাজ্যের সবচেয়ে পূর্বসীমান্তে কাটিহার জংসন। মল থেকে শিলিগুড়ি হয়ে জনতা এক্সপ্রেসে যখন কাটিহারে পৌঁছালাম তখন ভোর হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। এখানেই আমাকে ট্রেন বদল করে শিয়ালদাগামী আসাম লিংক এক্সপ্রেস ধরতে হবে। গাড়ীর এখনও ঘণ্টা তিনেক দেরী রয়েছে। তাই ওয়েটিং রুমের দিকে এগুলাম। কাটিহার শহরটার সঙ্গে আমার মোটামুটি পরিচয় রয়েছে। কেননা দিনাজপুরে কলেজে পড়বার সময় প্রায় প্রতিমাসেই একবার করে কাটিহারে এসেছি। অবশ্য কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে নয়— এমনি সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে দল বেঁধে বিনা টিকিটে কাটিহারে বেড়াতে এসেছি। আরও একটা কারণে কাটিহার আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেটা হচ্ছে ও, টি, রেলওয়ে। অর্থাৎ 'অউথ ত্রিহুত' রেলওয়ের একটা অদ্ভুত ধরনের যাত্রীবাহী ট্রেন আযাদী লাভের আগে প্রতিদিনই কাটিহার থেকে দিনাজপুরের উপর দিয়ে পার্বতীপুর যেতো। এই ট্রেনের দুরবস্থা দেখে তখন আমরা খুবই হাসা-হাসি করতাম। কিন্তু এখন তেইশ বছর পর উত্তর বাংলায় পি, ই, রেলওয়ের ট্রেনগুলোর অবস্থা দেখে ও, টি, রেলওয়ের সেই ট্রেনটাকে অনেক বেশী আরামদায়ক মনে হয় বৈ কী!

হঠাৎ কে যেনো আমার নাম ধরে ডাক দিতেই পিছনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম দিনাজপুর কলেজের সুনীল কুণ্ডু।

ভদ্রলোক আমার চেয়ে দুক্লাশ উপরে পড়তেন। আমি জবাব দিতেই সুনীলদা প্রায় দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন 'তুমি না এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড় ? তা—এখানে কি মনে করে' ? আমি আর লুকোচুরী না করে তাঁকে সব ঘটনাই খুলে বললাম। আরও বললাম যে আমি কপর্দকহীন অবস্থায় কলকাতায় যাচ্ছি। তাই যদি সামর্থ থাকে তবে আমাকে কিছু আর্থিক সাহায্য করতে হবে।

আমি ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সংগে জড়িত থাকায় পলাতক হয়ে ক'লকাতায় যাচ্ছি জানতে পেরে সুনীলদা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, 'অন্ততঃ আজকের দিনটা তোমাকে কাটিহারে আমার গেষ্ট হিসাবে থাকতেই হবে। আমরা ঢাকার আসল ঘটনা শুনতে চাই।' আমি বললাম, 'সবই তো খবরের কাগজেই দেখেছেন। আমার কাছে নতুন করে আর কী শুন্‌বেন ? সুনীলদা একরকম জোর করেই আমার বেতের সুটকেসটা রিকসায় উঠালেন।

একটা মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু পরিবার মাত্র বছর কয়েক হয় দিনাজপুরের বাড়ীঘর বিক্রী করে কাটিহারে এসে আস্তানা গেড়েছেন। ভাই-বোন আর মা'র মুখের অন্নের সংস্থান করতে যেয়ে সুনীলদা এখনও বিয়ে করেননি। একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর দালালী করে সংসার চালাছেন। নাস্তা খেতে খেতে 'আনন্দবাজার' আর 'স্বাধীনতা'র পুরানো কাগজগুলো উল্টে দেখছিলাম। সুনীলদা এই ফাঁকে তাঁর বন্ধু-বান্ধব আর পাড়ার কিছু লোকজনদের খবর দিতে গেলেন। এসব বাংলা কাগজে ঢাকার ভাষা আন্দোলনের খবর পরিবেশনের আতিশয়োক্তি দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। 'আনন্দবাজারে'র এক প্রধান সম্পাদকীয় নিবন্ধের হেডিং হচ্ছে, 'পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন ও হিন্দুদের অবস্থা'। দৈনিক 'স্বাধীনতায়' তো' ভাষা আন্দোলনের সমস্ত কৃতিত্বই একটা বিশেষ

রাজনৈতিক দলের বলে দাবী জানানো হয়েছে। জানিনা এসব ইচ্ছা প্রসূত না অজ্ঞতা। তবে বুঝলাম যে এসব সম্পাদকীয় নিবন্ধ ভাষা আন্দোলনকারীদের বিপক্ষে যাঁরা রয়েছেন তাদের সহায়তা করবে। আমার এ' 'ধারণা বিফলে যায়নি। পরবর্তীকালে পূর্ব বঙ্গ পরিষদে নুরুল আমীন সরকার দৈনিক স্বাধীনতার এই সম্পাদকীয় নিবন্ধের উল্লেখ করে ভাষা আন্দোলন যে সীমান্তের ওপারের সক্রিয় সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছিলো তা' প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য পূর্ববাংলার জাগ্রত জনতা নুরুল আমীন সরকারের এসব যুক্তি গ্রহণ করেনি। কেননা পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনই ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের গনতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের প্রথম সংগ্রাম আর এ আন্দোলনের জন্মই হচ্ছে পূর্ব বাংলার মাটিতে। এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার নিজস্ব আন্দোলন। এ-আন্দোলন পূর্ব-বাংলার স্বাধীকারের আন্দোলন।

প্রায় দু'ঘন্টা ধরে আমি ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাস বর্ণনা করলাম। উপস্থিত শ'দুয়েক লোক অবাক বিস্ময়ে মাতৃভাষার ইজ্জত রক্ষার সংগ্রামে বাংগালী মুসলমান ছাত্রদের আত্মাহুতির অমর কাহিনী শুনলেন। বক্তব্য শেষ করবার আগে আমি তাঁদের বললাম একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে আপনারা যেখানে ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ন'ভাগ আমরা সেখানে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ। তাই আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে গনতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম।

পরদিন দুপুরে আসাম লিংক এক্সপ্রেসে চড়ে বসলাম। সুনীলদা আমাকে শিয়ালদা পর্যন্ত ইন্টার ক্লাসের একটা টিকিট কিনে দিলেন। কম্পার্টমেন্টের এক কোনায় জানালার ধারে বসে বসে এক মনে নিজের ভবিষ্যতের চিন্তা করতে লাগলাম। সন্ধ্যার সময় মনিহারী ঘাটে এসে পৌঁছালাম। এরমধ্যে আর এক সহযাত্রীর সংগে আলাপ হ'লো। সুটকেসের উপর লেখা থেকেই বুঝলাম

ভদ্রলোকের নাম জে, বি, সিংহ। বাড়ী দার্জিলিং। কিন্তু চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। কথায় কথায় সিং মশায় আমার নাম জানতে চাইলে ডাক নামের পিছনে রায় উপাধি বসিয়ে 'মুকুল রায়' হয়ে গেলাম, আর বাড়ী হয়ে গেল পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জে। দুজনে খুবই খাতির হয়ে গেলো। ফলে ভদ্রলোক মনিহারী ঘাটে তাঁর টিফিন ক্যারিয়ার খুলে আমাকেও তাঁর সংগে খেতে বাধ্য করলেন। খাওয়ার পর পানি সমস্যায় পড়লাম। কিন্তু সিং মশায় দিব্যি নদীর ঘোলাপানি খেয়ে এলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'দাদা জল খাই কোথায়? তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, 'কেন নদীতে যেয়ে আঁজলা ভরে জল খেয়ে আসুন না? হঠাৎ করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো বড় ঘোলা জল যে! আর যায় কোথায়? সিং মশায়ের চোখ কপালে উঠলো 'আরে মা গঙ্গাঁর জল! ওতো সবটাই পবিত্র!' আমি আর কথা না বলে নদীতে যেয়ে পানি খাওয়ার ভান করে ফিরে এলাম।

পরদিন কাক ডাকা সকালে শিয়ালদা পেঁৗছালাম। যখন বৈঠকখানা রোডের কারমাইকেল হোস্টেলে হাজির হলাম তখনও দারোয়ান লোহার গেটটা খোলেনি। সাতটা বাজার আগে নাকি গেট খোলার হুকুম নেই। বেতের সুটকেসটা একপাশে রেখে আমি বসে বসে ঝিমুতে লাগলাম।

আমার এককালীন রাজনৈতিক গুরু গোলামদার কাছে সাদর অভ্যর্থনা পেলাম। কারমাইকেল হোস্টেলেই আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। এমনকি হাত খরচের জন্যও গোলামদা কিছু পয়সার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি বেশ কিছুটা নিরাপদ বোধ করলাম। এখন আমার কাজই হলো সারাদিন ঘুরে বেড়ানো আর সিনেমা দেখা।

সেদিন ছিল শনিবার। সন্ধ্যার আগেই কলেজ স্ট্রীট গামী একটা ট্রামে চড়ে বসলাম। আমার কাছেই শ্যামবাজারের এক

দংগল ছোকড়া বসেছে। আমি চুপচাপ এদের কথা শুনতে লাগলাম। বুঝলাম পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কে এরা আলোচনা করছে। একজন উত্তেজিত হয়ে বলল, 'মাইরী বলছি দিনে দিনে হলো কি? ঢাকায় নাকি নেড়েরা বাংলা ভাষার জন্য গুলি খেয়েছে? সাধে কি বলি কলিকাল পড়েছে? হ্যাঁরে এই ভজা কথা বলছিসনা কেন? ভজা নামের ছোকড়াটা একটা থাবা পরিমল নস্য নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে বললো, 'আমি তো ভেবেই পাইনা বেটা নেড়েগুলো—ভাত না, কাপড় না, শেষ পর্যন্ত বাংলাভাষার জন্য জান দিলো? মাতৃভাষার জন্য আমাদের চে' ওদের দরদ বেশী হলো? অ্যা'মলো যা, এখন যাই কোথায়?'

'রাজবন্দীর মায়ের পাঠার দোকানের কাছটাতে ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম। রাস্তাটা পার হয়ে ফুটপাত ধরে এগিয়ে চললাম আর ট্রামের ছেলেগুলোর সেসব কথাবার্তা আমার মাথায় আগুন ধরিয়েছে তাই-ই চিন্তা করতে লাগলাম।

দিন কয়েক পরে একদিন বিকেলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যেয়ে হাজির হলাম। যেখানে আর, সি, পি, আই-এর পান্নালাল দাসগুপ্ত গ্রুপের এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। এদের বক্তব্য শোনার জন্য দু'আনার বাদাম কিনে একটু নিরাপদ দূরত্বে ঘাসের উপর বসে পড়লাম। জনৈক নেতা তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতায় পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলনকারীদের নেতৃত্বের ভূয়ষী প্রশংসা করলেন। আর সাফল্যজনক ভাষা আন্দোলন থেকে শিক্ষা গ্রহনের আহ্বান জানালেন। তিনি আরও বললেন, 'ধর্মের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই রাষ্ট্রে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য যেভাবে সেখানকার ছাত্রসমাজ সাফল্যজনক ভাষা আন্দোলনের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে, তা' ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। পূর্ব-বাংলার ছাত্রসমাজের আত্মত্যাগ কখনও বৃথা হতে পারেনা। এরা আমাদের নমস্য।' গর্বে আমার বুকটা ভরে উঠলো। কিন্তু

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমি আবার অবাক বিস্ময়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে লাগলাম। তিনি বললেন, 'ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি আজ বিপ্লবের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে আস্থাভাজন হয়েছে। আর তারই ফলস্বরূপ পশ্চিম বাংলার বিধান-সরকার সমস্ত কমিউনিষ্ট রাজ-বন্দীদের মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু আমাদের মহান নেতা পান্নালাল দাসগুপ্তকে আজও পর্যন্ত কারাগারে ডাণ্ডাবেড়ী দিয়ে অন্যায়ভাবে আটকিয়ে রেখেছে। তাই জনতার দরবারে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের সঙ্গে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির বিচারের প্রকৃষ্ট সময় এসেছে।'

কলকাতা এক আজব শহর। এ শহরে মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী প্রায় এক ডজন পার্টি রয়েছে। তবে একটা কথা ঠিক যে, প্রতিটি পার্টির নেতৃস্থানীয়দের প্রচুর পড়াশুনা রয়েছে। এমন কি পড়াশুনার সুবিধার জন্য অনেকে রুশ, জার্মান ও ফরাসী ভাষা পর্যন্ত ভালোভাবেই আয়ত্ব করেছেন। কিন্তু এঁরা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বলে আর অতিরিক্ত পড়াশুনা করার ফল হিসেবে মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী প্রায় এক ডজন পার্টির জন্ম হয়েছে। এঁদেরই পূর্বসূরী এম, এন, রায় একদিন আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর অন্যতম সদস্যপদ অলংকৃত করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে মতবিরোধের জন্য তিনি পার্টি থেকে বেরিয়ে আসেন। কলকাতায় মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী পার্টিগুলোর তফাৎ বোঝা সাধারণ লোকের জন্য বেশ কঠিন। সবগুলো মার্ক্সিষ্ট পার্টির পতাকা লাল হওয়া সত্ত্বেও ভালো করে লক্ষ্য করলেন দেখা যায় যে এসব পতাকার মধ্যে চিহ্নগত তফাৎ রয়েছে। এরই ফলস্বরূপ আজকের দিনে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি যেখানে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, পি, এস, পি, প্রভৃতি পার্টির সমর্থনে কেরালায় ক্ষমতাসীন রয়েছে, সেখানে নমবুদ্রীপদের নেতৃত্বে

কমিউনিষ্ট পার্টি মার্ক্সিষ্ট বিরোধী দলের আসন গ্রহণ করেছে। আর পশ্চিম বাংলায় নকসালপন্থী কমিউনিষ্টরা অর্থাৎ চারু মজুমদার আর কানু স্যানালের দল জ্যোতি বসুর মত কমিউনিষ্ট নেতাকেও 'দিল্লীর দালাল' বলে গালাগালি করতে দ্বিধাবোধ করছে না।

অন্যদিকে লোকায়ত্ব চীনে লিও শাউচীর মতো বিপ্লবী নেতাও দক্ষিণপন্থী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গদিচ্যুত হয়েছেন। আর সাংস্কৃতিক বিল্পবের জোয়ারে তাঁর সমর্থকরা উধাও হয়ে গেছেন। আবার আজকের সংস্কারবাদী রাশিয়ায় স্ট্যালিনপন্থীদের কোন খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এই স্ট্যালিনপন্থীদের দৃঢ় মনোবলের জন্যেই রাশিয়ার পক্ষে একদিন নাজী জার্মানীকে নিশ্চিহ্ন করে বার্লিন শহরে লাল পতাকা উড়ানো সম্ভব হয়েছিলো আর সংস্কারবাদী ক্রুশ্চেভ পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডীর হুঁশিয়ারীর মোকাকেলায় কিউবা থেকে 'মিজাইল বেস' প্রত্যাহার করে মস্কো ওয়াশিংটন 'হট লাইন এর সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই-ই নয়, নিয়তির নির্মম পরিহাসে রুশ-মার্কিন আঁতাত পর্যন্ত গড়ে উঠেছে।

পূর্ববাংলাতেও এর জোয়ার এসে হাজির হয়েছে। অবশ্য এখানে কমিউনিষ্ট পার্টি বহুদিন থেকেই বে-আইনী অবস্থায় রয়েছে। পূর্ববাংলায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আজ দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদল আওয়ামী লীগের লেজুর হবার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ আওয়ামী নেতা শেখ সাহেব এঁদের সাইনবোর্ড সরিয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগে যোগদানের আহ্বান জানাছেন। আর একদল বহু তালবাহানার পর নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই ভাসানী ন্যাপ্ আজ খণ্ড-বিখণ্ড হবার উপক্রম হয়েছে। তোহা-হক গ্রুপ এরমধ্যেই দল থেকে সরে পড়েছে। কাজী জাফর ও মতিন আলাউদ্দিনের গ্রুপ নির্বাচনে

অংশ গ্রহণ করবে না বলেই মনে হচ্ছে। আর একটা নাম না জানা গ্রুপ সরাসরি বিপ্লবে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন বলে আন্দাজ করা হচ্ছে।

কারমাইকেল হোস্টেলেই মোল্লা বলে একটা ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো। মোল্লা তখন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে সিকসথ ইয়ারে পড়ে। মোল্লা একদিন সন্ধ্যায় আমাকে বললেন 'একটা ভালো ছবি এসেছে। হেমিং-ওয়ের 'ফর হুম দি বেল টল্‌স।' আজই শেষ দিন। চলেন যাই নাইট শো' দেখে আসি।'

তাড়াতাড়ি খেয়ে হু'জনে বাসে করে যখন হলে যেয়ে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। টিকিট কাউন্টারে যেয়ে দাঁড়াতেই শুনলাম একটাকা হু'আনা সিটের টিকিট আর নেই। গোটা আটেক দেড়টাকা ওয়ালা সিট্ রয়েছে। হু'জনে পকেট হাতড়ে পৌনে তিন টাকার মতো পয়সা বেরুলো। কিন্তু টিকিটের দাম তিন টাকা। তাছাড়া বাসে ফিরতে আরও চার আনা লাগবে। তাই হু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে করতে পরিচিত লোকের সন্ধান করতে লাগলাম। মোল্লা সাহেব বল্লেন, চলেন ফিরে যাই। কপালটাই খারাপ। আরও হুবার এই বইটা মিস্ করেছি। আমি তবুও ইতস্তত করতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা বামাকণ্ঠের আওয়াজে ঘাড় ফিরালাম। 'যদি কিছু মনে না করেন, আমার কাছে কিন্তু খুচরো পয়সা ছিল।' আমি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম সাধারন লাল পেড়ে সূতী শাড়ী পরিহিতা মাঝ বয়েসী এক মহিলা আমাদেরই লক্ষ্য করে কথা কটা বলেছেন। বুঝলাম উনি প্রথম থেকেই আমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন। পশ্চিম বাংলার ছেলে মোল্লা তো লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলো। আমি তবুও মহিলার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালাম। ভদ্রমহিলা বোধহয় তার জীবনসঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ওগো শুনছো, একটা খুচরো টাকা দাওতো।'

একটু দূরে থ্রি পিস্ স্যুট পরিহিত এক সুদর্শন ভদ্রলোক তাঁর এক পরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। তিনি মানিব্যাগ খুলে একটা টাকা এগিয়ে দিলেন। আমিও পায়ে পায়ে ভদ্রমহিলার কাছে এগিয়ে যেয়ে বললাম, 'আপনার কাছে থেকে টাকাটা নিতে পারি; তবে টাকাটা ফেরৎ দেয়ার জন্য আপনার বাসার ঠিকানা প্রয়োজন।' উনি টাকাটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'সাত নম্বর দেশপ্রিয় পার্ক ষ্ট্রীট।'

হাফ টাইমের সময় কারমাইকেলেরই আর একটা পরিচিত ছেলে পেয়ে তার কাছ থেকে একটা টাকা ধার করে মহিলাকে খুঁজে বেড়ালাম। কিন্তু তাঁকে খুঁজে বের করার আগেই হলটা আবার অন্ধকার হয়ে গেল। বইটা দেখে শান্তিতে বুকটা ভরে গেল। গির্জার ঘন্টাধ্বনি তখনও আমার কানে বেজেই চলেছে। হল থেকে বেরিয়ে বহু খুঁজাখুঁজি করেও ভদ্রমহিলাকে আর পেলাম না।

সেদিন ছিল রোববার। সকাল বেলাতেই আমি আর মোল্লা ঠিক করলাম আজ সেই সাত নম্বর দেশপ্রিয় পার্ক ষ্ট্রীটে যেয়ে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে আসতে হবে। ভবানীপুরে যেয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেশপ্রিয় পার্ক ষ্ট্রীটের সাতনম্বর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম, তখন বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, সেদিনকার লালপেড়ে সূতীশাড়ী পরিহিতা সেই মহিলা এ বাড়ীর গৃহকর্ত্রী। মোল্লা সাহেব বার বার আমাকে ফিরে যাবার জন্য তাগাদা দিতে লাগলেন। কিন্তু আমার মনে তখন জেদ চেপে গেছে এর শেষকোথায় জানতেই হবে।

বিরাট দোতলা বাড়ী। সামনে অপূর্ব সবুজ লন। চমৎকার গেটটার একপাশে পিতলের প্লেটে লেখা আর, এন, মুখার্জী আই, এম, এস। বুকে সাহস সঞ্চয় করে লন পেরিয়ে যখন বারান্দায় হ্যাট র‍্যাকের সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন শিকলে বাঁধা বিরাট কুকুরটা

বিকটভাবে চীৎকার করতে শুরু করেছে। আমরা খেয়াল করলাম যে সেদিন ভদ্রমহিলার নামটা জিজ্ঞেস না করে কি বোকামীই না করেছি। এমন সময় বছর সতেরোর এক কিশোর বেরিয়ে এসে আমাদের আসার কারণ জিজ্ঞেস করলো। আমি তখন সমস্ত ঘটনা ছেলেটার কাছে বিবৃতি করলাম। সেকেণ্ড কয়েক চিন্তা করে ছেলেটা বললো 'হতেও পারে। আপনারা বসুন। আমি মাকে জিজ্ঞেস করে আসি।' আমরা দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পরেই ছেলেটা হাসতে হাসতে বললো, 'মা স্নান করছেন, আপনাদের বসতে বলেছেন।'

খুট্ করে দরজা খোলার আওয়াজ হতেই মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। মনটা প্রশান্তিতে ভরে উঠলো। সিঁথিতে লাল সিঁদুর টক্ টক্ করছে। পরনে লাল পেড়ে গরদের শাড়ী। মাথায় ঘোমটা দিয়ে আমাদের সামনে সেদিনকার সেই মাঝ বয়েসী মহিলা সদ্য স্নাতা অবস্থায় এসে দাঁড়ালেন। আমরা দুজনেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতেই 'বসো, বসো, তোমরা বুঝি কলেজে পড় ? তা কি মনে করে ?' আমি বললাম, 'উনি পড়েন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু সেদিনের সে ঋন পরিশোধ না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।' মহিলা বললেন ছিঃ ছিঃ অমন কথা মুখে আন্‌তে নেই। তোমরা হচ্ছো আমার ছেলের বয়েসী। কোনো গরীব ভিক্ষুককে দিয়ে দাও।' এবার মোল্লা মুখ খুললো 'কে বললো আমরা ঋন পরিশোধ করতে এসেছি ? মাসিমা, আমরা এসেছি চা খেতে।' আর যায় কোথায় পাশে বসে থাকা ছেলেটা দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলো। কথায় কথায় আমি বললাম, আমরা কিন্তু মুসলমান।' মাসীমা আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'মুসলমান তো বুঝলাম কিন্তু তোমরা বাঙ্গালী তো ? নাকি তাও না ? আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, 'এ কথাটা স্বাধীনতা লাভের আগে আপনারা উপলব্ধি করলে বোধহয় খারাপ হতো না। ১৯৪৩ সালে ময়মন-

সিংহে আমি আর আমার এক হিন্দু বন্ধু একই সংগে এক দোকানে মিষ্টি খেয়েছিলাম। কিন্তু মিষ্টি খাওয়ার পর আমাকে গ্লাসে জল খেতে পর্যন্ত দেয়নি। দোকানের এক কর্মচারী কাঁসার ঘটি থেকে জল ঢেলেছে, আর আমি সেই জল আঁজলা ভরে খেয়েছি। একথা কি ভুলতে পারি ? কিন্তু মনে রাখবেন বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্যই আজ আমরাই ঢাকায় পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছি।' আমার কথাগুলো শুনে রাগ হওয়া দূরের কথা আনন্দে মাসীমার মুখটা ভরে উঠ্‌লো। বললেন, 'ভারতে আমরা হচ্ছি মাত্র শতকরা আটজন। তাইতো আমরা আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছি।

এরমধ্যে জলপানি এসে হাজির হলো। সে এক রাজসিক ব্যাপার। হঠাৎ মাসীমা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি তো হচ্ছো আমার বাপের বাড়ীর লোক। তোমাকে আর তেমন খাতির করতে পারলাম কই ?' আমি খাওয়া বন্ধ করে বললাম, 'তার মানে ?' মাসীমার চোখ দুটো অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'কতদিন সে তাড়পাশায় কাছে পদ্মানদীর সেই স্টীমারের বাঁশীর আওয়াজ শুনিনি। কতদিন যে আমাদের দুর্গামণ্ডপের পূজা দেখিনি। অতীতটা যেন আমার কাছে ঝাপসা হয়ে আসছে। আর কি কোনো দিন জন্মভূমির মাটি স্পর্শ করতে পারবো ?' মাসিমার কথায় হতভম্ব হয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম।

এ সময় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ চীনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চীনা পত্রপত্রিকাগুলো তখন টন হিসাবে হংকং হয়ে ভারতে আসতে শুরু করেছে। তাই ভারতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নিম্নমান সত্ত্বেও কয়েকটা চীনা ছবি এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উৎসব দেখবার জন্য কয়েকদিন ধরে শুধু নানান দেশের ছবির এ্যাডভান্স টিকিট কিনলাম। কিন্তু প্রখ্যাত রুশ ছবি 'ফল অব বার্লিনের' কোন টিকিটই পেলাম না। যখন ছবিটা দেখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম, তখন কালোবাজারে অত্যন্ত চড়া দামে

এর টিকিট বিক্রি হতে শুরু হয়েছে। কেননা কর্তৃপক্ষ মাত্র একদিনের জন্য 'ফল অব বার্লিন' ছবিটা প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছেন। 'প্রাচী' প্রেক্ষাগৃহে এই একদিনেই আটটা শো'র ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সকাল ছ'টা থেকে পরদিন সকাল ছ'টা পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টার প্রতি আড়াই ঘণ্টা ধরে ছবিটা প্রদর্শিত করে আর আধঘণ্টা বিরতি দিয়ে পরবর্তী শো'র ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবুও কালোবাজারে টিকিটের দাম পঁয়তাল্লিশ টাকায় উঠলো। অবশ্য কিছু টিকিট প্রর্দশনীর দিন কাউন্টারে বিক্রির ব্যবস্থা করা হলো। শেষ পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেনার জন্য মন স্থির করলাম। ছ'টো আলু-পুরী আর এক কাপ চা খেয়ে সক্কাল বেলাতেই 'প্রাচী' সিনেমা হলের সামানে 'লাইনে' এসে দাঁড়ালাম। সকালেই দেখলাম প্রচণ্ড ভীড়। তবুও লাইনের লোককে বলে খাওয়ার জন্য লাইন ত্যাগ করা সম্ভব। অবশ্য উপস্থিত প্রহরারত পুলিশকেও এ ব্যাপারে জানিয়ে রাখতে হবে।

মাওলালীর দরগার কাছে একটা 'পাইস হোটেল' থেকে যখন খেয়ে আসলাম তখন সমগ্র প্রাচী হল এলাকাটা সশস্ত্র পুলিশ কর্ডন করে ফেলেছে। বেলা ছ'টা নাগাদ ছাত্রদের বিরাট একটা দল এসে টিকিট দাবী করলো। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তাদের কিছুতেই হলের চৌহদ্দির মধ্যেই ঢুকতে দিলো না। তাই অল্পক্ষণের মধ্যেই হৈ চৈ ধাক্কাধাক্কি আর মারামারি শুরু হয়ে গেলো। তখন হামলাকারীর দল চীৎকার করে বলে উঠলো, "আমরা হচ্ছি সাউথের ছোক্‌ড়া "ফল অব বার্লিনের টিকিট না পেলে ফল অব ক্যালকাটা হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি!" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের লাইন আর টিকিট ঘরের উপর ঢিল-পাটকেল এসে পড়তে লাগলো। এছাড়া কয়েকটা সোডা-ওয়াটারের বোতলও ছোড়া হলো। আর যায় কোথায়! পুলিশ বেদম লাঠি চার্জ শুরু

করলো। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি দেখে আমি কারমাইকেলে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করলাম। কিন্তু তারও উপায় নেই। আমাদের বিরাট লাইনটা একদল পুলিশ এমনভাবে কর্ডন করেছে যে, তা' থেকে বেরুবার উপায় নেই। তাই নিরুপায় হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ করে চোখ দু'টো জ্বলতে শুরু করলো। একজন বললেন রাস্তার ওধারে পুলিশ টিয়ার বোমা ছুঁড়ছে। প্রায় ঘন্টাখানেক পর পরিস্থিতি শান্ত আকার ধারণ করলো। জনাবিশেক লোককে পুলিশ গ্রেফতার করলো আর জনাদশেক লোককে হাসপাতালে পাঠালো। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যে পুলিশ আমাদের লাইনটা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। এই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা লোক কজনা ছাড়া হলের সামনে থেকে সমস্ত পাবলিককে সরিয়ে দিয়েছে। হলের ভিতরে কিন্তু ছবি ঠিকই চলছে। হোটেল থেকে রাতের খাবার খেয়ে যখন আবার লাইনে এসে দাঁড়ালাম, তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। সারাটা দিন ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যথায় পা দু'টো টন টন করতে লাগলো। তবুও ছবিটা দেখতে পাওয়ার ক্ষীণ আশায় মনকে প্রবোধ দিলাম।

হাতে যখন টিকিট এসে পৌঁছালো, তখন নিজেকে আর বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত পৌনে একটা বাজে। আমাদের শো' শুরু হবে রাত তিনটায়। তাই সোজা যেয়ে হলের রেষ্টুরেন্টটাতে ঢুকে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। চা' খাওয়ার পরও ঘুমে আমার চোখ দু'টো ঢুলু ঢুলু করতে লাগলো। তবুও প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

রাত আড়াইটার পরে হলে ঢুকলাম। প্রথমেই হলটার বিধ্বস্ত অবস্থা নজরে পড়লো। ছবি শুরু হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই দেখলাম আমার আশে পাশের কোন দর্শকই আর তাদের সিটে বসে নেই। সবাই উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছেন। ছবিতে লাল

ফৌজের অগ্রাভিজান আর লাল পতাকা দেখলেই ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আর লাল ঝাণ্ডাকী জয় শ্লোগানে দর্শকরা ফেটে পড়তে লাগলো। ফলে আমাকেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবিটা দেখতে হলো। উনিশ ঘণ্টা এক নাগারে দাঁড়িয়ে থেকে টিকিট কেনার পর আড়াই ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে ছবি দেখা কি দুর্বিসহ ব্যাপার তা ভুক্তভুগী ছাড়া আর কারো পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

তবে এটুকু বুঝলাম যে এব্যপারে প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। প্রায় বছর ষোল পরে ঢাকায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে ভারতীয় বাংলা ছবি "মহানগরে"র টিকিট বিক্রীর ব্যাপারে প্রায় একই রকমের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। ফলে কর্তৃপক্ষ ঢাকা স্টেডিয়ামের কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রায় লাখখানেক লোক টিকিটের আশায় স্টেডিয়াম এলাকায় ভীড় জমিয়েছিলো। আর ঢাকার পুলিশ বাহিনীকে সে ভীড় নিয়ন্ত্রণ করতে প্রাণান্তকর অবস্থা হয়েছিলো। কালোবাজারেও যথেষ্ট টিকিট বিক্রী হয়েছিলো। এমন কি এক একটা টিকিটের দাম ৪০।৪৫ টাকা পর্যন্ত উঠেছিলো কিন্তু হলের মধ্যে দর্শকরা শান্তভাবে বহুদিন পরে একটা পরিচ্ছন্ন ছবি উপভোগ করতে পেরেছিলো। আর সেদিনও 'বলাকা'তে আটটা শোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

যাহোক সকালে শিয়ালদা স্টেশনে এসে নাস্তা করে কারমাইকেল হোস্টেলে যখন যেয়ে পৌঁছালাম, তখন প্রায় সবাই মিলে আমাকে খোঁজ করতে শুরু করেছে। আমি যখন সারা রাতের ঘটনা তাদের বললাম অনেকেই তা বিশ্বাসই করতে চাইল না।

কোলকাতা এক আজব শহর। ১৯৫২ সালের কোলকাতার কথা চিন্তাই করা যায় না। শিয়ালদা স্ট্রেশন থেকে শুরু করে সর্বত্রই খালি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুতে ভরপুর। অনাহারে, দারিদ্র, বেকারত্ব আর দুর্নীতিতে কোলকাতার সমাজ জীবন বিষাক্ত হয়ে

উঠেছে। নিয়তির পরিহাসে যারা সতীত্ব বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় একদিন পূর্ববাংলা থেকে কোলকাতায় পাড়ি জমিয়েছিলেন তাদের অনেকেই সেদিন সতীত্বের বিনিময়ে দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে দেখেছি। কোলকাতার পথে ঘাটে তখন 'ম্যাসেজ ক্লিনিকের' হিড়িক পড়ে গেছে। শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের পক্ষে সন্ধ্যার সময় কার্জন পার্কে বেড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে সেখানে দালালের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়েছে।

এমনি এক সময়ে 'ইণ্ডিয়ান লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর অফিস থেকে আমার নামে একটা ইন্টারভিউ কার্ড এসে হাজির হলো। কাউকে না জানিয়ে 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে আমি কয়েক দিন আগে দরখাস্ত করেছিলাম। দুরু দুরু বক্ষে ইন্টারভিউ কার্ডটা বগলদাবা করে যখন ডালহৌসি স্কোয়ারে তিন নম্বর মিশন রো'র বিরাট বাড়ীটার চারতলায় যেয়ে হাজির হলাম। তখন সেখানকার করিডোরটাতে আর তিলধারনের স্থান নেই। একবার মনে হলো ফিরে চলে যাই। তবুও এখানকার ইন্টারভিউ জিনিষটা কী রকম তা জানবার খুবই আগ্রহ হলো। সামান্য একটা কেরাণীগিরির চাকুরীর জন্য এতোগুলো বেকার যুবকের আগমন দেখে মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। করিডোরের এক কোনায় 'সুইংডোর' ওয়ালা একটা রুম দেখে একটু বসবার আশায় ভিতরে ঢুকতেই হতভম্ব হয়ে পড়লাম। বিশালকায় একটা সেক্রেটারীয়েট টেবিলের ওধারে বিরাট বপুর এক অবাঙ্গালী ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। বিনা অনুমতিতে তাঁর রুমে ঢুকতে দেখে চীৎকার করে উঠলেন। আমি মুহূর্তের মধ্যে চিন্তা করলাম দোষ যখন করেই ফেলেছি তখন বলিষ্ঠ ভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে আপত্তি কি!

বুকে সাহস সঞ্চয় করে ইংরেজীতে আমার এ' অফিসে আসার কারণ বললাম। ভদ্রলোক আমার নাম জিজ্ঞেস করে আপাদমস্তক

একটা নজর বুলিয়ে নিলেন। আমি নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার সার্টিফিকেটগুলো দেখতে চাইলেন। সার্টিফিকেটগুলো উল্টিয়ে আমাকে এই মুহূর্তে কাজে যোগদানের কথা বললেন। আনন্দে আমার সমস্ত মনটা ভরে উঠলো। কলিং বেল বাজিয়ে তিনি চ্যাটার্জী বাবুকে আসতে বললেন। বছর চল্লিশ বয়সের চ্যাটার্জী বাবু এসে ঢুকতেই ভদ্রলোক বললেন, দেখো চ্যাটার্জী ইনকো ম্যায় 'এ্যাপয়েন্টমেন্ট' দে দিয়া। বাকী লোক কো সব যানে বোলো।"

পরে জেনেছিলাম আমাদের অফিসে ঐ বড় সাহেবের নাম হচ্ছে জে, এল, ফার্ণানডিজ। জাতিতে গোয়ানিজ। বৃটিশ ভারতে ইনি বঙ্গ বিহার ও আসাম এলাকায় ইণ্ডিয়ান লাইফ এ্যাস্যুরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট ছিলেন। কিন্তু ভারত বিভাগ হওয়ায় পূর্ব বাংলা এলাকা নিয়ে এ' কোম্পানী আর ফার্ণানডিজ সাহেব খুবই বিপাকে পড়েছেন। এ ছাড়া এই কোম্পানীরও এক মজার ইতিহাস রয়েছে। ১৮৯২ সালে করাচীতে এ কোম্পানী স্থাপিত হয়েছিলো। সংক্ষেপে এর নাম হচ্ছে 'ইলাকো করাচীর ভিক্টোরিয়া রোডে বিরাটকায় 'ইলাকো' হাউসে হেড অফিস রয়েছে। ভারত বিভাগ হবার পর পাকিস্তানীরা 'ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স' নাম শুনে কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অনীহা প্রকাশ করলো। আর ভারতীয়রা কোম্পানীর হেড অফিস করাচীতে বলে বিরূপ হয়ে উঠলেন। বহু বছর পরে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই ইণ্ডিয়ান লাইফ এ্যাস্যুরেন্স কোম্পানীর জায়গায় নাম বদলিয়ে 'আইডিয়াল লাইফ ইনস্যুরেন্স' কোম্পানী রাখলেন। ফলে সংক্ষিপ্ত 'ইলাকো নামের আর কোন পরিবর্তন ঘটলো না। আর পাকিস্তানে এ কোম্পানীর ব্যবসার সম্প্রসারণ হলো। সম্প্রতি ঢাকায় মতিঝিলে 'ইলাকোর' চৌদ্দ তলা বিশিষ্ট নতুন ভবন নির্মাণ শুরু হয়েছে। অবশ্য ভারতে কয়েক বছর

পরেই বীমা ব্যবসা জাতীয়করণ হওয়ায় 'ইলাকোর' ভারতীয় স্বত্ব এল, আই, সির অন্তর্ভুক্ত হয় আর ফার্ণানডিজ সাহেবও পরলোক গমন করেন।

আমার চাকরী পাওয়ার খবরে কারমাইকেল হোস্টেলের সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। কোলকাতার মত জায়গায় কোন রকম সুপারিশ ছাড়া এক'শ পয়ত্রিশ টাকা বেতনের একটা কেরানীগিরির চাক্‌রী যোগাড় করা খুবই কষ্টকর। তার উপর পূর্ববাংলার ছেলের পক্ষে তো এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। চাকুরীতে যোগ দেয়ার দিন কয়েক পরেই আমাদের অফিসের এক ফার্লং এর মধ্যে এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসে বেলা প্রায় সাড়ে দশটায় এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গেলো। ডাকাতরা জনাকীর্ণ ডালহৌসি স্কোয়ারের মাঝ থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রায় আশি হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেলো। আমরা অফিসের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে চারতলায় বসে স্টেন গানের গুলির আওয়াজ শুনে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম।

কয়েকমাস চাকুরী করার পরই কোলকাতা থেকে আমাকে পাততাড়ি গুটাতে হলো। পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে পাসপোর্ট চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় বদলীর হুকুম হলো। পূর্ববাংলায় রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের সুপারিশের দরুনই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে যাতায়াতকারীদের জন্য পাসপোর্ট প্রথার প্রবর্তন করলো। পশ্চিম বাংলা থেকে এর প্রতিবাদ করা হলেও আন্তর্জাতিক প্রথা অনুসারে ভারত সরকারকেও পাকিস্তানে যাতায়াতকারীদের জন্য পাসপোর্ট চালু করতে হলো। এতে করে দুটো দেশের মধ্যে যাতায়াতকারী লোকদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেলো। এমন কী প্রথম ২।৩ দিন আইনগত ভাবে কেউই সীমান্ত অতিক্রম করতে পারলো না। এই সময় কোলকাতার

একটা ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত একটা নিউজ ফটো অনেকের প্রশংসা অর্জন করেছিলো। পাসপোর্ট প্রথা চালু হবার প্রথম-দিনে দর্শনা থেকে যে ট্রেনটা রানাঘাটে পৌঁছায় সেটা সমস্তটাই খালি ছিল। কেবলমাত্র একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরার এক কোনায় একটা বিড়াল ছিল। কলকাতার পত্রিকাটি এই ফটো ছাপিয়ে একটা চমৎকার ক্যাপসান দিয়েছিল।

যাহোক ঢাকায় ফিরে আসার আগে চাকুরীতে ইস্তফা দিলাম। কেননা কোলকাতায় আমার মতো যুবকের কেরানীগিরি চাকুরী করা সম্ভব হলেও, ঢাকায় সেই একই চাকুরী করা সম্মান হানিকর বৈ কী। মাসখানিক ঘোরাঘুরির পর দৈনিক 'আমার দেশ' পত্রিকায় সাব এডিটরের একটা চাকুরী পেলাম। নোয়াখালীর মরহুম মহীউদ্দিন আহমদ এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এটাই হচ্ছে পূর্ববাংলার প্রথম প্রগতিশীল দৈনিক পত্রিকা। কিন্তু ''আমার দেশ' কাগজটার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো। তাই বেতনের অনিয়মতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। অবশ্য তখনকার দিনে একমাত্র 'সংবাদ' ছাড়া ঢাকায় আর কোন পত্রিকা অফি-সেই নিয়মিত বেতন হতোনা। পাকিস্তান মুসলিম লীগের বদৌলতে দৈনিক সংবাদের আর্থিক বুনিয়াদ খুবই সুদৃঢ় ছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মরহুম লিয়াকত আলী খান ছাড়া দিনাজ-পুরের মরহুম আব্দুল্লাহেল বাকী আর প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন দৈনিক সংবাদের 'ট্রাষ্টি' ছিলেন। পাকিস্তান মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে দৈনিক সংবাদের স্বত্ব কিনে নিলেও প্রথমে এ কাগজটা ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়েছিলো। দৈনিক সংবাদের প্রথম নাম ছিলো দৈনিক 'জিন্দেগী'। প্রতি সংখ্যা জিন্দেগীর দাম ছিল মাত্র এক আনা আর এর মাস্তলে 'কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের একমাত্র সংবাদ পরিবেশক' কথা কটা লেখা থাকতো। মালিকানার হাত

বদল হবার সংগে সংগে 'জিন্দেগী' নাম বদলিয়ে সংবাদ রাখা হয় পূর্ব বাংলায় যতগুলো খবরের কাগজ রয়েছে তার মধ্যে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে শ্রুতি মধুর আর বাঙ্গালী নাম।

'সংবাদে' চাকুরী নেয়ার পর ১০৫ তাঁতি বাজারে এসে আস্তানা গাড়লাম। তাঁতি বাজারের এবাড়ী থেকে ঐ সময় বাঙ্গালী যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'অগত্যা' প্রকাশিত হতো।

এই পত্রিকায় সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল, বাইরে থেকে ডাকে আসা কোন লেখাই ছাপা হতোনা। এমনকি এ সব খাম পর্যন্ত খোলা হতো না। সবই অগত্যার পিয়ন সুলতান সের দারে বিক্রী করে দিতো। অগত্যার চিঠিপত্রের কলাম সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিলো। দু' একটা চিঠিপত্রের কথা এখনো আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে। যেমন: ঢাকায় মশার উপদ্রব আবার বেড়েছে। উত্তর: হামছে না পুছ, পুছ বাহারছে, পুছ বাহারছে। (এ সময় মরহুম হাবীবুল্লাহ বাহার প্রাদেশিক স্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন।) আর একটা প্রশ্ন ছিল: আমি মওলানা আকরাম খাঁকে একটা চিঠি লিখতে চাই। কী বলে তাঁকে সম্বোধন করবো? উত্তর: আয় মেরে জান, পেয়ারে দামান নূর এ চামন, আসমান কি চাঁদ, আঁখোকা তারা গিয়ারে মওলানা সমীপেষু। 'একজন জিজ্ঞাসা করলেন, পূর্বপাকিস্তান থেকে কি কি জিনিস বিদেশে রফতানি হয়? উত্তর: পাট, চা, চামড়া কবি (এ সময় এক কবি বিদেশ সফরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।)

অগত্যা অফিসে তিনটা কামরা ছিলো। প্রথমটাতে মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, দ্বিতীয়টাতে ফজলে লোহানী আর সবচেয়ে পিছনের কামরায় আমার থাকার ব্যবস্থা ছিলো। তিন জনের সমন্বয়ে আবার একটা মেসও করা হয়েছিলো। অগত্যার পিয়ন সুলতান ঐ মেসের বাবুর্চি পদে বহাল ছিল। মুস্তাফা

সাহেবের চাকুরী ছিলো সকালে লোহানী সাহেবের রাতে আর আমার ছিলো দুপুরে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হতোনা। আর ফল হিসাবে দু'টো মাত্র লুংগিতেই আমাদের তিনজনের দিব্বি চলে যেতো। কিন্তু একদিন এ সিষ্টেমের গণ্ডগোল হয়ে গেলো। সেদিন কিসের একটা ছুটির দিন ছিল। তাই রাতে একই সঙ্গে তিনজনে শোবার জন্য এসে হাজির হলাম। এখন উপায়? শেষপর্যন্ত লোহানী সাহেব তার কামরায় অন্ধকারের মধ্যে স্যুট খুলে খবরের কাগজ দিয়ে লুংগি বানিয়ে দিব্বি শুয়ে পড়লেন। অবশ্য সকালে তাকে বিছানার চাদর পরিহিত অবস্থায় আবিষ্কার করা হলো। এ'লোহানী সাহেব তখন একটা ইংরেজী কাগজে চাকরী করতেন। অবশ্য এ চাকুরীতে মাইনের বালাই ছিলনা। হৈ চৈ আর চীৎকার করে মালিকের কাছ থেকে পয়সা আদায় করতো। শীতের প্রারম্ভে একদিন লোহানী সাহেব কাগজের মালিক সম্পাদক সাহেবের দরবারে টাকার জন্য হাজির হলেন। ভদ্রলোক, হেঁ হেঁ করে হেসে বললেন, আমি জানি তোমাদের মতো ব্যাচেলারদের এখন টাকার দরকার কেন? স্যুট বানাবে বোধহয়? ঠিক কিনা অ্যাঁ? লোহানী সাহেব জবাব দেবার আগেই ভদ্রলোক নিজের নাম ছাপানো একটা প্যাডের কাগজে খসখস করে একটা ছোট্ট চিঠি লিখে বললেন, দোকানে গেলেই তোমাকে একটা স্যুট বানিয়ে দেবে। অগত্যা আমাদের লোহানী সাহেব কাগজটা হাতে করে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর মাথায় একটা শয়তানি বুদ্ধি এলো। চিঠিতে যেখানে অংকে এক লেখা ছিলো সেখানে দিব্বি এককে দুই বানিয়ে নির্দ্দিষ্ট টেইলরিং শপে যেয়ে হাজির হলেন। আর সবচেয়ে ভালো কাপড়ের দু'টো গরম স্যুটের অর্ডার দিলেন। বুঝতেই পারছেন, এভাবেই সেদিন লোহানী সাহেব তার রাত জাগা কাজের মজুরী আদায় করলেন। আর

যারা ভদ্রলোক সাংবাদিক—মানে কি না লোহানী সাহেবের মতো নয়, তাঁদের কপালে বাসায় ফিরলে স্ত্রীর গঞ্জনা ছাড়া আর কী জুটতে পারে।

১০৫ তাঁতি বাজারে আমাদের তিনজনের মেসে প্রায়ই রান্নাবারি হতো না। কেননা তিনজনেই 'ডিফলটার' ছিলাম। অর্থাৎ টাকা পয়সার ব্যাপারে অনিয়মতা একটু বেশী ছিলো। অবশ্য এর জন্য আমাদের খাওয়া দাওয়া আটকে থাকতো না। হঠাৎ দেখলাম লোহানী সাহেবের কোন পাত্তা নেই। বুঝলাম, যে কোন ভাবেই হোক তার হাতে কিছু টাকা এসেছে। সংগে সংগে ভদ্রলোক আজিমপুর কলোনীতে তার বোনের কাছে থাকতে শুরু করলেন আর প্রায়ই দুপুরে 'রিট্জে' লাঞ্চ সমাধা করতে লাগলেন। এ ক'দিন মেসের সংগে তাঁর কোন সম্পর্কই রইলোনা। এরপর আবার মুস্তাফা সাহেব দিন কয়েক উধাও হয়ে রইলেন। বুঝলাম উনি মাইনে পেয়েছেন। এধরনের একটা পদ্ধতি দেখে আমিও তা অনুসরণ করলাম। সংবাদ অফিসে প্রথম মাসের বেতন পাবার পরই গায়েব হলাম। হপ্তাখানেক পর পকেটের পয়সা শেষ হওয়ায় একদিন আবার তাঁতি বাজারে এসে হাজির হলাম। সুলতানকে আমার খাবারের ব্যবস্থা করতে বললাম। সে শুধু ইশারায় সামনের মিষ্টির দোকানটা দেখিয়ে দিলো। এ'মিষ্টির দোকানের এক মজার ইতিহাস রয়েছে। দোকানের মালিকের দুটো দোকান। একটা হচ্ছে নবাবপুর মেইন রোড়ে রথখোলায় আর একটা এই তাঁতি বাজারে। এতে মালিকের খুবই সুবিধা কেননা নবাবপুরের দোকানে নগদ পয়সায় টাটকা মিষ্টি বিক্রী হয়। আর বাসী মিষ্টির জন্য এই তাঁতিবাজারের দোকান। এতে মালিকের বাসী মিষ্টিগুলো অপচয়ের হাত থেকে রেহাই পায়। তাঁতি বাজারে বাকী খদ্দেরদের মধ্যে বাসী মিষ্টি বিক্রী করতে কোন অসুবিধাই হয় না। আর বাকী টাকাটা যেটুকু আদায় করা সম্ভব হয়, সেটুকুই তাঁর অতিরিক্ত মুনাফা।

একটা স্লিপ লিখে সুলতানকে পাঠিয়ে এহেন মিষ্টির দোকান থেকে চারটা মিষ্টি আনিয়ে নিলাম। সাধারণ মিষ্টিগুলোর সাইজ থেকে এ মিষ্টির সাইজ বেশ। চমচম দেখে মনটা ভরে গেলো। কিন্তু মুখে দেয়ার সংগে সংগে বুঝতে পারলাম বাসী হওয়ার জন্য চমচমের আকার অনেকটা বড় হয়ে গেছে। ক্ষুধায় পেটটা চন্‌চন্‌ করছিলো। তাই গোলাপজলের গন্ধওয়ালা চুকা-মিঠা চমচম গোগ্রাসে গিললাম। সেদিন থেকে হাতে টাকা না আসা পর্যন্ত তিনবেলা এ বাসী মিষ্টি খেয়েই আমার দিন কাটতে লাগলো।

মেসের সাহেবদের যখন এ অবস্থা তখন সুলতান কিভাবে দিন কাটায় তা জানবার জন্য মনটা অস্থির হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত একদিন সুলতানের 'ট্রেড সিক্রেট' আবিষ্কার করলাম। মফস্বল অঞ্চল থেকে প্রায়ই 'অগত্যা'র বার্ষিক গ্রাহক হবার জন্য 'মানি অর্ডারে' টাকা আসতো। অগত্যা কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতির সুযোগে আমাদের 'স্বনামধন্য' সুলতান তা দিব্বি 'রিসিভ' করে পকেটস্থ করতো। অবশ্য একাজের সুবিধার জন্য সুলতানের পকেটে সব সময়েই অগত্যার ম্যানেজারের সীল মজুত থাকতো। আর নিজের একটা পাকা দস্তখতও ছিল। তাই পোস্টাল পিয়নও কোনদিন সুলতানকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারতো না।

অগত্যার মালিকদের সংগে উঠাবসা করতে করতেই বোধহয় সুলতানের প্রকৃতিটা খানিকটা দুর্ধর্ষ হয়ে উঠলো। একদিনের ঘটনার কথা আমি আজও পর্যন্ত ভুলতে পারিনি। বিকেল বেলা অফিস থেকে ফিরেই দেখি আমাদের সুলতান একটা পোষ্টকার্ড বুকে চেপে হাউমাউ করে কাঁদছে আর লোহানী সাহেব তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছেন। বহু কষ্টে ঘটনাটা জানতে পারলাম। বেচারা সুলতানের দেশ থেকে চিঠি এসেছে। 'তোমার আম্মা

এখন মরনের মুখে যদি শেষবারের মত দেখিতে চাও, পত্র পাওয়া মাত্র চলিয়া আস।' এরপর আমিও সুলতানের হয়ে ওকালতি করলাম। লোহানী সাহেব বললেন, ছুটি তো দেয়া যায়। কিন্তু ওর মাইনের টাকা দেই কোত্থেকে ? তখন খেয়াল হলো সুলতানের তিন মাসের মাইনে বাকী পড়েছে। অনেক ভাবনা চিন্তার পর আমরা দুজনে সুলতানের মাইনের টাকা জোগাড় করতে বেরোলাম। ঘন্টা দু'য়েক পরে সন্ধ্যা সাতটার সময় আমরা গোটা চল্লিশেক টাকা জোগাড় করে আনলাম।

তাঁতিবাজারে ফিরে এসে দেখলাম সুলতান তখনও কাঁদছে। ওর মনে দৃঢ় ধারণা তার জন্মদাত্রী আর ইহজগতে নেই। আমরা আবার ওকে সান্তনা দিয়ে চল্লিশটাকা বুঝিয়ে দিলাম আর তাকে বোললাম দেশে যেয়েই যেন তার মার অবস্থা লিখে জানায়। এমন কি এজন্য দু'টো পোষ্টকার্ডও তাকে দেয়া হলো। সুলতান চোখ মুছতে মুছতে তার টিনের সুটকেসটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো। এমন সময় লোহানী সাহেব সুলতানকে বললেন, দেখি আরেকবার তোর ভাইয়ের লেখা পোষ্টকার্ডটা।' সুলতানও তার সার্টের বুক পকেট থেকে চিঠিটা বের করে দিলো। এরপর যা' ঘটলো তার হুবহু বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। কথা নেই, বার্তা নেই লোহানী সাহেব একটা হিংস্র ব্যাঘ্রের মতো সুলতানের উপর ঝাপিয়ে পড়লো আর অবিরামভাবে কীলঘুষি মেরে চললো। আমি অনেক কষ্টে লোহানী সাহেবকে বিরত করলাম। লোহানী সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে চীৎকার করতে লাগলেন। 'বেটা বেঈমান মিথ্যুক।' আমি তখনও ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

এদিকে রাস্তার কিছুলোকও ব্যাপারটা জানবার জন্য জমায়েত হয়েছে। অনেক কষ্টে আসল ঘটনাটা উদ্ধার করলাম। পোষ্টকার্ডের হাতের লেখাটা আমাদের শ্রীমান সুলতানেরই। প্রথম থেকেই মনে সন্দেহ হওয়ায় লোহানী সাহেবই আবিষ্কারটুকু করেছেন।

দ্বিতীয় দফায় মার শুরু হবার সংগে সংগে সুলতান সবকিছু স্বীকার করলো। তিনমাসের বেতন বাকী পড়াতেই নাকি সে এই পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। দিনকয়েক আগে নিজেকে উদ্দেশ্য করে এ পোষ্টকার্ডটা লিখে ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনে গিয়েছিলো। সেখানে লাকসামগামী একজন যাত্রী পেয়ে তাকে লাকসাম থেকে এ পোষ্টকার্ডটা পোষ্ট করার জন্য অনুরোধ করেছিলো। এতেই যে প্ল্যান মোতাবেক কাজ হবে তা' সুলতান নিজেও বুঝতে পারেনি। কিন্তু বেচারার শেষরক্ষাটা আর হলো কই?

এ ঘটনার কিছুদিন পরেই এহেন সুলতান বাংলা বাজারের বুক্‌স এ্যাণ্ড বুক্‌স দোকানের সেলসম্যান কাম পিয়ন নিযুক্ত হলো। লোহানী আর মুস্তাফা সাহেব দু'জনে মিলে এ দোকান দিয়েছিলো। তখনকার দিনে প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রেতা হিসাবে বুক্‌স এ্যাণ্ড বুক্‌স আর 'পুঁথিপত্র' এ দুটো নাম করেছিলো। সুলতানের মতো লোক থাকার জন্যই বুক্‌স এ্যাণ্ড বুক্‌স ক্রেতামহলে দেদার বাকীতে ব্যবসা শুরু করলো। অফটাইমে সুলতান তার ছোট নোটবই-এ বাকীতে বই কিনবার টাকা দেয়ার তারিখটা লিখে রাখতো। ঠিক সময়মত টাকা না পেলে যমদূতের মতো তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হতো। দু'তিন দফায় সময় মতো তাগিদ দিলেই টাকা আদায় হয়ে যেতো। কিন্তু একজনের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা দিলো। সুলতানের মতো ছেলেও এ ভদ্রলোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে ঘেমে উঠলো। অবশ্য বইগুলো ভদ্রলোককে একরকম জোর করেই গছানো হয়েছিলো। সুলতান উপায়ন্তবিহীন অবস্থায় একদিন রাত বারোটায় সে ভদ্রলোকের বাসার বারান্দায় যেয়ে শুয়ে থাকলো। আল্লার রাত পোহাবার সংগে সংগে ভদ্রলোক বাসীমুখে দরজা খুলেই বারান্দার মেঝেতে সুলতানকে একটা বিছানার উপর বসে থাকতে দেখে নিজেকে আর বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। আর সুলতানও এ কাকডাকা

সকালে ভদ্রলোকের মোলাকাত পেয়ে সাদা দাঁতগুলো বের করে হেসে উঠলো। এরপর দু'জনের মধ্যে আর কোনো কথাবার্তাই হলোনা। ভদ্রলোক তক্ষুনি পাওনা মিটিয়ে দিলেন। কিন্তু ইনি আর কোনদিনই বুক্‌স এ্যাণ্ড বুক্‌স এ পদার্পণ করেননি।

একদিন বিকেলে অফিস থেকে এসে দেখি বাইরের ঘরের টেবিলে ডিক্‌শনারী মাথায় দিয়ে এক ভদ্রলোক ঘুমাচ্ছেন। মলিন কেশ আর শ্রান্ত চেহারার এ ভদ্রলোককে আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়লোনা। পরে আলাপ হলো ইনিই হচ্ছেন খালেদ চৌধুরী। এক সময় ইনি ঢাকা আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বেশী দিন আর্ট কলেজে অধ্যয়ন তার মনঃপূত হয়নি। তাই হঠাৎ কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। এরপর তিনি ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক বই পড়তে শুরু করলেন। এ'সময় ঢাকার প্রতিটি পাবলিক লাইব্রেরীতেই জনাব চৌধুরীর যাতায়াত ছিল। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। কিন্তু আর্ট স্কুলে যাতায়াত বন্ধ করায় তাঁর অভিভাবকরা বেশ বিরক্ত হয়ে ছিলেন। ফলে তাঁর মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেলো। অবশ্য ইসলামপুরের একটা হোটেলে তাঁর দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। এ'হোটেলে খাওয়ার পয়সাটা অভিভাবকরা দিতে সম্মত হলেন। নয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী ঠিক হলো যে খালেদ সাহেব এ হোটেল থেকে সারা মাস ইচ্ছেমত খাওয়া দাওয়া করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর হাতে নগদ পয়সা দেয়া হবে না। এতে করে তার এক নতুন বিপদ দেখা দিল। কেননা বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি ধুমপানে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছেন। এ'সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি এক অদ্ভুত পথ অবলম্বন করলেন। যখন তখন বন্ধু বান্ধবদের ডেকে ইসলামপুরের সেই হোটেলে বিরায়ানী পোলাও খাওয়াতে শুরু করলেন আর খাওয়া শেষ হবার পর কয়েক শলা সিগারেট কিনে দেয়ার অনুরোধ

করতেন। পরে বন্ধুরাই তাঁকে পাল্টে মোরগ পোলাও খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। আর খাবার পর গোটা চার পাঁচেক সিগারেট খালেদকে দিয়ে দিব্বি বিদায় নিতো। ফলে প্রথম মাসেই হোটেলে একটা অবিশ্বাস্য রকমের বিল হলো। এতে অভিভাবকরা আতঙ্কিত হয়ে খালেদ সাহেবকে হুঁশিয়ার করে দিলেন। কিন্তু পরের মাসে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। শেষ পর্যন্ত হোটেলের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। আর খালেদের সংগে তার বাড়ীর সম্পর্ক একরকম বলতে গেলে ছিন্ন হয়ে গেলো। এতে খালেদের বিশেষ ক্ষতি হলো বলে মনে হলোনা। তিনি 'যেখানে রাত সেখানেই কাত'নীতি অবলম্বন করলেন।

বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে 'অগত্যা' সম্পাদক ফজলে লোহানী সাহেব খালেদ চৌধুরীকে খুবই ভালোবাসতেন এবং প্রায়ই তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। এমনকি গায়ের জামা কাপড় ধোবার জন্য লণ্ড্রীর পয়সা পর্যন্ত দিতেন। এহেন খালেদ চৌধুরীর সংগে যখন আমার পরিচয় হলো তখন তিনি চার্বাক দর্শন সম্পর্কে পড়াশুনা করছিলেন। সেদিন ভদ্রলোকের কথাবার্তায় আমিও চমৎকৃত হয়ে ছিলাম। কিন্তু তার একটা বিশেষ ব্যাপার আমরা অনুমোদন করতে পারলাম না। দুপুরে আমাদের তিন জনেরই অনুপস্থিতিতে চৌধুরী সাহেব যে আমাদের শ্রীমান সুলতানকে মার্ক্সীয় দর্শনে দীক্ষিত করছিলেন, সেটা আমরা মোটেই আঁচ করতে পারিনি। যখন এ ব্যাপারটা প্রকাশ পেলো তখন সুলতান 'সারপ্লাস লেবার থিওরী' সম্পর্কে সবক নিচ্ছিলো। খালেদ চৌধরী তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তার মাসিক মাইনে একশ টাকা হওয়া দরকার। অথচ তাকে সাহেবরা বিশ টাকা দিয়ে প্রতিমাসে আশি টাকা শোষণ করছে এটা সুলতানেরই রক্ত পানি করে কামাই করা টাকা। সমস্ত ব্যাপার শুনে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। আর লক্ষ্য করে

দেখলাম যে, কাজ কর্মে শ্রীমান সুলতানের আগের সেই উৎসাহ নেই। সব সময়েই একটা মনমরা ভাব। সুলতানের মনে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, তাকে আমরা প্রতিমাসে আশি টাকা করে ঠকাচ্ছি। বহুকষ্টে সুলতানকে বুঝানো হলো যে, মানুষের হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান নয়। আর খালেদ চৌধুরীকে আমাদের অনুপস্থিতিতে অফিসে আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হলো। তবু দেখতাম লোহানী সাহেব গোপনে খালেদ চৌধুরীকে সাহায্য করছেন।

তখনকার দিনে ইসলামপুরের সওগাত প্রেসে ঢাকার প্রগতিশীল লেখকদের একটা বিরাট আড্ডা ছিলো। সওগাত সম্পাদক ও প্রেসের মালিক জনাব নাসিরউদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এটা সম্ভব হয়েছিলো। এই সওগাত প্রেসেই পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের নিয়মিত বৈঠক হতো। এ সব সাহিত্য সভায় খালেদ চৌধুরীই প্রধান সমালোচক হিসাবে বক্তৃতা করতেন। এ সময় সওগাত প্রেসে গেলে দু'চারজন কবি সাহিত্যিক বা সাংবাদিকের দেখা পাওয়া যেতো, তাই সওগাত প্রেসের আরেক নাম দেয়া হয়েছিলো 'চিন্তা গুহা।' চিন্তা গুহার ব্যাপারই ছিলো সব অদ্ভুত রকমের। মুকুল হলে রাজকাপুর নার্গিস অভিনীত 'আওয়ারা' ছবি দেখে এক আধুনিক কবি এক কবিতা লিখে বসলেন। দুটো লাইন এখনও আমার মনে গাঁথা রয়েছে।

বসে আছি চিন্তা-গুহায়
চিতা ভস্ম মেখে,
মন নয়, প্রাণ নয়,
'আওয়ারা' আকাশ।

সওগাত প্রেসে আড্ডা জমাবার আর একটা কারণ ছিল কবি হাসান হাফিজুর রহমান। তখন মাসিক সওগাত পুনঃ প্রকাশিত হয়নি। তবে সওগাত প্রেস থেকে প্রকাশিত মেয়েদের

জন্য সচিত্র সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকার কাটতি বেশ বাড়তে শুরু করেছে। আমাদের বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান এই সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকায় চাকরী করতেন। তাই হাসান সাহেবের খোঁজে আমরা সবাই যেয়ে সওগাত প্রেসে হাজির হতাম। আর প্রায়ই সম্মিলিতভাবে দস্তখত করে আবেদন পত্র পাঠিয়ে নাসির সাহেবের পয়সায় চা বিস্কুট খাওয়ার ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু নাসির সাহেবও কম চালাক ছিলেন না। কলকাতায় কবি নজরুল থেকে শুরু করে কবি আব্দুল কাদির ও পবিত্র গাঙ্গুলী পর্যন্ত কবি সাহিত্যিকদের সংগে এই নাসির সাহেব উঠাবসা করেছেন। শুধু তাই-ই নয় এই সব কবি সাহিত্যিকরা বিভাগ পূর্বযুগে কলকাতার সওগাত অফিসেই আড্ডা জমাতেন আর নাসির সাহেবও ঐ আড্ডার পৃষ্ঠপোষকতা করে এদের কাছ থেকে লেখা আদায় করতেন।

একদিন আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ইসলামপুরের সওগাত প্রেসে পাশের ঘর থেকে নাসির সাহেবকে একটা চিঠি লিখলাম।

'শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

আমরা কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক আর সাংবাদিক ক্ষুধার্ত অবস্থায় পাশের ঘরে উপবিষ্ট রয়েছি। জলপানির ব্যবস্থা করলে বিশেষ বাধিত হব।

বিনীত

একটু পরেই দেখলাম প্রেসের ফোরম্যান রওশন এক গাদা প্রুফ এনে আমাদের সামনে দিয়ে বললো, 'আপনারা এগুলো দেখতে থাকুন, আমি চা-বিস্কুট নিয়ে আসছি।' উপায়ন্তবিহীন অবস্থায় আমরা প্রুফ দেখতে লাগলাম।

একদিনের ঘটনার কথা আমার এখনও মনে রয়েছে। টাকা পয়সার অভাবের জন্যই আমরা মাঝে মাঝে সিনেমা দেখার উদ্দেশ্যে 'সওগাত প্রেস' থেকে কিছু কাগজ সরিয়ে বিক্রী করতাম।

সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস। নাসির সাহেব তাঁর টেবিলে একমনে বসে কাজ করছিলেন। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে নাসির সাহেব মাথা তুললেই টেবিল থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটা দেখতে পেতেন। সেদিন সিনেমা দেখার জন্য আমাদের খুব খায়েশ হলো। তাই আমাদেরই একজনের কোটের নীচে সওগাত প্রেসের কিছু কাগজ দিয়ে প্রথমে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হলো আর আমরাও কোমরে কাগজ গুঁজে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরী হলাম। এমন সময় নাসির সাহেব মাথা তুলে আমাদের বন্ধুবরকে চলে যেতে দেখে ডেকে পাঠালেন। বেচারা এসে দাঁড়াতেই নাসির সাহেব একটু মুচকি হাসি দিয়ে বললেন। 'তুমি তো এতো মোটা ছিলেনা! যাও পাশের ঘরে যেয়ে আগের মত পাতলা হয়ে এসো।' বেচারার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। আর এদিকে আমরা যে ক'জনা পাশের ঘরে মোটা হয়ে যাবার জন্য সুযোগ খুঁজতে ছিলাম, বন্ধুবরের অবস্থা দেখে তারা সংগে সংগে পাতলা হয়ে ধীরে পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলাম। নাসির সাহেব তার টেবিল থেকে মাথাটা তুলে আমাদের স্বাভাবিক দেহ দেখে আর কিছুই বললেন না।

দিনকাল আমার ভালই কাটছিলো। এমন সময় 'বিনামেঘে বজ্রপাতের মত' বগুড়া থেকে আব্বার বিরাট একটা চিঠি এসে হাজির হলো। এ চিঠির সারমর্ম হচ্ছে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চিঠি পড়বার পর আমি 'মূক-বধির' স্কুলের হেড মাষ্টার হয়ে গেলাম। কেননা আমার বড় আরও দু'ভাইয়ের তখন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। অথচ আমাকে ঠেলে যুপকাষ্ঠে ফেলার কারণ কী? চিন্তায় আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেলো।

বিয়ের খবরে মহাচিন্তায় পড়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত লটারী করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঐ লটারীতেও আমি পরাজিত হলাম। তাই আব্বার অনুগত সন্তান হিসাবে ১৯৫৩ সালে জুন মাসের

পহেলা সপ্তাহে বন্ধু-বান্ধব কাউকে কিছু না জানিয়ে বগুড়ায় চলে গেলাম। সংবাদ অফিসে ছুটির একটা দরখাস্ত ডাকে পাঠিয়ে ঢাকা থেকে উধাও হয়ে গেলাম। মনে পড়লো মাসতিনেক আগে ভাষা আন্দোলনের প্রথম বার্ষিকীতে আব্বা আমাদের তিন ভাইকে টেলিগ্রাম করে বগুড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কেননা তার ধারণা হয়েছিল যে ভাষা আন্দোলনের প্রথম বার্ষিকীতে কিছু ছাত্র ধড় পাকড় হতে পারে। এছাড়া বড় তিন ছেলেকে বিয়ের ফাস পড়াবার জন্যও তিনি তলে তলে চেষ্টা করছিলেন। সেবার বগুড়ায় আব্বা আম্মা তাদের বড় তিন ছেলেকে নিয়ে একটা পারিবারিক কনফারেন্সে বসেছিলেন। সেই কনফারেন্সেই আব্বা নিজের মনোভাব পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে বললেন 'এখন তোরা কে কেমন মেয়ে পছন্দ করবি আমাকে জানিয়ে যা।' বড়ভাই সাফঁ বললেন যে তিনি উচ্চশিক্ষিতা ছাড়া বিয়েই করবেন না। মেজোভাই বললেন মেয়ে যে রকম হোক তাঁর আপত্তি নেই তবে শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে। আমি দুরু দুরু বক্ষে আর কম্পিত কণ্ঠে বললাম জীবনে আপনাদের অনেক কষ্টই দিয়েছি তাই বিয়ের ব্যাপারটা আপনাদের উপরই ছেড়ে দিলাম আপনাদের পছন্দই আমার পছন্দ।' এতেই আমার কাল হলো। বড় ভাইয়ের উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে খুঁজতে সময়ের প্রয়োজন। মেজো ভাইয়ের পয়সাওয়ালা শ্বশুর যোগাড় করাটাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। শুধু আমার জন্য একটা পছন্দ সই কনে খুঁজে বের করার ব্যাপারটাই আব্বার খুব সহজ মনে হলো। তাই মাত্র তিনমাসের মধ্যেই ব্যবস্থাটা একেবারে পাকাপোক্ত করে ফেললেন। বগুড়ায় যখন যেয়ে হাজির হলাম তখন এ বিয়ে ভাংগার কোন সুযোগ সম্ভাবনাই দেখলাম না। শুধু দেখলাম একই দিনে আমার বোনেরও বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। দুপুর বেলায় বোনের বিয়ে দিয়ে সন্ধ্যায় নিজে বিয়ে করতে গেলাম। বরযাত্রী রওয়ানা হবার

আগে বড় দু'ভাইয়ের কাছে অনুমতির জন্য হাজির হলাম। দু'জনেই এক সঙ্গে বলে উঠলো 'যা যা ফাজিল কোথাকার। আবার পারমিশন নিতে এসেছিস। আমি ওদের সামনে থেকে কেটে পড়লাম। সেদিনটা ছিল ১৯৫৩ সালের ১২ই জুন। বিয়ের তিন দিনের মাথায় ঢাকা থেকে একটা রেজিষ্ট্রি চিঠি এসে হাজির হলো। দৈনিক সংবাদ থেকে আমার চাকুরীটা চলে গেছে। আব্বা আম্মা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমি কিন্তু নির্বিকার ভাবে হপ্তাখানেক কাটিয়ে দিলাম। ঢাকায় ফিরে এসে সোজা ইকবাল হলে উঠলাম। কেননা এর মধ্যেই লোহানী সাহেব ১০৫ তাঁতি বাজারের পজেশন এক দিল্লীওয়ালার কাছে বিক্রী করে দিয়েছেন। এদিকে বিয়ের সময় যে কটা আংটি উপহার পেয়েছিলাম সেগুলো বিক্রী করে ইকবাল হলে দিব্বি আড্ডা মেরে কাটাতে লাগলাম। মাস কয়েক পরে ডিসেম্বর মাসে শুনতে পেলাম সাপ্তাহিক ইত্তেফাক কাগজটা দৈনিক হিসাবে বের হচ্ছে। তাই কিছু লোকের প্রয়োজন। ইত্তেফাক আওয়ামী মুসলিম লীগের সমর্থক। এক সময় ছাত্র লীগের পাণ্ডাগিরি করেছিলাম। সে হিসাবেই একদিন নয় নম্বর হাটখোলা রোড়ে দৈনিক ইত্তেফাকের হবু সম্পাদক মানিক মিয়ার কাছে হাজির হলাম। দৈনিক 'আমার দেশ' আর সাপ্তাহিক 'নও বেলালে'র অভিজ্ঞতার কথা বলায় তিনি আমাকে সাব এডিটরের চাকুরী দিতে রাজী হলেন। কিন্তু মাইনে নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধলো। কর্তৃপক্ষ সাব-এডিটরদের বেতন মাসে পঁচাত্তর টাকা হিসাবে ধার্য করেছেন। নিউজ এডিটরের বেতন দেড়শ আর চীপ রিপোর্টার মূল বেতন পঁচাত্তরের সঙ্গে ঘোরাঘুরি ভাতা পঞ্চাশ টাকা। তৎকালীন লেবার ফেডারেশনের আব্দুল কাদের দৈনিক ইত্তেফাকে প্রথম বার্তা সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হলেন। তিনি আমাকে অনেক করে বুঝিয়ে রাজী করলেন। শুধু মানিক মিয়া

বললেন, কাগজটা যদি দাড়িয়ে যায়, তবে এটা কো অপারেটিভ ভিত্তিতেই রান করা হবে। তাই আপনাদের এখন একটু কষ্ট করেই কাজ করতে হবে। তবে মাইনের টাকাটা আমি সময় মত দেবো।

১৯৫৩ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে যোগ দিলাম। সাব-এডিটর হিসাবে সেদিন খুলনার হাফিজ, বরিশালের নুরুল ইসলাম আর বর্তমানে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের বাংলার অধ্যাপক বদরুল হাসানকে পেয়েছিলাম। এছাড়া চীফ রিপোর্টার হিসাবে কবি ফয়েজ আহমদ, সম্পাদকীয় বিভাগে তৎকালীন ছাত্র-লীগের আব্দুল আওয়াল আর জেনারেল বিভাগে প্রাক্তন ছাত্রলীগ স্বেচ্ছা সেবক প্রধান ওয়াদুদ পাটোয়ারীকে দেখতে পেলাম। মোট চারজন সাব-এডিটর, একজন রির্পোটার একজন নিউজ এডিটর, আর একজন এসিষ্ট্যান্ট এডিটর এ সাতজনকে নিয়েই তিপান্ন সালের ২৫শে ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো। আজ থেকে প্রায় সতেরো বছর আগে যে দৈনিক প্রকাশিত হয়েছিল, তখন আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি কালে এটাই ঢাকায় অন্যতম শক্তিশালী বাংলা দৈনিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। নয় নম্বর হাটখোলা রোডের প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এই প্রেসেরই এক কোনায় ইত্তেফাক অফিসের স্থান নির্দিষ্ট হলো। প্রথম দিনের কাগজ বের করতে যেয়ে শুনলাম, যে ব্যানার হেডিং এ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবে সে হেডিংটা লালকালিতে আগে থেকেই ছেপে রাখা হয়েছে। হেডিংটা ছিল 'মুসলিম লীগের নাভিশ্বাস।' এখন এ হেডিং এর সংগে খাপ খাইয়ে রির্পোট লিখতে হবে। চীফ রির্পোটার ফয়েজ আহমদের উপর এ রির্পোট লেখার ভার পড়লো। অবশ্য মানিক ভাই অনেকগুলো পয়েন্ট বাতলে দিলেন। চার পৃষ্ঠার দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত হবার দিন সমস্ত রাত ধরে আমরা

কল্পনা জেগে কাজ করে গেলাম। পরদিন নিজেদের সৃষ্টি দেখে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে পড়লাম। সেদিন পল্টন ময়দানে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এক জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। এ জনসভায় বিপুল সংখ্যক ইত্তেফাক বিক্রী হলো।

ইত্তেফাক প্রকাশিত হবার পর আমরা দৈনিক আজাদকেই আমাদের লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করতাম। কেননা দৈনিক আজাদ তখন একচ্ছত্রভাবে তার 'রাজত্ব' অব্যাহত রেখেছে। 'আজাদের অঙ্গুলী হেলনে তখনও ক্ষমতাসীন সরকারের আসন টলমল হয়ে ওঠে। সমগ্র পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের উপর আজাদের প্রভাব অপরিসীম। কেন জানিনা তখন দৈনিক আজাদের কথা মনে হলেই হিমালয় পর্বতের কথা মনে হতো। ভাবতাম দৈনিক ইত্তেফাক কি কোনোদিন আজাদের এ অবস্থায় যেতে পারবে? কোনোদিন কি ইত্তেফাকের প্রচার সংখ্যা আজাদকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে? আন্তরিকতা অধ্যবসায় আর কঠোর পরিশ্রমে সবই সম্ভব। শুধু পূর্ববাংলা কেন উপমহাদেশের সংবাদ পত্র জগতে বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ইত্তেফাক আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত হবার মাত্র মাস তিনেকের মধ্যে পূর্ব বাংলার প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হলো। এদিকে পূর্ববঙ্গ সরকারের তৎকালীন এডভোকেট জেনারেল জনাব এ, কে, ফজলুল হক পদত্যাগ করে নিজস্ব কৃষক শ্রমিক পার্টি গড়ে তুললেন। আর আওয়ামী মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে এক মরণ পণ সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। প্রদেশের তরুণ সমাজ 'হক-ভাসানী শহীদ হও' শ্লোগানে ফেটে পড়ল। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য একটা

বিরোধী দলীয় জোট গড়বার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হলো। এরই চরম পরিনতি হিসাবে সেদিন ঐতিহাসিক 'যুক্তফ্রণ্টে'র সৃষ্টি হলো। বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে ক্ষমতাসীন দলকে পরাজিত করার অমোঘ অস্ত্র এ যুক্তফ্রণ্ট। পরবর্তীকালে এ অস্ত্রে পার্শ্ববর্তী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু 'যুক্তফ্রণ্ট' গড়ার মুস্কিলই হচ্ছে, উদ্দেশ্য হাছিল হবার সংগে সংগেই চরম অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি। পূর্ব বাংলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

যাহোক আজকের দিনে এটা আশ্চর্য্য মনে হলেও দৈনিক ইত্তেফাকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। আর এর মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান। দৈনিক ইত্তেফাকের মাস্তুলে বহুদিন পর্যন্ত পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মওলানা ভাসানীর নাম প্রকাশিত হতো। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কোন্দলে মওলানা সাহেবের নাম ১৯৫৪ সালের ১৪ই মে ইত্তেফাকের মাস্তুল থেকে অপসারিত হয়। আর দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর মওলানা সাহেবের একটা বাণী শোভা বর্ধন করতে থাকে। মরহুম এ, কে, ফজলুল হক পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হবার সপ্তাহ কয়েকের মধ্যেই মানিক ভাই দৈনিক ইত্তেফাকের মুদ্রাকর ও প্রকাশকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে, সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। বহু আলাপ আলোচনার পরই এ সিদ্ধান্ত করা হয়েছিলো।

দৈনিক ইত্তেফাক মানেই মানিক মিয়া আর মানিক মিয়া মানেই ইত্তেফাক। একটাকে ছেড়ে আর একটার কথা চিন্তাই করা যায় না। মানিক ভাই শয়নে স্বপনে সব সময়েই শুধু ইত্তেফাকের কথাই চিন্তা করতেন। এছাড়া দিনের অধিকাংশ সময়ই ইত্তেফাক অফিসেই কাটাতেন। অন্যদিকে আমরাও একটা

"মিশনারী জিল" নিয়ে কাগজটাকে দাঁড় করাবার জন্য লেগে পড়লাম। দিনে 'এক্সট্রার'র কোন সিসটেমই ছিলো না। এটা অনেকটা ভাগ্যকুল—তাড়পাশার হোটেল গুলোতে পেটচুক্তির মতো ব্যাপার ছিল। তাই কাগজ না বেরুনো পর্যন্ত আমাদের কাজের কোন বিরতি ছিলনা। আবার কাগজ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই পরদিনের কাগজের জন্য প্রস্তুতি নিতে হতো। তাই প্রতিদিন নাইট ডিউটি দেয়ার পর হলে ফিরে যাওয়ার পর্বটা বন্ধ করে দিলাম। দিব্বি খবরের কাগজের বাণ্ডিল মাথায় দিয়ে টেবিলের উপর শোয়ার ব্যাপারটা অভ্যাস করে নিলাম।

আমি ছিলাম 'মওলানা ভাসানী বিশারদ'। অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী মফস্বলের যে কোন জায়গায় বক্তৃতা দিলেই সেটা লেখার দায়িত্ব আমার ছিল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। পয়সা খরচ করে প্রেস টেলিগ্রাম করার সামর্থ্য না থাকায় আমরা ইত্তেফাকে এক নতুন নিয়ম চালু করেছিলাম। এতে মওলানা ভাসানী কিম্বা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংগে সফররত কোন রাজনৈতিক কর্মী মফস্বল থেকে জনসভার স্থান, তারিখ সভাপতির নাম আর আনুমানিক লোকসংখ্যার একটা সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রাম ইত্তেফাক অফিসে পাঠিয়ে দিতো। আমরা এ টেলিগ্রাম থেকেই চার কলাম নিউজ বানিয়ে ফেলতাম। অবশ্য মোটামোটিভাবে আমার জানাই থাকতো যে, মওলানা সাহেব কী ধরনের বক্তৃতা দেবেন। তাই ঢাকায় ইত্তেফাক অফিসে বসে মওলানার বক্তৃতা লিখতে আমার বিশেষ অসুবিধে হতো না।

চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাকালে হক-ভাসানী শহীদ, এ-তিন নেতা একত্রে যে ক'টি জনসভায় বক্তৃতা করে ছিলেন তার মধ্যে নান্দাইলের জনসভা অন্যতম। নান্দাইলের জনসভার পরই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, এ কেন্দ্র থেকে

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীনের জয়লাভ সুদূর পরাহত। কিন্তু তখন কি কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করতে পেরেছিলো যে, জনাব নুরুল আমীনের মত প্রতাপশালী লোককে পরাজিত করার পরবর্তী যুগে জনাব খালেক নেওয়াজ খান নিজেই আইয়ুব-মোনেমের মুসলিম লীগে যোগ দান করবেন। আর নুরুল আমীন মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করবেন? রাজনীতির অপার মহিমায় এ সবই সম্ভব। কিন্তু তবুও কি পূর্ব বাংলার জনসাধারণ জনাব নুরুল আমীনকে ক্ষমা করতে পেরেছে? সেটা আজও পর্যন্ত একটা বিরাট প্রশ্নই রয়ে গেলো। ভাষা আন্দোলনের গুলি বর্ষণের ঘটনা তো আঠারো বছর আগে ঘটে গেছে। আজ যেসব ছেলেমেয়ের দল বাংলাদেশের শিক্ষায়তনগুলো কলকোলাহলে মাতোয়ারা করে রেখেছে, তাদের অধিকাংশই তো সেদিন মাতৃজঠরে? এই না বলে পাবলিক 'মেমরী' খুবই 'শ্যর্ট'।

চুয়ান্ন সালের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাশীল মুসলিম লীগ সরকারকে পদচ্যুত করা ছাড়া আর কিছুই অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ঐ সময় যে সব শ্লোগান দিয়ে যুক্তফ্রণ্টকে জয়যুক্ত করা হয়েছিলো, তা আজকের দিনে খুবই হাস্যকর মনে হলেও তখন এসবের গুরুত্ব খুবই বেশী ছিলো। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউসকে বাংলা একাডেমীতে পরিণত করতে হবে কিংবা শাহবাগ হোটেল আর নিউমার্কেট তৈরী করে জনাব নুরুল আমীন সরকারী অর্থের অপচয় করছেন বলে শত শত জনসভায় বক্তৃতা দেয়া হয়েছিলো—এমন কী শাহবাগ হোটেলের উপর একটা বিদ্রুপাত্মক জারীগান পর্যন্ত তৈরী করা হয়েছিলো।

এ সময় নান্দাইলে হক-ভাসানী শহীদের জনসভা শেষ হবার পর একটা হাতীর পায়ের নীচে জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু

হয়। সম্ভবত এক সংগে অসংখ্য সমাবেশ দেখে হাতীটা ভড়কে যেয়ে দৌড় দিয়েছিলো। আর যায় কোথায়? আমরা ইত্তেফাকে ব্যানার হেড লাইনে ছাপিয়ে দিলাম 'মুসলিম লীগের উন্মত্ত হস্তীর পদতলে যুক্তফ্রণ্ট কর্মীর শোচনীয় মৃত্যু।' অবশ্য এতে মিথ্যেরও কিছু নেই। কিন্তু বরিশালের ঘটনা সব কিছুকেই ছাড়িয়ে গেলো। মুসলিম লীগের নির্বাচনী সফর উপলক্ষে জনাব নুরুল আমীন বরিশালে যেয়ে হাজির হলেন। তিনি ঘাটে নামার সময় কালো পতাকা হাতে একদল লোক বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে সাংঘাতিক গোলযোগের সূত্রপাত হয়। এসময় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে গ্রীণ সার্ট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়েছিলো। তাই কালো পতাকা বিক্ষোভকারীদের উপর মুহূর্তে গ্রীন সার্ট দল ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওদিকে যুক্তফ্রণ্টের দলও আগে থেকে তৈরী ছিলো! তাই মারামারিটা কিছুক্ষণ সামনে সামনেই চললো। এরপর জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থনের দরুন গ্রীণ সার্ট দল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য হলো। কিন্তু এর মধ্যে একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলো। আমরা ঢাকায় বসে যতটুকু খবর সংগ্রহ করতে পারলাম তাতে বুঝলাম গায়ে সবুজ সার্ট থাকার জন্য মারমুখী জনতার পক্ষে মুসলিম লীগারদের সনাক্ত করতে কোন অসুবিধাই হয়নি। এমনি একজন গ্রীণ সার্টওয়ালা লোক জনতার হাতে ধরা পড়লে সম্ভবতঃ তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়।

এ খবরে দৈনিক ইত্তেফাক অফিসে বিষাদের কালোছায়া পড়ে গেলো। আমরা চিন্তা করলাম পরদিন মুসলিম লীগের সমর্থক দৈনিক আজাদ, দৈনিক সংবাদ আর মর্ণিং নিউজে এ সংবাদ ফলাও করে ছাপা হলে যুক্তফ্রণ্টের অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়বে। তাই ঠিক করা হলো যে বরিশালের নিহত এই লোককে যুক্তফ্রণ্টের কর্মী হিসাবে চালিয়ে দিতে হবে। সংগে

সংগে বরিশালে ট্রাংক কল বুক করা হলো। বহু কষ্টে খবর পাওয়া গেলো যে, নিহত মালেকের এক ভাই বরিশাল জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। আমরা আশার আলো দেখতে পেলাম। বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সেই সদস্যের কাছ থেকে একটা বিবৃতি ও ট্রাংক-কলে আদায় করা হলো তিনি 'গ্রীণসার্ট' গুণ্ডাদের কার্যকলাপের নিন্দা করলেন। পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকের ব্যানার হেড লাইনে বেরুলো, বরিশালের গ্রীণ সার্ট গুণ্ডাবাহিনীর হামলায় যুক্তফ্রণ্ট কর্মীর শাহাদাত বরণ। নিহত মালেক রাতারাতি শহীদ মালেকে পরিণত হলো। ওদিকে মুসলিম লীগের মুখপত্র দৈনিক সংবাদে বেরুলো 'যুক্তফ্রণ্ট গুণ্ডাদের হামলায় গ্রীণসার্ট কর্মী মালেক শহীদ। এমন কী সেদিন দৈনিক হেড পীসটা সরিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় নীচের দিকে ছাপানো হলো। এছাড়া লীগ-সমর্থক দৈনিক আজাদের যুক্তফ্রণ্টের প্রতি দোষারূপ করে নিউজ বেরুলো। ফলে জনসাধারণের মধ্যে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো। কিন্তু আমরা দৈনিক ইত্তেফাকে উপর্যুপরি কয়েকদিন পর্যন্ত এমন ভাবে 'শহীদ মালেক' সংক্রান্ত খবর ছাপতে লাগলাম যে অচিরেই সবাই শহীদ মালেককে যুক্তফ্রণ্ট কর্মী হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলো। শুধু তাই-ই নয় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রচার সংখ্যাও হু হু করে বাড়তে শুরু করলো আর গ্রীণসার্টের নিহত কর্মী মালেক শহীদ মালেকে পরিণত হলো।

চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ছুটো বক্তৃতার কথা আমার আজও পর্যন্ত হুবহু মনে রয়েছে। এসময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হালি হিসাবে লীগ নেতারা পূর্ব বাংলায় নির্বাচনী অভিযানে এসে হাজির হলেন। এদের মধ্যে মেসার্স কাইয়ুম খান, ফাতেমা জিন্না সরদার নিশতার সরদার ইব্রাহিম, মমতাজ দৌলতানা প্রমুখ অন্যতম। কিন্তু শত প্রচেষ্টাতেও কোন ফল

হলো না। বাংগালী মুসলমানরা সবাই লাইন করে যুক্তফ্রন্টের নৌকামার্কা বাক্সে ভোট দিলো। কেননা পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের ইসলাম বিপন্ন মার্কা বক্তৃতা অর্থনৈতিক সংগ্রামে বিপর্য্যস্ত বাঙ্গালীদের মনে সামান্যতম রেখাপাত করতে পারলো না। শেরে কাশ্মীর সরদার ইব্রাহীম পর্যন্ত পল্টন ময়দানে হাজার খানেক লোকের এক জনসভায় বললেন পণ্ডিত নেহেরু তুমনে হায়দ্রাবাদকো খা লিয়া হামলোগ কুচ নাহি কাহা ; তুমনে জুনাগড়কো খা লিয়া হামলোগ কুচ নাহি কাহা ; মগর তুমনে আভি কাশ্মীরকো খানেকো কোশেশ কর রাহা হো। তব ইয়ে সমঝো ; তোমহারা পেটমে এ্যাইসা ঘুষি মারেঙ্গে যেতনা খায়ে হুয়ে সব কুছ ওগাল দেওগে।"

আর এদিকে মরহুম শেরে বাংলা ফজলুল হক ফরিদপুরের জনসভায় বললেন চোরার পুত চোরারা—মুসলিম লীগে নাহি কইছে আমি পেরধান মন্ত্রী অইলে পাকিস্তানটারে বেইচ্চা ফেলামু। আরে চোরের পুত চোরেরা পাকিস্তানে কিছু রাখছোস যে বেইচ্যা দুইডা পয়সা পামু। পাটের দর নামাইছোস তিন টাহায়। দুনিয়ার মধ্যে কেউ কিনবো এ পাকিস্তান? এতো লোকেরে খাওয়াবো কেডায়?

চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনের কথা মনে হলে কেনো জানিনা লালাভাইয়ের কথা মনে পড়ে। লালাভাইয়ের ভালো নাম মুহম্মদ ইমাদুল্লা। বাড়ী বরিশাল। লালাভাইকে প্রথম ১৯৫০ সালে ঢাকায় ১১ নম্বর জয়নাগ রোডে ইকবাল হলে দেখেছিলাম। গলায় বিরাট একটা তাবিজ ঝুলিয়ে একটা কাবুলী পাজামা পড়ে সেদিন তিনি ব্যাডমিণ্টন খেলছিলেন। পরে আলাপ হলো। অদ্ভুত লোক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করতে এসেছেন কিন্তু বরিশালের আঞ্চলিক ভাষা তিনি ছাড়তে পারেননি। দিব্বি সবার সামনে বিনা সঙ্কোচে

বরিশালী টানে কথা বলে চলেছেন। এ সময় তিনি বরিশাল জেলা মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু ৫০ সালের জঘন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর ইনি মুসলিম লীগ পরিত্যাগ করেন। এরপর লালা ভাই অধুনালুপ্ত পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগে যোগদান করেন। পূর্ব পাকিস্তানে প্রগতিশীল আর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুবলীগের দান অপরিসীম। ভাষা আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে তখন যুবলীগের সুষ্ঠ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এ আন্দোলনকে সফলতার চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিলো। কুমিল্লার জনাব ওলী আহাদ তখন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জনাব আহাদ পরবর্তীকালে পর্যায় ক্রমে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলা জাতীয় লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। ভাষা আন্দোলনে জনাব আহাদ গ্রেফতার হবার পর লালা ভাই যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হন। আর এরই আমলে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ প্রদেশের সর্বত্র সম্প্রসারিত হয়। এছাড়া চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাকালে পূর্ব-পাকিস্তান যুব লীগের বিপুল কর্মী বাহিনী যুক্তফ্রন্টের প্রচার কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। যুবলীগের প্রাদেশিক কার্যালয় ৪৩ নং যোগীনগর থেকে এ কর্মী বাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করা হতো। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব তোয়াহা যোগীনগরের এ বাড়ীটার মালিক ছিলেন। বিনা ভাড়ায় তিনি নীচের তলার দুটো কামরা যুবলীগকে অফিস করার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর নিজে উপরের তলায় বসবাস করতেন। এ সময় জনাব তোয়াহা যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন পাওয়ায় নোয়াখালীতে কয়েক মাসের জন্য সপরিবারে চলে গেলেন।

এদিকে হঠাৎ করে আমার জীবনসঙ্গিনী ঢাকায় এসে হাজির হলেন। পঁচাত্তর টাকার সাবএডিটরের চাকুরীতে ঢাকায় স্বামী-স্ত্রী

বসবাস অসম্ভব ব্যাপার—এ কথা তাঁকে বুঝাতেই পারলাম না। শেষ পর্যন্ত তোয়াহা সাহেবের বাসাটা ব্যবহার করতে শুরু করলাম। দেখলাম বাসাটাতে সংসারের প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে। তাই নতুন সংসার পাতবার জন্য আমার আর কোনো খরচই করতে হলো না। তখন ঢাকায় চালের মন দশটাকা আর টাকায় চারটা ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। তরিতরকারী খুবই সস্তা। তাই একরকমভাবে সংসার চালিয়ে যেতে লাগলাম।

রমনার সেই সরু সরু পীচঢালা রাস্তা, হিজল ও মেহগনি গাছের সারি, মনমাতানো রংয়ের রক্ত করবীর ঝাড় আর সেই সার্পেন্টাইন লেকের পাড় সবকিছু মিলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাক্ষেত্র এ রমনায় বিকেলের দিকে দু'জনায় ঘুরে বেড়াতে এক অদ্ভুত মাদকতায় মনটা ভরে উঠতো। রমনায় সবুজের অপূর্ব সমারোহ আমাদের এক অদ্ভুত মায়াজালে বেঁধে ফেলেছিলো। তাই প্রায় প্রতিদিন বিকেলেই আমরা পায়ে হেঁটে রমনায় ঘুরে বেড়াতাম। কিন্তু সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। যান্ত্রিক সভ্যতা এসে যেনো সবকিছুকেই গ্রাস করে ফেলেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অঙ্গুলি হেলনে রমনার বিরাট বিরাট গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে। রাতারাতি নতুন নতুন দালান কোঠা গজিয়ে উঠেছে। এমন কি, রমনার চমৎকার ছোট ছোট পুকুরগুলো পর্যন্ত ভরাট করে 'অট্টালিকা বানানো' হচ্ছে। মাত্র ষোলো বছরের ব্যবধানে সবকিছুকেই যেনো ওলোট-পালট করে দিয়েছে। তবুও এখনও কোন বর্ষণসিক্ত সকালে কিংবা জোছনা-সন্ধ্যায় রিকশায় রমনা দিয়ে যাবার সময় কেনো জানিনা, বার বার করে শুধু ফেলে আসা দিনগুলোর কথাই মনে পড়ে। তবে কি সেই পঁচাত্তর টাকা মাইনের জীবনেই শান্তি ছিল বন্দী?

চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের সপ্তাহ কয়েক আগে যুক্তফ্রন্টের প্রায় পাঁচশ' প্রগতিশীল কর্মীকে আটক করবার জন্য গ্রেফতারী

পরোয়ানা বেরুলো। যুবলীগের কর্মীরা সব ঢাকা থেকে উধাও হয়ে গেলো। সবাই সাব্যস্ত করলো নির্বাচনের আগে আর পুলিশের হাতে ধরা দেয়া হবেনা। লালাভাই চলে গেলেন সুদূর বরিশালের গ্রামাঞ্চলে। তাই যুবলীগের সদর কার্যালয় একেবারে বন্ধই থাকলো। মফস্বল থেকে মাঝে মাঝে দু'একজন কর্মী এলে তাঁদের যুবলীগ অফিসের পিছনে একটা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে দিতাম।

সে রাতটার কথা আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে। মাঝরাতে দারুণ বৃষ্টি হলো। 'ইত্তেফাক' অফিসে নাইট ডিউটি দিয়ে রাত তিনটের পর পায়ে হেঁটে হাটখোলা থেকে যোগীনগর রওয়ানা হলাম। চারদিক একেবারে নিশ্চুপ অন্ধকার। সমগ্র শহরটা ঘুমিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে পুলিশের বাঁশীর শব্দ আর দূর থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ ভেসে আসছে। বাসার ভিতরে ঢোকার মিনিট পাঁচেক পরেই আবার দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ পেলাম। বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠলো। কিন্তু নীচের তলায় এসে বাইরের দরজা খুলতেই চমকে উঠ্‌লাম। সামনে দেখতে পেলাম একদল পুলিশ দিয়ে একজন দারোগা সাহেব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে দেখেই বললেন যুবলীগ অফিস সার্চ করার জন্য ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসেছি। আমি বললাম বেশ তো আপনাদের ডিউটি করবেন তাতে আমার বলবার আর কিছু থাকতে পারে না।' লক্ষ্য করে দেখলাম পাড়ার দু'জন লোককে সাক্ষী হিসাবে আনা হয়েছে। আমি পরিষ্কার ভাবে দারোগা সাহেবকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি হচ্ছি ছা-পোষা মানুষ, প্যারামাউণ্ট প্রেসে চাকুরী করি আর সস্ত্রীক উপরের তলায় ভাড়া থাকি। নীচের তলায় যুবলীগ ওয়ালারা কি করে তা জানবার আমার সময় কোথায়? দারোগা সাহেব লক্ষ্য করে দেখলেন যে, যুবলীগ অফিসে তালা ঝুলানো রয়েছে। তিনি

হুকুম করবার সঙ্গে সঙ্গে একজন কনস্টেবল বিরাট একগোছা চাবি বের করে খুলতে চেষ্টা করতে লাগলো, মিনিট কয়েক প্রচেষ্টার পর তালাটা খুলে গেলো। সংগে ডি, আই, বির লোকটা টেবিল আর ব্যাগের কাগজ পত্র ঘাটতে শুরু করলো। আমি আস্তে করে দারোগা সাহেবকে লোকটার পরিচয় জিজ্ঞেস করে বললাম, সার্চ করার কাজটা আপনি করলেই ভালো হয়। ওনার গায়ে তো খাঁকি পোষাক নেই কিনা।' আমার কথায় কাজ হলো। ডি, আই, বি ভদ্রলোক একটা চেয়ার টেনে বসলেন আর দারোগা সাহেব কাগজপত্র ঘাটাঘাটি করে বললেন, 'কিছুই তো পাওয়া গেলো না। এই বলে সার্চ ওয়ারেন্ট 'নাথিং ফাউণ্ড' লিখে দিলেন। আমরা সব কজন দস্তখত করে দিলাম। পুলিশের লোকজন চলে যাবার পর দেখলাম যুবলীগ অফিসের পিছনের ঘরটা থেকে অন্ধকারের মাঝ থেকে লালাভাই বেরিয়ে এলো। আমরা বুকটা চমকে উঠলো। লালাভাই বললেন, 'কপালটা আমার ভালই। আইজ রাইতেই বরিশাল থাইক্যা আইছি। কিন্তুক অফিসের তালা খুলতে না পাইরা পিছনের ঘরে হুইছিলাম।' রাত পাঁচটার দিকে লালাভাই আবার অন্ধকারের মধ্যে উধাও হয়ে গেলো। এরপর যখন আবার তার সঙ্গে দেখা হলো, তখন যুক্তফ্রণ্টের বিজয় উল্লাসে পূর্ব বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। আর তোয়াহা সাহেব প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে ঢাকায় ফিরে আসায় আমি দক্ষিণ মৌশণ্ডিতে যৌথভাবে একটা বাসা ভাড়া করে উঠে গেছি।

এদিকে লালাভাই যুবলীগের ফুল-টাইম ওয়ারকার হিসাবে সমগ্র পূর্ব বাংলা চষে বেড়াতে শুরু করেছেন। এর কিছুদিন পরে একদিন যুবলীগ অফিসে যেয়ে আজকের প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক ও সুরকার আলতাফ মাহমুদ আর লালাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। আলতাফ মাহমুদ তখন যুবলীগের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে

জড়িত ছিলেন। লালাভাই যুবলীগ অফিস সার্চ করার ঘটনা বলে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। পকেট থেকে গোল্ডফ্লেক সিগারেট বের করে আমাকে একটা দিয়ে বললেন, 'প্যাকেটটা একজন একটুক আগে দিছে। তাই হবাইরে খাওয়াইতাছি।' তখন কিন্তু ঘুর্ণাক্ষরে বুঝতে পারিনি যে, এটাই ছিল আমার সংগে লালাভাইয়ের শেষ দেখা। যখন মিটফোর্ডে তাঁকে দেখতে গেলাম, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। দুরারোগ্য বসন্তরোগে বরিশালের কৃতী সন্তান আর পূর্ব বাংলার যুবসমাজের নয়নমনি লালাভাই আর ইহজগতে নেই। প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন লালাভাইয়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। কিন্তু আফসোস, আজকের দিনে যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী বলে দাবী করছেন, তাঁরা কিন্তু ক্ষণিকের তরেও লালাভাই কিংবা নওগাঁর বিপ্লবদার কথা মনে করেন না। 'ইমাদুল্লা পাঠাগার'কে কী পুনরুজ্জীবিত করা যায় না?

চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের একদিন পর যুক্তফ্রণ্টের অন্যতম নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বগুড়া থেকে ঢাকায় ফিরে এলেন। আমরা একদল সাংবাদিক দৌড়ে সিমসন রোডের যুক্তফ্রন্ট অফিসে যেয়ে হাজির হলাম। সেদিন সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে খুবই উৎফুল্ল দেখলাম। পরনে তাঁর খদ্দরের পাজামা আর পাঞ্জাবী। আমাদের একজন নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে নিজস্ব মতব্যক্ত করবার জন্য তাকে অনুরোধ জানালো। তিনি বেশ জোর দিয়েই বোললেন, 'হামার মনে হয় মুসলিম লীগ এসেমব্লীতে নিজেদের গ্রুপ বানাতে পারবেন না। গ্রুপের জন্য যে দশজন মেম্বারের দরকার হয় সারা বাংলা থেকে ওরা সে দশজন মেম্বারকেও 'ইলেক্ট' করতে পারবে না।' সেদিন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথাগুলো অতিরঞ্জিতই মনে হয়েছিলো। কেননা আমাদের স্থির বিশ্বাস ছিল যে পার্টির বদৌলতে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে

আর যে পার্টি প্রায় সাত বছর ধরে ক্ষমতাশীল রয়েছে, সেই পার্টিকে এরকম শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা সম্ভব হবেনা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো, ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল দু'শ সাঁইত্রিশটা আসনের মধ্যে মাত্র ৯টা আসন দখল করতে পেরেছে। চট্টগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে নির্বাচিত জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী পরে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিতে যোগদেয়ায় মুসলিম লীগ প্রাদেশিক পরিষদে নিজেদের গ্রুপ গঠনে সক্ষম হয়েছিলো।

চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর সমস্ত সভ্য জগত স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। তৎকালীন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন আর তাঁর মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যই এ নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি বহন করে। এ' সময় গাইবান্ধায় জনৈক মুসলিম লীগার এক অদ্ভূত কাজ করে বসলেন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড থেকে এ ভদ্রলোককে প্রথমে নমিনেশন দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু পরে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড এ নমিনেশন বাতিল করে আর একজনকে প্রার্থী মনোনয়ন করে। নির্বাচনে ফলাফল প্রকাশ হবার পর, শেষ মুহূর্তে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক নমিনেশনে বঞ্চিত ভদ্রলোক প্রায় হাজার তিনেক টাকা খরচ করে নিজের গ্রামের লোকদের ভূরি-ভোজন করান। কেননা তাঁর মতে শেষ মুহূর্তে নমিনেশন না পাওয়ায় তিনি নিদেন পক্ষে বিশ হাজার টাকা খরচের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে। প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচনের ফলাফল এসে পৌঁছুতে শুরু করলে আমরা উল্লাসে ফেটে পড়লাম। কেননা প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী জয়লাভ করে চলেছে। নয় নম্বর হাটখোলা রোডের দৈনিক ইত্তেফাকের অফিস তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে। এমন সময় সন্ধ্যার কিছু আগে হঠাৎ করে ইত্তেফাক

অফিসে একটা টেলিফোন এলো। যিনি ফোন করেছেন তিনি স্বয়ং টেলিফোন অফিসেই চাকুরী করেন। উত্তেজনায় ভদ্রলোকের বাক প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অনেক কষ্টে বললেন।' নুরুল আমীন সাহেব নির্বাচনে হেরে গেছেন। ইত্তেফাক অফিসের যে সাব এডিটর ফোনে কথা বোলছিলেন তিনি খবরের সূত্র জিজ্ঞেস করলেন। ভদ্রলোক বলছিলেন, 'এই মাত্র ময়মনসিংহের ডি, এম সাহেব ট্রাংককলে খবরটা চীফ সেক্রেটারী ইসহাক সাহেবকে বলেছেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এ খবরটা দাবানলের মতো সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়লো। চারদিক থেকে হাজার হাজার লোক হাটখোলায় ইত্তেফাক অফিসে আর কে, এম, দাস লেনে শেরে বাংলার বাসভবনে এসে ভীড় জমাতে লাগলো। রাত একটায় বিরাট ছাত্র মিছিল হাতে খড়ম বাজিয়ে সুর করে জারী গান গেয়ে শহর প্রদক্ষিণ করলো। আর স্থানীয় লোকেরা বেধড়ক বাজী পটকা ফুটিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো। সমস্ত রাত ধরে ঢাকা নগরীতে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেলো। পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকে ব্যানার হেডলাইন বেরুলো 'পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশ থেকে অশুভ নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি' দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দীন হোসেন এ হেডিং দিয়েছিলেন। সাধারণ নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে সিরাজ সাহেব ইত্তেফাকে যোগদান করেন। এ সময় দৈনিক আজাদ থেকে তাঁকে কর্মচ্যুত করা হয়। কেননা তিনি দৈনিক আজাদের যুগ্ম-বার্তা সম্পাদক থাকাকালীন যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে একটা 'ষড়যন্ত্রে' অজান্তে শরীক হতে পারেননি। নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রার্থী মনোনয়ন ব্যাপারে শেরে বাংলা আর সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে শেরে বাংলা 'অভিমান' করে যুক্তফ্রন্ট অফিস গমনে অস্বীকার করেন। ফলে মুসলিম লীগ মহল থেকে আজাদ, সংবাদ আর মিল্লাতে এক যোগে একই ভাবে একই সংগে একটা খবর 'যুক্তফ্রন্ট ভেংগে গেছে' হেডিং-এ ছাপাবার

ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া 'যুক্তফ্রণ্ট' না 'বিযুক্তফ্রণ্ট' নামে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশের জন্য সাব্যস্ত করা হয়। নিউজটা দিনের বেলাতেই কম্পোজ করে রাখা হয়। এদিকে সন্ধ্যার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শেরে বাংলা আর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মত বিরোধের যুক্তফ্রণ্টে ফাটল ধরার খবরে দল বেঁধে কে, এম দাস, লেনে যেয়ে হাজির হলেন। ফলে গভীর রাতে আবার দুই নেতার মিলন হলো। সম্ভবতঃ মেসার্স আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, সৈয়দ আজিজুল হক, কমরুদ্দীন আহমদ শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখের প্রচেষ্টায় দুই নেতার স্বাক্ষরিত একটা যুক্তবিবৃতি সংগে সংগে প্রকাশ করা হয়। সিরাজউদ্দীন সাহেব রাতের ডিউটি করছিলেন আজাদে। এসময় আজাদে প্রকাশিত সংবাদের গুরুত্ব খুবই বেশী ছিল। তাই সোহরাওয়ার্দী সাহেব যুক্ত বিবৃতি ঢাকার সংবাদপত্রগুলোতে পাঠাবার পর নিজেই আজাদে ফোন করে যুক্ত বিবৃতিটা ছাপাবার জন্য অনুরোধ করেন। ফলে সিরাজ সাহেব সম্ভবতঃ সাংবাদিক সততার জন্যই যুক্তফ্রণ্ট ভেঙ্গে যাওয়া সংক্রান্ত পূর্বপরিকল্পিত সংবাদটা ছোট করে দিয়ে পাশাপাশি যুক্ত বিবৃতিটাও ছাপিয়ে দেন। এতেই কাল হলো। পরদিন মুসলিম লীগ সমর্থিত দৈনিক সংবাদ আর মিল্লাতে 'ষড়যন্ত্র' মোতাবেক সংবাদ প্রকাশিত হলেও দৈনিক আজাদে অন্য রকম খবর দেখে মুসলিম লীগের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। ফলে দৈনিক আজাদ থেকে সিরাজ সাহেব চাকুরী হারালেন। পরদিন আজাদ অফিসের গেটে পৌঁছবার সংগে সংগে তিনি পদচ্যুতি পত্র লাভ করেন। এরপর তিনি সিনিয়র সাব এডিটর রূপে ইত্তেফাকে যোগ দেন আর খুব অল্প সময়ের মধ্যে বার্তা সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় সরকারী নির্দেশে পাকিস্তান অবজারভারের প্রকাশনা বন্ধ ছিল।

একথা আজ ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, পূর্ব বাংলার চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাস বেশ কিছু সংখ্যক তরুণ যুবক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্য ভুক্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই-ই নয়, এদের কেউ আবার আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা বলে পরিচিত হয়েছিলেন এদের মধ্যে মেসার্স নুরুল হুদা কাদের বখশ, মোহাম্মদ তোয়াহা, ওলী আহাদ প্রমুখ অন্যতম। এ ব্যাপারটা সর্বপ্রথম মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে ধরা পড়ে ছিলো। যুক্তফ্রণ্টের নমিনেশন দেয়ার আগে আওয়ামী লীগের নিজস্ব দলীয় তালিকা চূড়ান্ত করার সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেব ব্যাপারটা লক্ষ্য করে চমকে উঠেন। ঐ সময়ের একটা ঘটনার কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে রয়েছে। সেদিন সদরঘাটের যুক্তফ্রণ্ট অফিসে দিনাজপুরের আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের একটা বৈঠক ছিল। বৈঠকের প্রারম্ভে মরহুম নেতা দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রেরিত লিষ্টিটা ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। একটা নামের উপর থেকে তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টি সরাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত লাল পেন্সিল দিয়ে নামটার নীচে দাগ দিলেন। বৈঠক শুরু হবার পর শহীদ লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেয়া নামটা ধরে ডাক দিয়ে বললেন,

আপনে জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী ?'

'জি'।

'তাহলে তো আপনাকে নমিনেশন দিতেই হবে। তবে আমাকে একটা সত্যি কথা বলতে হবে।'

'বলুন'।

হামি বলছিলাম আপনার মতো আরও কতজন হামার পার্টির মধ্যে ঢুকেছে ?

প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না।

বুঝতে আপনে ঠিকই পেরেছেন। হামি মার্কসীষ্টদের কথা বোলছিলাম।

সেদিনকার দিনাজপুর জিলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারীই হচ্ছেন আজকের ভাসানী ন্যাপের প্রাদেশিক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জনাব নুরুল হুদা কাদের বকশ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত চুয়ান্নর সাধারণ নির্বাচনে কাদের বকশ সাহেবকে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন দেয়া হয়নি।

রাজনীতির অপার মহিমা রয়েছে। এ সময় যুক্তফ্রন্ট গঠন করার ফলে এর প্রতিটি অংগ দলকেই যুক্তফ্রন্টের বৃহত্তর স্বার্থে কয়েকটা করে আসন ছেড়ে দিতে হয়েছিলো। কুমিল্লার দাউদকান্দি অঞ্চল থেকে খোন্দকার মুশতাক আহম্মদ যুক্তফ্রন্ট নমিনেশনে বঞ্চিত হলেন। শেষ পর্যন্ত ইনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। নির্বাচন হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইনি যুক্তফ্রন্টে যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে খন্দকার সাহেব শেরে বাংলার কৃষক শ্রমিক পার্টির চীফ হুইপ পদে নির্বাচিত হন। এর বছর কয়েক পরে জনাব মুশতাক আবার আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তন করেন। বহুদিন কারাবরনের পর বর্তমানে ইনি আওয়ামী লীগের অন্যতম সহসভাপতি পদ অলংকৃত করে রয়েছেন।

চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের একচেটিয়া জয় লাভের পর শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হলেন। কিন্তু সবাইকে হতবাক করে রাজনৈতিক কারণে তিনি শুধুমাত্র কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা মিনি ক্যাবিনেট গঠন করলেন। সম্ভবত এটাই হচ্ছে শেরে বাংলার সংগে আওয়ামী লীগের গণ্ডগোলের মূল সূত্রপাত। অবশ্য সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের

আশাতীত জয়লাভের কৃতিত্বের প্রায় সবটুকুই আওয়ামী লীগ দাবী করতে থাকায় বোধহয় মরহুম নেতা মিনি ক্যাবিনেট গঠন করে আওয়ামী লীগদের 'শায়েস্তা' করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর ফলে উভয় দলের মধ্যে যে বিরোধের সূত্রপাত হয় ১৯৫৮ সালে শাহেদ আলী হত্যার সময় তা চরমে ওঠে। এবং আমার বিশ্বাস সে বিরোধের আজও পর্যন্ত পরিসমাপ্তি ঘটেনি।

এ সময়কার রাজনৈতিক ইতিহাস লিখতে গেলে, দৈনিক ইত্তেফাক আর মানিক ভাই-এর কথা এসে পড়ে। শেরে বাংলা মিনি ক্যাবিনেট গঠন করায় আওয়ামী লীগের সংগে যে বিরোধ দেখা দেয় তা মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারে মানিক ভাই এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত শেরে বাংলা আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের তার মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করতে সম্মত হন। ফলে মেসার্স আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবর রহমান প্রমুখ মন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ করেন।

সেদিন নাইট ডিউটি করার পর রাত সাড়ে তিনটায় ইত্তেফাক অফিসের নিউজ টেবিলে ঘুমাবার ব্যবস্থা করলাম। পরদিন সকালে গভর্ণর হাউসে আওয়ামী লীগ সদস্যদের মন্ত্রীত্বের শপথ গ্রহণ করার কথা। হঠাৎ করে ফোন বেজে ওঠায় ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠলাম। তখন সকাল হয়ে মাথার উপর সূর্য অনেকটা উঠে গেছে। ফোনের ওপার থেকে উত্তেজনাপূর্ণ একটা স্বর ভেসে আসলো। অনেক কষ্টে বুঝতে পারলাম যে, আদমজী জুটমিলের দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। আদমজী মিলে কিছুটা উত্তেজনা ছিল বটে, কিন্তু তা যে দাংগার রূপ পরিগ্রহ করবে তা আমরা ঘুর্নাক্ষরে চিন্তা করিনি। আমি সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণর হাউসে ফোন করে জানতে পারলাম যে, তখন নয়া মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান চলছে। আর এদিকে মন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) সশরীরে আদমজী মিলে হাজির রয়েছেন। নতুন মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণের

পরেই মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেবকে সংগে নিয়ে দুর্ঘটনা স্থলে দৌড়ে গেলেন। ইত্তেফাকের তৎকালীন চীফ রিপোর্টার ফয়েজ আহমদ আগেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন। আমরা যখন লঞ্চে যেয়ে মিলের ঘাটে উপস্থিত হলাম তখন সব কিছুরই পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সমগ্র এলাকাটা মধ্যযুগের এক রণক্ষেত্রের মত মনে হচ্ছিল। চারদিকে খালি আহতদের করুণ ক্রন্দনে ভরপুর হয়ে উঠেছে। জীবনে এরকম বীভৎস দৃশ্য দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বিশ্বের ইতিহাসে শ্রমিকে শ্রমিকে এতো বড় দাংগা আর হয়নি বললেই চলে। মাত্র দুঘন্টার মধ্যে দেড় সহস্র আদম সন্তান বর্বরভাবে নিহত হলো। ঐ দাংগায় বন্দুক থেকে শুরু করে ছোরা, লাঠি, কুড়াল প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রের বেপরোয়া ব্যবহার হয়েছিলো। অথচ এই ঘটনার সময় যে সশস্ত্র পুলিশের দল মিলের অভ্যন্তরে উপস্থিত ছিল তাদের মিল প্রাঙ্গণে এনে গুলি বর্ষণের নির্দেশ দিলে এতো বড় নৃশংস হত্যাকাণ্ড হতে পারতো না। অথচ এই সশস্ত্র পুলিশের দলকে নাকি দাংগা শুরু হবার প্রাক্কালে মিলের মেশিনপত্র পাহারা দেয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিলো। আদমজী মিলের দাংগার খবর পশ্চিম পাকিস্তানের খবরের কাগজ গুলোতে এমন ভাবে ফলাও করে প্রকাশ করা হলো যাতে ওখানকার লোকদের মনে এ মর্মে বদ্ধমূল ধারণার সৃষ্টি হলো যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা অবাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। অথচ পরবর্তীকালে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে একটা বিশেষ মহল থেকেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে এ দাংগার ইন্ধন যোগানো হয়েছিলো। কেননা এরা কোন অবস্থাতেই যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে বরদাশত করতে পারেনি। অথচ এ সময় স্থানীয় আর বহিরাগত লোকদের মধ্যে সম্পর্ক বিশেষ উৎসাহজনক ছিল। এর ফল হিসাবে আদমজী মিলে দাংগা হওয়া সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা কিংবা তেজগাঁয়ে সামান্যতম উত্তেজনা

পরিলক্ষিত হয়নি। সর্বত্র স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছিলো। তবু পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ছাড়া বেশীর ভাগ সংবাদপত্রই আদমজী দাংগার ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট তথা বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে নানাভাবে কটাক্ষ করেছে। অথচ তখনকার ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় সরকার এসব কটাক্ষে উৎসাহিত বোধ করছিলেন। এটা নিতান্তই দুঃখজনক ব্যাপার। কেননা সত্যিকার ভাবে বলতে গেলে এ সময় থেকে পূর্ব আর পশ্চিমের বিরোধটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। পরে তা একটা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। অবশ্য অর্থনৈতিক বৈষম্য এ ব্যাপারটা আরও ত্বরান্বিত করেছে। অথচ পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বহারারা সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

যুক্তফ্রন্ট দলের একচেটিয়া জয়লাভের পর পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম বৈঠকের দিন সমস্ত ঢাকা নগরী উৎসব মুখর হয়ে উঠলো। ছেচল্লিশের সাধারণ নির্বাচনে পকিস্তান কায়েম করার উছিলায় যে সব "কলাগাছ" নির্বাচিত হয়েছিলেন, প্রায় আট বছর পূর্ব বাংলার প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেলেন। এ প্রদেশের লক্ষ-কোটি নিপীড়িত মানবাত্মা প্রথম সুযোগেই তাঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান করলেন। বিশ্বের পার্লামেন্টারী রাজনীতির ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা হলো।

এদিকে দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সম্ভবত ব্যবসায়ের খাতিরেই একরকমভাবে বলতে গেলে রাতারাতিই নিজেদের ভোল পাল্টিয়ে ফেললো। আজাদ সম্পর্কে মরহুম শেরে বাংলার হাতে লেখা সার্টিফিকেট ব্লক করে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে বসলো। শুধু তাই নয় প্রতিটি নির্বাচিত পরিষদ সদস্যের সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা করলো। এছাড়া যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের সভাসমিতি আর বিবৃতি এমনভাবে ফলাও করে ছাপতে শুরু করলো, যাতে মনে হলো যে, দৈনিক

‘আজাদ’ আর যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বরাবরই একটা হরিহর আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। তাই পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের প্রথম বৈঠকের দিন প্রায় সমস্ত সদস্যের বগলে এক কপি করে ‘আজাদ’ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। অথচ এই পত্রিকাই মাত্র দুইমাসের মধ্যে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জানালো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চাপিয়ে দেয়ার সময় মার্কিনী কর্ত্তৃপক্ষ পাকিস্তানকে ‘ক্যালাহান’ নামে এক সাংবাদিক উপহার দিয়েছিলেন। খাঁজা নাজিমুদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করবার সময়েই এ সাংবাদিক ভদ্রলোক ‘নিউইর্য়ক টাইমস’ পত্রিকার সংবাদদাতা হিসাবে করাচীতে আগমণ করেন। এই ক্যালাহানই যুক্তফ্রন্টের কাল হলো। এ সময় বিমানযোগে ঢাকা থেকে করাচী যেতে হলে দিল্লী হয়ে যেতে হতো। কেননা তখনও বোয়িং এর যুগ শুরু হয়নি। আদমজী আর কর্নফুলীর দাংগা ছাড়াও কেন্দ্রীয় কতৃর্পক্ষের সঙ্গে একটা পরিষ্কার বোঝা-পড়ার উদ্দেশ্যেই মূখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেব করাচীতে যাবার আগে ‘নিউইয়র্ক টাইমস’ এর সংবাদদাতা ক্যালাহান তাঁর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাতকারে মিলিত হলেন। এ সাক্ষাতকারের যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো শেরে বাংলা তা’ ঘূর্ণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি। তাই সোজা আর সরল মন নিয়েই তিনি ক্যালাহানের প্রতিটি প্রশ্নেরই সেদিন জবাব দিয়েছিলেন। এরপর হক সাহেব করাচীর পথে কলকাতায় যেয়ে হাজির হলেন। পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা সাক্ষাৎ করাটাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কলকাতার বাংগালী মধ্যবিত্ত আর খবরের কাগজগুলো তাঁকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা দিলো। এতে করে তিনি খুব বেশীরকম অভিভূত হয়ে পড়ে বাঙ্গালীদের একাত্মবোধ সম্পর্কীয় কিছু মন্তব্যও করলেন। হক সাহেব করাচী যেয়ে

পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলো কোলকাতার ঘটনাবলীর উপর নিজেদের ইচ্ছেমত রং ছড়িয়ে ফলাও করে ছাপালো। এদিকে ক্যালাহানের প্রেরিত বিশেষ সাক্ষাতকারের সংবাদ এমনভাবে নিউইয়র্ক 'টাইমস'এ প্রকাশ হলো, যাতে যুক্তফ্রন্টকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিযুক্ত করা হলো, সমগ্র প্রদেশে তখন একটা থমথমে ভাব। মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শেষরক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে আরও কয়েকজন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীকে করাচীতে ডেকে পাঠালেন। কেন্দ্রীয় সরকার আর যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা হলো। কিন্তু কোন সুরাহাই হলোনা। উভয় দলই মতানৈক্যের ব্যাপারে একমত হলো। এদিকে যুক্তফ্রন্টের তিন প্রধানের অন্যতম আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী তখন চাবুক হাতে অনেকগুলো জনসভায় ভাষণ দিয়ে ষ্টকহলমের শান্তি সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে লণ্ডন যেয়ে হাজির হয়েছেন। ফলে মওলানা সাহেবের জনপ্রিয়তা বেড়েই চললো। তাঁর অংগুলি হেলনে তখন পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কম্পমান। মওলানা ভাসানী অবিরাম পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী আর ২১ দফার কথা বলেই চলেছেন। নিয়তির পরিহাস ষোল বছর পর পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের সেই দাবী আজও পর্যন্ত আদায় হয়নি। এবারের সাধারণ নির্বাচনের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায়ের শপথ করছেন। অথচ এদের মধ্যে কোন কোন দল অতীতে ক্ষমতাসীন থাকার সময় পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায় হয়ে গেছে বলে প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করেছিলো।

যাহোক, কেন্দ্রীয় সরকার আর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্যদের ব্যর্থ হবার পর শেরে বাংলা তাঁর দলবলসহ ঢাকায় ফিরে এলেন। মরহুম ফজলুল হক সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মন্ত্রিসভার

আয়ু ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু বিবেকের বিরুদ্ধে শত প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দাসখতে দস্তখত দেননি। অবশ্য পরবর্তীকালে কারো কারো মতে তাঁর এ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিলো।

সেদিনের কথা আমার আজও মনে রয়েছে। ইত্তেফাকের চীফরিপোর্টার ফয়েজ আহমদ মওলানা ভাসানীর সঙ্গে লণ্ডন যাওয়ায় আমি কেবলমাত্র চীফ রির্পোটারের দায়িত্ব নিয়েছি। এমনি সময় আমার অফ ডের দিনে ওয়াইজঘাটের মায়া সিনেমা হলে ম্যাটেনী শো'তে 'বরযাত্রী' ছবি দেখতে গিয়েছি। চমৎকার বই। তৃপ্ত মন নিয়েই সস্ত্রীক হল থেকে বেরিয়েই দেখি লোকজন সব তাড়াহুড়া করে যার যার বাড়ীর দিকে ফিরে চলেছে! আমরা দুজনা প্রথম হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। মনটা অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠলো। এমন সময় একজন হকার যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত চীৎকার করতে করতে একেবারে আমাদের কাছটাতে এসে হাজির হলো। আমি এক আনা দিয়ে স্থানীয় একটা ইংরেজী দৈনিকের টেলিগ্রাম সংখ্যা কিনলাম। তাড়াতাড়ি একটা রিকশা ডেকে আগা মছিহ লেনের বাসায় ফিরে এলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হুড়মুড় করে কাগজটা পড়লাম। পূর্ব বাংলায় আইন ও শৃংখলা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে বলে এ প্রদেশে ৯২ (ক) ধারার শাসন জারি করা হয়েছে। রাতের খাওয়া সম্পন্ন করে অফ ডে হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক ইত্তেফাক অফিসে হাজির হলাম। রাস্তাঘাট একেবারে জনশুন্য। রাত ন'টা বাজে। অফিসে যেয়েই শুনলাম ফজলুল হককে অন্তরীণবদ্ধ করা হয়েছে আর শত শত যুক্তফ্রণ্ট কর্মীর গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয়েছে। সর্বোপরি পূর্ব বাংলার খবরের কাগজগুলোর উপর সেন্সরশীপ নির্দেশজারি হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি খবর আর সম্পাদকীয় নিবন্ধ ছাপাবার আগে, সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদের অধিবাসী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা আর পাঞ্জাবের জনাব নিয়াজ মোহাম্মদ খান পূর্ব বাংলার নয়া গবর্ণর আর চীফ সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই পূর্ব বাংলায় এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হলো। শত সহস্র যুক্তফ্রন্ট কর্মী আর নেতাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হলো। গবর্ণর মির্জা সাহেবের হুংকারে পূর্ব বাংলার আকাশ-বাতাস তখন প্রকম্পিত। তিনি ঘোষণা করলেন, 'মওলানা ভাসানীর মতো রাষ্ট্রদ্রোহী লোক যদি পাকিস্তানে ফিরে আসে তবে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হবে। নচেৎ তাঁকে নির্বাসনে জীবন যাপন করতে হবে। নিয়তির পরিহাস। রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে মির্জা সাহেব নিজেই নির্বাসনে জীবনযাপন করলেন। এমনকি দেশের বাইরেই তার মৃত্যু হলো আর দেশের মাটিতে কবরের স্থান পেলেন না।

তখনকার দিনে দৈনিক ইত্তেফাক একটা পরিবারের মত ছিল। এ কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটা লোকের সুখদুঃখ কেবল আমাদের নখদর্পনে ছিল তাই-ই নয় এসব সুখ-দুঃখ আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করতাম। এ সময় দৈনিক ইত্তেফাকের একজন স্পেশাল হকার ছিল। নাম তার বসির; বাড়ী চাটগাঁও। প্রতিরাত্রেই সে ইত্তেফাক অফিসে হাজির হতো আর পরদিনের কাগজের একটা মুখরোচক হেডিং এর জন্য অনুরোধ করতো। আমরাও ওর অনুরোধে চুটকিওয়ালা হেডিং দিতাম। পরদিন দেখতাম বসির সেই হেডিংটাই চীৎকার করে বেধরক কাগজ বিক্রি করছে। একদিন দেখলাম রথখোলার মোড়ে চীৎকার করছে 'খবর নাই, খবর নাই, মওলানা ভাসানীর কোন খবর নাই। আমি চমকে উঠলাম। মওলানার খবর নেই, এতবড় খবরটা আমার অবগত ছিল। জোর কদমে এগিয়ে বসিরকে জিজ্ঞেস করলাম 'কিরে বসির মওলানা

ভাসানীর কি কথা কইতাছোস ?' প্রায় সবকটা দাঁত বের করে সরল হাসি দিয়ে বলল, 'স্যার সক্কালে দেখি আজকের ইত্তেফাকে একটাও জবর খবর নাই এখন করি কি এই কাগজ বেইচাতো রুজী করন লাগব। তাই আৎকা দেখলাম, কাগজের মধ্যে ভাসানী সাহেবের কোন মিটিং এর খবর নাই। আর আল্লায় দিলে তাঁর কোন স্টেটমেন্টও নাই। তাই নিজেই চিন্তা করলাম এলায় যদি ভাসানীর কোন খবর নাই কইয়া চিল্লাই তো কাগজ পানির মতো বিক্রি হইব।' আমার সঙ্গে কথা কটি বলে আমার বসির চীৎকার করে উঠলো, 'খবর নাই।' আশেপাশের লোকেরা কাগজ কেনার জন্যে হুড়াহুড়ি করতে লাগলো।

চুয়ান্ন সালের রাজনৈতিক উত্থান পতন ছাড়াও পূর্ব বাংলায় এক মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখেছিলাম। এবছর সমগ্র পূর্ব বাংলায় এক ভয়াবহ বন্যা স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। আর স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথমবার ঢাকার রাস্তায় নৌকা চলাচল করলো। ঢাকায় চালের মন পনরো টাকায় উঠলো। আমরা সবাই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। সাহায্য দেয়ার অছিলায় মার্কিনীরা আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করলো। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মার্কিন গ্লোব মাষ্টার বিমানে রিলিফ দ্রব্য ঢাকায় এসে হাজির হলো। আমাদেরই একটা মহল মার্কিনীদের এই বেপরোয়া সাহায্যে ধন্য ধন্য রব তুললোই কিন্তু জানিনা আমার কাছে বার বার করে নির্বাচনের সময় ঢাকার নারিন্দার এক জনসভায় জনৈক ঢাকাইয়া বক্তৃতার কথা মনে হতে লাগলো। ঢাকার পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও মুসলিম লীগ প্রার্থী হুমায়ুন সাহেবের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্ট প্রার্থী জনাব গোলাম কাদের চৌধুরী পূর্ব ঢাকা এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সেদিন নারিন্দায় মগরেবের নামাজের পরেই যুক্তফ্রণ্টের উদ্যোগে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছে।

সমস্ত বক্তার বক্তৃতা শেষ হবার পর উপস্থিত সুধীজনের কারো কোন বক্তব্য থাকলে তা বলার জন্যে আহ্বান জানানো গেল। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখলাম একজন স্থানীয় লোক হাত তুলে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন। খুবই খাতির যত্ন করে তাঁকে মাইক ছেড়ে দেয়া হলো। ভদ্রলোক বললেন, ভাইসব, বাপ মায়ে আমারে লেহাপড়া হিকায় নাই, তাই বক্তৃতা দিবার পারমু না। খালি আপনাগো কয়েকটা মেছাল হুনাইয়া যামু।' এরপর বক্তা স্থানীয় ভাষায় একটার পর একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য্য পূর্ণ গল্প বলতে শুরু করলেন। কিন্তু এসবের একটা গল্প আমার চিরকাল মনে থাকবে। বক্তা বললেন, আমাগো হিন্দুস্থানের মধ্যে একজন মুসলমান বাদশা আছিল। হেই বাদশা শাহজাদীর বহুত বিমার, বাদশায় কইলো, যেই লোক আমার শাহজাদীরে ভালো কইরা দিতে পারবো, হে যা চায় তাই-ই দিমু। কবিরাজ আর হেকিমের দল আইলো। অসুধ ফসুধ কত কি খাওয়াইলো; কিন্তু শাহজাদী আর ভালো অইল না। হেষে শিরিংগি শালসা আর কুয়ত এ হালুয়া খাওয়াইলো। কিন্তু কিছুই কোন কামে আইলোনা। একদিন বাদশার দরবারে এক আংরেজের বাচ্চা আইয়া শাহজাদীর বিমার ভালো করার কথা কইলো। বাদশা কইলো, তুমি যদি আমার শাহজাদীরে মেরামত কইরা দিতে পারো তয় তুমি যা চাও তাই-ই পাইবা।

আংরেজের বাচ্চায় ইঞ্জিসিন ফিঞ্জিসিন দিয়া এক হপ্তার মধ্যেই শাহজাদীকে ভালো কইরা দিল। বাদশা একেবারে খুশীতে ডগমগ। এলায় আংরেজ আইস্যা দরবারের মধ্যে সালাম দিয়া দাড়াইলো। বাদশারে কইলো, হুজুর আমি দিল্লী শহরের মধ্যে একটা মুদিখানা খুলবার চাই আর এই মুদিখানার সব ট্যাকসো মাপ। বাদশায় তো হাসতে হাসতে পাগল। হালার আংরেজের বাচ্চার মাথা খারাপ অইছে। অন্য মাইনষে হইলে তো মুনিমুক্তা, হীরাজহরত কত কিছু চাইতো আর এ আংরেজ

কিনা বিনা ট্যাকসোর একটা মুদিখানা খুলবার চায়। বাদশা লগে লগে অর্ডার কইরা দিল।

এরপর একটু দম নিয়া বক্তা বললেন, ভাই সব এলায় আমার মেছাল শেষ হইয়া গ্যাছে গা। কিন্তু এক কথা ভাই সব হেই যে আংরেজের বাচ্চা বিনা ট্যাকসোতে একটা মুদিখানা খুলছিলো হেইটা উঠাইতে আমাগো দুই শ' বছর লাগছে। কত যে মা বোনের ইজ্জত গেছে তার ঠিকানা নেই। আর অক্ষণে আমিরিকানরা কইতাছে যে তাঁরা পাকিস্তানের মধ্যে একটু হাওয়াই জাহাজ রাখবার জায়গা চায়। হেইর লাইগ্যা কত খাতির! টেকা পয়সা অক্করে পানির মতো আইতাছে। কিন্তু খোদার কসম লাগে ভাইসব একবার যদি আমিরিকানরা হাওয়াই জাহাজ রাখবার জায়গা পায় তয় হেগো উঠাইতে আমাগো সাত শ' বছর লাগবো।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। আর আমরা সিয়াটো-সেন্টোর সদস্য হয়ে গণতান্ত্রিক জগত থেকে এক ঘরে হয়ে পড়লাম।

যাকগে যা বলছিলাম। হঠাৎ একদিন বিকেলের দিকে ফুলবাড়িয়া রেল স্টেশনের কাছে বসির চীৎকার করছে বন্যার পানিতো শুকিয়ে গেল কিন্তু বাংগালীর চোখের পানিতো শুকালোনা? কেনো জানিনা আমি একটু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে লোকটার কাগজ বিক্রীর পদ্ধতি লক্ষ্য করলাম। পেটের জ্বালায় লোকটা কত ফন্দীই না করেছে। দৈনিক ইত্তেফাকে পিয়নের চাকরী পাওয়া সত্ত্বেও তাকে কাগজ বিক্রি করে কিছু উপরি পয়সা কামাই করতে হয়।

এরপর যখন বসিরকে দেখলাম, তখন পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। আমি ইত্তেফাকের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে কিছুদিন করাচী থাকার পর ঢাকার ফিরে এসেছি।

কার্যোপলক্ষে একদিন ইত্তেফাক আফিসে গিয়েছি। গেটে ঢুকতেই দেখি নিরাট হৈচৈ হচ্ছে। আমার সঙ্গে এক বিদেশী ভদ্রলোক। পাকিস্তান অবজারভার অফিসের সাক্ষাৎ পর্ব শেষ করে বিদেশী ভদ্রলোককে মানিক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে গিয়েছি। গণ্ডগোলের ব্যাপারটা শুনবার পরে হাসব না কাঁদবো কিছু বুঝতে পাচ্ছিলাম না। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়; কি একটা অপরাধের জন্য মানিক ভাই বসিরকে বরখাস্ত করেছে। বসির সেই বরখাস্তের নির্দেশ মাথা পেতে নিয়েছে। কিন্তু গণ্ডগোল বেধেছে আর এক জায়গায়। বসির তার গোটা চার পাঁচেক ছেলেমেয়েকে এনে ইত্তেফাক অফিসে রেখে গেছে। আর বলে গেছে যে, ইত্তেফাকে চাকরী নেয়ার সময় তার কোন ছেলেমেয়েই ছিল না। এ কয় বছরে তার বংশবৃদ্ধি পেয়েছে। ইত্তেফাকের চাকরী না থাকার অর্থই হচ্ছে যে, সে আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। তাই এসব ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব ইত্তেফাকের।

ব্যাপারটা যখন মানিকভাইকে জানানো হলো তখন তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হওয়া তো দূরের কথা, হঠাৎ করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। বসির আবার চাকুরীতে বহাল হলো। অনেকদিন পরে সেদিন আবার ইত্তেফাক অফিসে যেয়ে দেখলাম বসির এখন রেকর্ডরুমের দায়িত্ব পেয়েছে। চোখে চশমা দিয়ে সে কাগজের ফাইলগুলো গুছাচ্ছে। আমার চোখের সামনে ষোলো বছর আগেকার রথখোলার একটা দৃশ্য ভেসে উঠলো। জীবন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত এক বাঙ্গালী যুবক চীৎকার করছে, খবর নাই, খবর নাই, মওলানা ভাসানীর কোন খবর নাই।

খবরের কাগজের ব্যবসায় এক অদ্ভুত ব্যবসা। এ ব্যবসায় সরকার, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা কর্মচারী সবাইকে খুশী রাখতে হয়। তাই প্রায়ই কর্তৃপক্ষকে আর সাংবাদিকদের

নানা রকমের তালবাহানার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তবে একটা কথা ঠিক যে, কোন সংবাদপত্রের মালিক যদি সরকার, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা আর কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়, তবে সেই সংবাদপত্র অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর একটা সংবাদপত্র হতে পারলে, কয়েকশ' পরিবার নিশ্চিন্তে তার উপর নির্ভর করে জীবিকা অর্জন করতে পারে। গত তেইশ বছরে পূর্ব বাংলায় বহু দৈনিক পত্রিকার জন্ম হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে এর অধিকাংশই বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। এ সবের মধ্যে আমার দেশ, ইনসাফ, মিল্লাত, পাকিস্তান পোষ্ট, জেহাদ, নিউ নেশান অন্যতম। তাই হিসাব করে দেখা গেছে যে, খবরের কাগজ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মালিক ও কর্মচারী উভয়ের মধ্যেই কিছুটা 'মিশনারী জীলের' প্রয়োজন হয়। এর অভাব থাকলেই খবরের কাগজ সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। সবসময় টাকাটাই বড় প্রশ্ন নয়। আন্তরিকতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। মওলানা আকরাম খাঁ চৌদ্দ পয়সার আজাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে আজীবন সাধনা করে গেছেন। এমন কি বাধক্যজনিত অবস্থার জন্য মওলানা সাহেব রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও দৈনিক আজাদের সংগে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাইতো দৈনিক আজাদ বহু ঝড় ঝাপটার মোকাবেলায় এখন পর্যন্ত চালু রয়েছে। জনাব হামিদুল হক চৌধুরীও তাঁর আইন ব্যবসায়ের কর্মব্যস্ততার মধ্যেই প্রতিদিন অবজারভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স-এর খবরাখবর নেওয়া ছাড়াও খুঁটিনাটি কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখেন। মওলানা আকরাম খাঁ আর জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর রাজনৈতিক মতাদর্শের সংগে একমত না হোলেও সাংবাদপত্র পরিচালনা ক্ষেত্রে এদের একাগ্রতার প্রশংসা না করে পারা যায়না। অবশ্য এসব সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক সাংবাদিক আর কর্মচারীর আন্তরিক নিষ্ঠা না থাকলে অভীষ্ট লক্ষে পৌছান সম্ভব হতো না।

দৈনিক ইত্তেফাকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মরহুম তোফাজ্জল হোসেনের একাগ্রতা ও কর্তব্য নিষ্ঠার প্রশংসা করতে হয়। দৈনিক ইত্তেফাকের কথা মনে হলেই কেনো জানিনা নয় নম্বর হাটখোলা রোডের প্যারামাউন্ট প্রেস আর এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব হাবিবুর রহমানের কথা মনে পড়ে। প্রথমদিকে কয়েক বছর পর্যন্ত দৈনিক ইত্তেফাক এই প্যারামাউন্ট প্রেস থেকেই ছাপা হয়েছিল। এ সময় জনাব রহমানের সহযোগীতা না হলে ইত্তেফাক প্রকাশ হওয়া মুস্কিল ছিল। প্যারামাউন্ট প্রেসেই তখন ইত্তেফাকের অফিস ছিল। এটাকে কোন খবরের কাগজের অফিসই বলা চলতো না। তবুও ইত্তেফাকের তৎকালীন কর্মচারীরা শত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এখানেই কাজ করে গেছেন। এমনি এক সময়ে দৈনিক ইত্তেফাকে কর্মচারী ইউনিয়ন গঠন করা হলো। কর্তৃপক্ষের কাছে চার্টার অব ডিমাণ্ড পেশ করে প্রাদেশিক সরকারের শ্রম দফতরকে এ ব্যাপারে জানানো হলো। শ্রম দফতর থেকে ব্যাপারটা তদন্ত করতে এসে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। কেননা যেসব দাবী দেয়া হয়েছে, তার এক নম্বরে রয়েছে, 'কথায় কথায় শ্রমিকদের গালাগালি করা যাবে না।' দুই নম্বরে বলা হয়েছে কর্মচারীদের বসবার চেয়ার টেবিল দিতে হবে। বেতন বৃদ্ধির কথাটা সর্বশেষ দফায় উল্লেখ করা হয়েছে। বহু বাক বিতণ্ডার পর মরহুম তোফাজ্জল হোসেন অর্থাৎ আমাদের মানিকভাই কর্মচারীদের গালাগালি বন্ধ করবার জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। এ ছাড়া সেদিনই খান কয়েক চেয়ার কেনার হুকুম দিলেন। আর ভবিষ্যতে বেতন বাড়ানো হবে বলে কথা দিলেন।'

মাস ছয়েক পরে আমাদের বেতন গড়ে গোটা বিশেক টাকা বৃদ্ধি পেলো। কিন্তু যে ভদ্রলোকের প্রচেষ্টায় আমাদের বেতন বাড়লো, তখন সেই ফয়েজ আহম্মদ সাহেব ইত্তেফাকের সংগে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন।

ইত্তেফাকের 'রাজনৈতিক মঞ্চ' তখন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রতিটা দিন মানিকভাই এই মঞ্চ লিখতেন। সম্পাদকীয় পাতায় একটা কলাম যে কীভাবে একটা দৈনিক পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির সহায়ক হোতে পারে 'রাজনৈতিক মঞ্চ'তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তার এসব লেখার অনেকটা খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলো। চুয়ান্ন সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হোলে মুসলিম লীগের তৎকালীন মুখপত্র দৈনিক সংবাদ সম্পর্কে তিনি লিখলেন, সংবাদের চোখে বিড়ালে প্রস্রাব করিয়া দিয়াছে। এ সব মন্তব্য শালীনতা বর্জিত হলেও সময়োপযোগী ছিল বৈ কী।

ঢাকার বাজারে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পেলে মানিক ভাই লিখলেন, 'গতকাল বাজারে গিয়েছিলাম। খাসীর দামে মাছ কিনিয়া আনিলাম।' এই একটা কথার মধ্য দিয়াই তিনি সে দিন ঢাকার বাজারের অবস্থা চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সতি কথা বলতে কি, তখনকার দিনে মানিকভাই এর 'রাজনৈতিক মঞ্চের দাপটে দক্ষিণ পন্থী রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়াও সরকার পর্যন্ত অস্বস্তিবোধ কোরছিলেন। অথচ লেখক হিসাবে তিনি অজ্ঞাতই ছিলেন। শুধুমাত্র মনের উদগ্র বাসনা নিষ্ঠা আর আন্তরিকতার জন্যই তিনি কালে পূর্ব বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলামনিষ্ট হতে পেরেছিলেন।

তবে একটা কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানিক ভাই একজন রাজনীতিবিদও ছিলেন। আর এজন্যও বোধ হয় তিনি একজন সফল সংবাদপত্র সম্পাদক হতে পেরেছিলেন। প্রতিটা ব্যাপারই তিনি তার নিজস্ব রাজনৈতিক কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখতেন। তাই দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশের পর থেকেই পূর্ব বাংলায় সংবাদপত্রের এক নতুন যুগের সূচনা হয়। অবশ্য পাকিস্তান অবজারভারই হচ্ছে এদেশের প্রথম বিরোধী দলীয় সংবাদপত্র। বি, পি, সি অন্দোলনের সময় এর ভূমিকা

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রাক্কালে অর্থাৎ বাহান্ন সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার এ পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। মরহুম শেরে বাংলা ফজলুল হক পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হবার পর পাকিস্তান অবজারভার পুনঃপ্রকাশের অনুমতি লাভ করে।

তখনকার দিনে দৈনিক ইত্তেফাকের সাফল্যে একথা প্রমাণিত হয় যে, কর্মরত সাংবাদিকরা মূলত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শিক্ষিত আর ওয়াকেফহাল না হলে সংবাদ প্রকাশ ও ফলাও করার বেলায় তাদের হিসাব ভুল হতে বাধ্য। অবশ্য ইত্তেফাকে অন্য পার্টির সংবাদ না দেওয়ায় কিংবা ছোটকরে দেওয়ার অপরাধ অমার্জনীয়। কোন সংবাদ পত্রিকার পলিসী মোতাবেক না হলে তা' গায়েব করার মধ্যে কোন কেরামতি নাই, সেই সংবাদের হেডিং আর ট্রিটমেন্ট' ছাড়াও এতদসম্পর্কিত অন্যান্য সংবাদ কায়দা মাফিক প্রকাশের মধ্যেই সাংবাদিকদের দক্ষতা নিহিত রয়েছে। তাই আজকের দিনে ইউরোপ আর আমেরিকার সংবাদ পত্রগুলো মাওসেতুং কিম্বা জেনারেল গিয়াপের বিবৃতি ফলাও করে প্রকাশ করেও কমিউনিষ্ট বিরোধী ভূমিকা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হচ্ছে। পশ্চিমা সাংবাদিকরা ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মার্কিনী নৃশংসতার আলোকচিত্র আর চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেও নিজেদের চাকুরী বজায় রাখছে। কেননা অত্যন্ত সন্তর্পনে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, এরা পরোক্ষ ভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকাই সমর্থন করছে। তবে সে সমর্থন উলংগভাবে না করে খুবই চালাকীর সঙ্গে করা হচ্ছে। এখানেই সাংবাদিক আর সাধারণ মানুষের মধ্যে তফাৎ। এটা স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখা যায় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শিক্ষিত হলে আর সাংবাদিক হিসাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করলে সামান্য নিষ্ঠা থাকলেই এ ধরনের 'জাজমেন্ট' আদায়ে ক্ষমতার অধিকারী

হওয়া যায় তাই আজকের দিনের সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকদের কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতায় ডিগ্রী লাভ করেন নাই। অথচ এরা যে কোন খবরের কাগজে কাজ করতে সক্ষম। কেননা মূলতঃ এরা এক একজন 'পলিটিক্যাল এলিম্যান্ট।' অবশ্য এঁরা সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে অনেক আগেই সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন।

চুয়ান্ন সালের ৯২ (ক) ধারা শাসনের কথা মনে পড়লেই কেন জানিনা মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী আর মির্জা, খান, শেখ এর কথা মনে পড়ে। পূর্ব বাংলায় গভর্ণর শাসন জারি হবার পর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা এলেন গভর্ণর হিসাবে, জনাব এন, এম, খান চীফ সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত হলেন আর জি ও সির পদ অলংকৃত করলেন লেঃ জেনারেল কে, এম, শেখ। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর সাধের যুক্তফ্রণ্টকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার কলমের এক খোঁচায় ক্ষমতাচ্যুত করার পর শেরে বাংলা কে, এম, দাস লেনের নিজের বাড়ীতে একরকম অন্তরীণাবদ্ধ হলেন, মওলানা ভাসানী স্টকহলম এর বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান করতে যেয়ে লণ্ডনে আটকে পড়লেন। আর জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর পেটের এ্যাবসিস অপারেশনের জন্য জুরিখ হাসপাতালে ভর্তি হলেন। চারদিকে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হলো। চুয়ান্ন সালের ৩০শে মে তারিখে পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশীপের নির্দেশ জারী হলো। মোট গ্রেফতারের সংখ্যা এক হাজারের উপরে দাঁড়ালো। গভর্ণর ইস্কান্দার মীর্জার দাপটে তখন পূর্ব বাংলার আকাশ-বাতাস কম্পমান হয়ে উঠলো। এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে মীর্জা সাহেব ৫ই জুন তারিখে বললেন, প্রয়োজন দেখা দিলে পূর্ব পাকিস্তানের যে কোনো জেলাতে সামরিক আইন জারী হবে।

শেষপর্যন্ত এই ৯২ (ক) ধারা শাসন আমলেই ১৯৫৪ সালের ৫ই জুলাই তারিখে পূর্ববঙ্গ কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষণা

করা হলো। সুদীর্ঘ ১৬ বছর পর আজও পর্যন্ত এই নির্দেশ রয়েছে। তখন আমি সাঁইত্রিশ নম্বর আগামছিহ লেনে থাকি। ছুটো মাত্র ঘর। সংসার বলতে আমি আর আমার স্ত্রী। পরিবারের সদস্য সংখ্যা তখনও বাড়েনি। দৈনিক ইত্তেফাকে কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন বাসায় ফিরে আসি। পরিচিত বন্ধু-বান্ধব কারো সাথে দেখা হয় না বললেই চলে। ওরা অনেকেই নাজিমউদ্দিন রোডে আশ্রয় লাভ করেছেন। বাকী প্রায় সবাই ইউ, জি অর্থাৎ আত্মগোপন করেছেন।

এমনি সময় একদিন রাতে হঠাৎ করে আলতোভাবে দরজা ধাক্কা দেয়ার আওয়াজ পেলাম। খুলেই দেখি এক অপরিচিত ভদ্রলোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কা'কে চাচ্ছেন? ভদ্রলোক বিনীতভাবে বললেন "—" বলেছেন। ঢাকা শহরে অসুবিধায় পড়লে, আপনার স্মরণাপন্ন হতে। আমার এখন শেল্টার দরকার।" আমি কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করেই ভদ্রলোককে নিয়ে পিছনের ঘরটাতে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। শুধু জানতে পারলাম আগামীকাল সকালে তাকে যে ভাবেই হোক নারায়ণগঞ্জে পৌঁছতে হবে। খুব ভোরে উঠে মোড় থেকে খান কয়েক ভাল পুড়ী এনে দেখলাম যার জন্য নাস্তার আয়োজন করছি তিনি অনেক আগেই চলে গেছেন। আমি শুধু শুন্য চৌকিটার দিকে ক্ষনিকের তরে তাকিয়ে রইলাম।

এ সময় দৈনিক ইত্তেফাক থেকেও কয়েকজন গ্রেফতার হলো। এদের মধ্যে জনাব এম, এ ওয়াদুদ অন্যতম। প্রথমে ছাত্রলীগ ও পরবর্তী জীবনে আওয়ামী লীগের জন্য সমগ্র পূর্ব বাংলায় যে কজন কর্মী নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেছেন তাদের মধ্যে ওয়াদুদ অন্যতম। আওয়ামী লীগের আদি ও অকৃত্রিম কর্মীদের নামের তালিকা প্রকাশ করতে হলে এম, এ ওয়াদুদের নাম সর্ব প্রথমে উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু নিয়তির পরিহাস, এবারের নির্বাচনে ওয়াদুদ সাহেব চাঁদ-

পুরের একটা এলাকা থেকে প্রাদেশিক পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আওয়ামী লীগের একটা টিকিট চেয়ে বিফল হয়েছেন। কিন্তু জীবন যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত পক্ককেশধারী ওয়াহুদ সাহেব তাঁর সেই অমায়িক হাসি মুখে রেখেই এখনও পর্যন্ত নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি অবিচল রয়েছেন। তাই ওয়াহুদের কথা চিন্তা করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। আজীবন আওয়ামী লীগের সেবক হয়েও তিনি আওয়ামী লীগের একটা নমিনেশন পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারলেন না এটাও আমাদের দেখতে হলো।

যাক, যা বলছিলাম। চুয়ান্ন সালের ৫ই জুলাই তারিখে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মেজর জেনারেল আইয়ুব খান ঢাকা সফরে এলেন। আর ৭ই জুলাই তৎকালীন গণপরিষদে রংপুরের জনাব আবুল কাশেম প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের মূলনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য এক প্রস্তাব স্থাপন করে বললেন, মুসলিম লীগ সদস্য ছাড়া আগামী একুশ বছর পর্যন্ত অন্য কাউকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়া হবে না। জনাব কাশেমের এই 'উদ্ভট' প্রস্তাবে সবাই স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। গভর্ণর শাসন বহাল থাকা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার সংবাদপত্র আর রাজনীতিবিদরা এ' ধরণের প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। এমনি এক সময়ে একটা গুজব ঘটলো যে, কারাগারে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। তাই শেষ পর্যন্ত আওয়ামী মুসলিম লীগের তৎকালীন সহ-সভাপতি জনাব আতাউর রহমান বেগম শেখকে সংগে করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে শেখ সাহেবের সংগে সাক্ষাত করে, এক বিবৃতি দিয়ে গুজবের অবসান ঘটালেন। এ সময় শেখ সাহেবকে জেলগেট দুর্ঘটনার মামলার হাজতি আসামী হিসাবে রাখা হয়েছিল।

রাজনীতির গতি বড়ই বিচিত্র। এবারের সাধারণ নির্বাচনের সময় জনাব আতাউর রহমান আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে নিজস্ব

দল গঠন করেছেন। শুধু তাই-ই নয় শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে টঙ্গী এলাকায় দলীয় প্রতিনিধি দাঁড় করিয়ে তীব্র প্রচারণা চালাচ্ছেন। আর শেখ মুজিবুর ধামরাই এলাকায় যেয়ে প্রকাশ্য জনসভায় জনাব আতাউর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিন্দা করে এসেছেন। অথচ একসময় এই শেখ মুজিবুর রহমানই মরহুম শেরে বাংলার পরিবর্তে জনাব আতাউরকে যুক্তফ্রণ্টের দলীয় নেতাদের নির্বাচনের জন্য কী প্রচেষ্টাই না চালিয়ে ছিলেন! শেখের প্রচেষ্টা ছাড়া বোধ হয় আতাউর রহমান সাহেবের পক্ষে সেদিন পূর্ব বংগের মন্ত্রী হওয়া সম্ভব হোতনা। আবার 'কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' আসামী হিসাবে যখন শেখ সাহেব কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন এই আতাউর রহমান আর সালাম খানেরাই আইনজীবি হিসাবে শেখের পক্ষ সমর্থন করে রাতদিন কী অমানুষিক পরিশ্রমই না করেছেন। কিন্তু প্রেম, যুদ্ধ আর রাজনীতিতে 'ফাউল' বলে কোন শব্দ নেই। তাই আজ এঁদের মধ্যে রাজনৈতিক লড়াই এখন চরমে উঠেছে।

হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম, শেরে বাংলার কে, এস, পি দলের সংগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর একটা আঁতাত হতে যাচ্ছে। এদিকে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আর গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। তাই বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বললেন, জনাব ফজলুল হক কোলকাতার বিবৃতির জন্য এককভাবে দায়ী নন। সম্ভবত তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন বলেই হঠাৎ করে এ ধরণের বিবৃতি দিয়েছেন। তাই মামলা করে জনাব হককে এই বৃদ্ধ বয়সে আর হয়রানি করবার ইচ্ছে সরকারের নাই। এ বিবৃতির দিন কয়েক পরেই সম্ভবত ২৩শে জুলাই তারিখে মরহুম শেরে বাংলা রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। শেরে বাংলার

এ ঘোষণার পর যুক্তফ্রন্টে ভাঙ্গনের আভাষ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কেননা আওয়ামী লীগ ওয়ালারা জনাব আতাউর রহমানকে যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা হিসাবে নির্বাচিত করবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। আর শেরে বাংলা জনাব আবু হোসেন সরকারকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এই সময়ের জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেন। তাই কেন্দ্রীয় সরকার দুপক্ষকেই উৎসাহ দিতে লাগলেন। কেবল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী লণ্ডন থেকে দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালীন সম্পাদকের কাছে একটা চিঠি লিখলেন।

…আমার পক্ষে বিদেশ থাকা নেহায়েত কষ্টদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। মন সর্বদাই দেশে ফিরিতে চায়। যুক্তফ্রন্ট সদস্যরা যাহাতে কোনরূপ দলাদলি না করেন, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। কিন্তু নিয়তির বিধান কে খণ্ডাতে পারে! যুক্তফ্রন্ট দলের ভাংগন তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ক্ষমতা দখলের লড়াই তখন চরমে উঠেছে। শতসহস্র রাজনৈতিক কর্মী কারান্তরালে থাকা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টের দুটো উপদল তখন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মন তুষ্টির জন্য মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে।

পূর্ববাংলায় কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষণা করার মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের ২৪শে জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। কমিউনিষ্টরা পাকিস্তানের শত্রু এ ধরণের একটা সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সন্দেহে বিয়াল্লিশজনকে গ্রেফতার করা হয়। পূর্ববাংলার কমিউনিষ্ট বিরোধী একটা প্রভাবশালী মহল কিন্তু এ পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণার বিরোধী ছিল। এদের মতে এখানকার লোকেরা যখন কমিউনিজম পছন্দ করে না, তখন সাধারণ

মানুষেরাই পার্টি ওয়ার্কারদের প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে শায়েস্তা করবে। পরবর্তীকালে এই মহল কয়েক দফায় বামপন্থীদের উপর এ অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলো। এমনকি সুদীর্ঘ ষোল বছর পরে ১৯৭০ সালে দেশের একটা যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এখনও সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে বৈকি! অথচ এরা একবারের জন্যও আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী পশ্চিম বাংলার ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করছে না। ভাবছে এক মাঘেই শীত যাবে।'

এ দিকে কথা নেই বার্তা নেই ২৬শে জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র মিয়া ইফতেখারউদ্দীনের আজাদ পাকিস্তান পার্টির অফিসগুলোতে তালা বন্ধ করে দেয়া হয়। এ ছাড়া সর্বত্র কেন্দ্রের নির্দেশে প্রাদেশিক সরকারগুলো মারাত্মক দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশ্য কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা বুঝতে পারলাম যে এ সবই করা হচ্ছে শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর অস্তিত্ব বিলুপ্তি সাধন করে পাঞ্জাব প্রধান এক ইউনিটের সৃষ্টি করা। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন যতগুলি গণবিরোধী কাজ করেছিলেন এক ইউনিট সৃষ্টি তার মধ্যে অন্যতম। অথচ মাত্র পনর বছর পরে সমগ্র পাকিস্তান ব্যাপী প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের ফলে সেই সাধের এক ইউনিট ১৯৬৯ সালে সমাধিস্থ হয়েছে। হয়তো দশ বছর পরে স্কুল কলেজের ছাত্ররা এক ইউনিট সম্পর্কে পাদটীকা লিখবে হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে কেউবা এর উপর রিসার্চ করে ডক্টরেট পাবে।

পাকিস্তান কায়েম করার পর চুয়ান্ন সালে পূর্ব বাংলায় এক ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছিল। এ বন্যায় প্রদেশের প্রায় অর্ধেক এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শুধু তাই-ই নয় বন্যাগ্রস্ত এলাকায় ভয়াবহ আকারে মহামারী দেখা দিয়েছিলো। তাই সরকারকে বাধ্য হয়েই ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বগুড়া রাজশাহী, পাবনা,

আর ময়মনসিংহ জেলাকে মহামারী এলাকা বলে ঘোষণা করতে হয়েছিলো। ঠিক এমনি সময়ে পূর্ববঙ্গ সরকারের সংযোগ বিভাগের প্রথম ডাইরেক্টর ও এককালীন প্রখ্যাত বাংগালী মুসলমান সাংবাদিক জনাব মোহাম্মদ হোসেন মাত্র পয়ঁতাল্লিশ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। ঢাকার প্রবীণ সাংবাদিক মহলে এখনও পর্যন্ত সদালাপী ও রসিক মাহমুদ হোসেন সাহেবের কথা আলোচিত হয়।

এদিকে পঁচিশে আগষ্ট তারিখে গবর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ঢাকায় এসে হাজির হলে বিমান বন্দরে যুক্তফ্রন্টের দু'টো উপদলের নেতৃবৃন্দ জেনারেলকে মাল্যভূষিত করার জন্য প্রতিযোগিতা করল। সমগ্র পূর্ববাংলা তাদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আসল চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। ক্ষমতা দখলের উদগ্র বাসনায় তখন এরা মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। এদের তখন একটাই মাত্র পণ—ছলে কৌশলে বাংলার স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতা দখল করতেই হবে। অথচ তখনও পর্যন্ত কয়েক হাজার রাজনৈতিক কর্মী হয় কারান্তরালে বিভিষীকাময় জীবন যাপন করছে না হয় পলাতকের জীবন বেছে নিয়েছে। আর বন্যা বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ ক্ষুধাকে তাদের নিত্যসঙ্গী হিসাবে বরণ করেছে।

নিয়তির পরিহাস! মাত্র ষোল বছর পরে এবারের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই ক্ষমতা ভাগাভাগি করার ব্যাপারে মহল বিশেষে কি একই ধরনের নিলর্জতা প্রকট হয়ে ওঠেনি? অথচ চুয়ান্ন সালের বাংলাদেশ ছিল বন্যা বিধ্বস্ত আর এবারের বাংলাদেশে ঘূর্নিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে করুণ ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুনেছি আলজিরিয়ার ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করতে যেয়ে সাত লাখ দেশপ্রেমিক শহীদ হয়েছিল, ভিয়েৎনামের রক্তক্ষয়ী

সংগ্রামে নয় লাখ লোক আত্মাহুতি দিয়েছে আর নাগাসিকা ও হিরোশিমায় প্রায় তিন লাখ আনবিক বোমায় নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো। কিন্তু মাত্র দশ ঘণ্টার ঘূর্ণিঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দক্ষিণ বাংলায় দশলাখ আদম সন্তানের মৃত্যু মানব ইতিহাসে বিরল। স্মরণাতীত কালের ইতিহাসে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বীভৎস ঘটনা। প্রায় সাত হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে যে ধ্বংসলীলা এখনও পর্যন্ত বিরাজ করছে তা সমগ্র দুনিয়াকে স্তম্ভিত করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে শতাধিক বিদেশী সাংবাদিক শুধু মাত্র এ' ধ্বংসলীলার খবর সংগ্রহের জন্য এসে হাজির হয়েছে। এদের সংবাদের উপর ভিত্তি করেই প্রতিদিন শত শত টন রিলিফ দ্রব্য বিমানে ঢাকায় এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আজ আমরা কি ব্যবহার পেলাম? এটাই সাত কোটি বাঙ্গালীর মনে একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। মওদুদী-ভুট্টো-নসরুল্লা-দৌলতানার দল সংহতির বুলি মুখে নিয়ে এখানে ছুটে এলেন না? কে এর জবাব দেবে? কেন্দ্রীয় সরকারের বাংগালী মন্ত্রীদের কি হৃদয় বলে কিছুই নেই? এরা কি মানুষ না মেশিন? শেখ আর ভাসানী ছাড়া পূর্ব বাংলার আর কোন রাজনৈতিক নেতা কেন এ ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত 'মৃত্যু ফাঁদে' বুভুক্ষ মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন না? অথচ এঁরাই আমাদের নেতা এঁরাই পদপ্রদর্শক এঁরাই আমাদের ভোট প্রার্থী। এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কি হতে পারে?

বাংলার আকাশ বাতাস এখন লাখো লাখো মৃত আত্মায় ভরপুর। এখনও চার লাখের মত পুতিগন্ধময় লাশ উন্মুক্ত আকাশের নীচে উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে অভিশাপ দিচ্ছে। আর মৃত্যুর গহ্বর থেকে বেঁচে আসা প্রায় ত্রিশ লাখ লোক মৃত্যু ফাঁদের' মধ্যে হা অন্ন, হা অন্ন করে আল্লার দরবারে ফরিয়াদ করছে। দশ লাখ লাশের উপর

দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে নির্বাচনের কথা বলা মহাপাতকের কাজ নয় কি ? ইতিহাস এদের কোন দিন ক্ষমা করতে পারবে কি ?

পাকিস্তানের পার্লামেন্টারী রাজনীতির ইতিহাসে দু'টো নাম চিরদিনের জন্য উল্লিখিত হবে। এর মধ্যে একজন হচ্ছেন রংপুরের জনাব আবুল কাশেম। ১৯৫৪ সালে ৭ই জুলাই তারিখে এক প্রস্তাব দিয়ে বললেন যে আগামী একুশ বছর পর্যন্ত পাকিস্তানের কোন সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী ছাড়া আর সব দলীয় প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করে দেয়া হোক। নিয়তির পরিহাস ; পরবর্তী কালে রাজনীতির মার প্যাঁচে জনাব কাশেমকেই ক্ষমতাসীন কনভেনশন মুসলিম লীগ থেকে বেড়িয়ে এসে দৌলতানা মুসলিম লীগে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। আর এবার পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনাব কাশেম চরম সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছেন। জানি না এতবড় পরাজয়ের পরও তার মতাদর্শের পরিবর্তন হবে কি না।

মোনেম খান সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী বগুড়ার জনাব আবদুল আলীম একবার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে পাকিস্তানের আজীবন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবার প্রস্তাব করেছিলেন। সেই সময় ইন্দোনেশিয়ার আজীবন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ মার্কিনী ষড়যন্ত্রের বলি হওয়ায় জনাব আলীমের এ'প্রস্তাব ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেনি। আশ্চর্যের কথা জনাব কাশেম ও জনাব আলীম এ দু'জনের একজনও পূর্ব বাংলার সন্তান নন। জনাব কাশেম আসাম থেকে ও জনাব আলীম পশ্চিম বাংলা থেকে পূর্ব বাংলায় হিজরত করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯৫৪ সালের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কেননা এ'সময়েই ইন্দোচীনে দিয়েন বিয়েন ফু দুর্গের পতনের দরুণ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ তার ক্ষতবিক্ষত সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করে। ফলে ২০শে জুলাই তারিখে

জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে উত্তর ভিয়েৎনাম একটা পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ একবার দম্ভের সংগে ঘোষণা করেছিল যে, বিশ্বের কোন শক্তির পক্ষে দিয়েন বিয়েন ফু দুর্গের পতন ঘটাতে পারবেনা। ভিয়েৎনামের বীর জনতা এ' চ্যালেঞ্জও গ্রহণ করেছিল, জেনারেল গিয়াপের নেতৃত্বে মুক্তি ফৌজের দল সমস্ত সভ্য জগতকে স্তম্ভিত করে এ'দুর্গ দখল করে নেয়। মুক্তি ফৌজের দুর্বার হামলার মুখে একজন মাত্র নার্স ছাড়া দুর্গে অবস্থানকারী আর কেউ রক্ষা পায়নি। উত্তর ভিয়েৎনামের জনক ডাঃ হো চী মিনের মৃত্যুর পর জেনারেল গিয়াপই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভিয়েৎনামের মাটিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাসের সৃষ্টি করেছেন। শত শত মার্কিনী সৈন্য এখন পর্যন্ত 'পেন্টাগনের' অংগুলি হেলনে ভিয়েৎনামের মাটিতে প্রতিদিন মৃত্যুকে আলিংগণ করছে। ধন্য ভিয়েৎনামের বীর জনতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে তাঁরা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। মহাযুদ্ধের সময় ফরাসীরা পলায়ণ করলে এরা জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। মিত্র শক্তির জয়লাভের ফলে আবার ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে এদের উপর চাপিয়ে দেয়া হলে এরা অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়ে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করেছে আর গত ষোল বছর ধরে ভিয়েৎনামের এ বীর জনতা প্রায় পাঁচ লাখ মার্কিনী সৈন্যের বিরুদ্ধে এক মরনপণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়েও বীরদর্পে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

এ দিকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে তখন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সুদীর্ঘ ছ'মাস পরে ১১ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জুরিখ থেকে করাচীতে ফিরে এলেন। পর দিনই জনাব সোহরাওয়ার্দী তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে আলোচনায় রত হলেন। এ দিকে মরহুম শেরে বাংলা ১৫ই ডিসেম্বর করাচীতে পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী

বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর সংগে শলা পরামর্শ করলেন। যুক্তফ্রন্টের দু'টো উপদলের মধ্যে তখন ক্ষমতা দখলের রেষারেষি চরমে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত সবাইকে অবাক করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর বগুড়ার মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী হিসাবে যোগ দিলেন। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলাদেশের সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভায় যেখানে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী অর্থমন্ত্রী ছিলেন, রাজনীতির অপার মহিমায় ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভায় সেই জনাব সোহরাওয়ার্দী আইন মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলেন। আশ্চর্য হলেও এ কথা বলতে বাধা নেই যে তখন হক-সোহরাওয়ার্দী মধ্যে কোন আলোচনা পর্যন্ত হয়নি। আইনমন্ত্রী হবার পরই গোলাম মোহাম্মদের অনুরোধে জনাব সোহরাওয়ার্দী সমগ্র পাকিস্তান সফর করে বেড়াতে শুরু করলেন। ঢাকায় পল্টন ময়দানের এক জনসভায় তিনি বললেন প্রয়োজন হলে সামরিক আইনের মাধ্যমে সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র দেয়া হবে। এ সময় শেরে বাংলা ফজলুল হক তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে পূর্ব বাংলায় অনেক কটা জনসভা করে সংখ্যাসাম্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন। নিয়তির পরিহাস জনাব ফজলুল হক ১৯৫৪ সালের প্রথমার্ধে যে সংখ্যাসাম্য নীতির বিরোধিতা করেছিলেন ১৯৫৬ সালে পাঞ্জাবী ক্লিকের হোতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সেই সংখ্যাসাম্য ও এক ইউনিটের ভিত্তিতে একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন।

যা' হোক শেষ পর্যন্ত জনাব সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পরোক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আশিজন (পূর্ব পাক-৪০+পঃ পাক-৪০) সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদ গঠনের নির্দেশ দিলেন। এ পরিষদে সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগ তেরোটা আসন দখল করলেন। মারীতে এ'

পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিলো বলেই এর নাম মারী গণ পরিষদ দেয়া হয়েছিল।

এ দিকে অবস্থা বেগতিক দেখে পূর্ব বাংলা এককালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন ১৯৫৫ সালের ২রা জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। জনাব আমীন চুয়ান্নর প্রাদেশিক নির্বাচনে ছাত্র নেতা খালেক নেওয়াজ খানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। জনাব খান পরবর্তী কালে আয়ুব শাসনামলে কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদান করেছিলেন। আর জনাব নুরুল আমীন দক্ষিণ পন্থী রাজনীতি করলেও মুসলিম লীগে ফিরে যান নি। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে সমগ্র পূর্ব বাংলা থেকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একমাত্র তিনিই নির্বাচিত হয়ে এর পুরস্কার লাভ করেছেন।

যাক যা বলছিলাম। ১৯৫৫ সালের ৫ই জানুয়ারী তৎকালীন যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্যারিস থেকে বোম্বাইয়ে হাজির হলেন, আওয়ামী লীগের একটা মহল মওলানাকে দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য জনাব সোহরাওয়ার্দীর উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। এ দিকে মওলানা সাহেব এসে কোলকাতার টাওয়ার হোটেলে আস্তানা গাড়লেন। এ সময় তিনি একবার আসাম সফরে গিয়েছিলেন। এর পর তিনি আর তার যৌবনের রাজনীতির লীলাক্ষেত্র আসামে যেতে পারেন নি। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় মওলানা ভাসানী ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। সেদিন ঢাকার বিমান বন্দরে এক অভূত পূর্ব জনসমাবেশ হয়েছিল, আর জনাব সোহরাওয়ার্দী সেখানে উপস্থিত থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীকে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। এর মাস কয়েকের মধ্যেই পাঞ্জাবী ক্লিকের ফল হিসাবে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিসভার

পতন হলো। জনাব আলী ওয়াশিংটনে আবার পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে ফিরে গেলেন। শেরে বাংলার সমর্থনে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর দলবল সহ আরেক বিরোধী দলে আসন গ্রহণ করলেন।

শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টদল দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। মরহুম শেরে বাংলা জনাব এ, কে, ফজলুল হক, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে যোগ দিলেন। নিয়তির পরিহাস ১৯৫৪ সালে যে মহান নেতাকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়েছিল, তিনি মাত্র এক বছরের ব্যবধানে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ দখল করলেন। এ দিকে শেরে বাংলার স্নেহাস্পদ রংপুরের মরহুম আবু হোসেন সরকার পূর্ব বাংলায় একচল্লিশ জন সদস্য বিশিষ্ট (পার্লামেণ্টারী) সেক্রেটারীসহ এক মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। জনাব সরকার তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কখনও মুসলিম লীগের দু'আনার সদস্যও হননি। এছাড়া জনাব নুরুল আমীনের রাজত্বে তিনি একবার নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে কারা জীবনযাপন করেছিলেন। যা হোক জনাব সরকারের মন্ত্রীসভা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কেননা যুক্তফ্রণ্টের প্রধান অংগদল আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের আসনে সমাসীন থাকায় জনাব সরকারকে অধিকাংশ সময় দলীয় শক্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য ব্যয় করতে হয়েছিলো। ফলে এ সময় সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তিদান আর কলমের এক খোঁচায় জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ছাড়া কোন গঠনমূলক কাজ হয়নি বললেই চলে।

ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়তে শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রী জনাব সরকার এ সময় তাঁর মন্ত্রীসভার জনপ্রিয়তা রক্ষা করবার জন্য আর দলীয় এম, এল, এদের সন্তুষ্ট করবার

উদ্দেশ্যে সরকারী গুদাম থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ মন খাদ্যশস্য দশটাকা মন হিসাবে পারমিট ইস্যু করে পরিষদ সদস্যদের মাধ্যমে বিতরণ করে দেন। তাই কৃষক শ্রমিক পার্টির ক্ষমতাসীন এই মন্ত্রীসভাকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও মহল বিশেষ থেকে মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও উত্থাপন করা হয়।

অন্যদিকে কেন্দ্রে মুসলিম লীগ কৃষক শ্রমিক কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালীনই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পাশ করা হয়। এ শাসনতন্ত্রে সংখ্যাসাম্য আর এক ইউনিট এ'দুটো অগণতান্ত্রিক বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিলো। অবশ্য পরবর্তীকালে সামরিক শাসন জারীর ফলে এ শাসনতন্ত্র বাতিল হয়।

ছাপ্পান্ন সালের শাসনতন্ত্র পাশ করার সময় পাকিস্তান গণপরিষদের বিরোধী দলীয় সমস্ত আওয়ামী লীগ সদস্যই শাসনতন্ত্রে দস্তখত না করে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। কেবলমাত্র আওয়ামী লীগের দলীয় নেতা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ শাসনতন্ত্রে সই করেছিলেন।

এর মাস কয়েকের মধ্যেই শেরে বাংলা মরহুম জনাব এ, কে ফজলুল হক পূর্ব বাংলার গভর্ণর হিসাবে নিযুক্ত হলেন। জনাব হক গভর্ণর হিসাবে আবু হোসেন সরকারের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে বাঁচাবার বহু প্রচেষ্টা করলেন। কিন্তু তবুও তিনি শেষরক্ষা করতে পারলেন না। পূর্ব বাংলায় তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দিল আর কিছুসংখ্যক পরিষদ সদস্য সরকারপক্ষ ত্যাগ করে আবার আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিতে যোগ দিলেন। ফলে জনাব আবু হোসেন সরকারের পক্ষে বাজেট পাশ করানো সম্ভব হলোনা। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে জনাব সরকার পদত্যাগ করলেন। শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন সুষ্ঠু মন্ত্রীসভার অভাবে গভর্ণর ফজলুল হক নিজেই দস্তখত করে বাজেট পাশ করলেন।

এ দিকে ঢাকার রাস্তায় তখন ভুখা মিছিল শুরু হয়ে গেছে। বুড়িগঙ্গা নদীর ওপার থেকে প্রতিদিনই দলে দলে বুভুক্ষু জনতা এসে ঢাকার রাজপথ সরগরম করে তুললো। সেদিন ছিল শুক্রবার। সকাল ৯টার দিকে হঠাৎ করে পুলিশ চকবাজারে কেরানীগঞ্জ, জিঞ্জিরা এলাকা থেকে আগত ভুখা জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে বসলো। ফলে ঘটনা স্থলেই তিনজন নিহত হলো। আর দাবানলের মতো এই হত্যাকাণ্ডের খবর সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়লো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই এক বিরাট প্রতিবাদ মিছিল চকবাজার থেকে নিহতদের লাশ বহন করে সদরঘাট হয়ে নবাবপুর এলাকার দিকে রওয়ানা হলো। আজকের নির্বাচন বীর শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন এ ভুখা মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নিহতদের লাশ আর রক্তমাখা কাপড় বহন করে সেদিনকার এ ভুখা মিছিলের আর্তনাদে ঢাকার আকাশ-বাতাস গুমরে কেঁদে উঠলো। আর ঢাকাবাসী আক্রোশে ফেটে পড়লো।

তাই শেষ পর্যন্ত গভর্ণর জনাব ফজলুল হক আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির তৎকালীন নেতা জনাব আতাউর রহমানকে সেই দিনই মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানালেন। রক্তস্নাত ঢাকার গভর্ণর ভবনে আতাউর রহমানের মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করলেন। শেখ মুজিবুর রহমান এই মন্ত্রিসভায় শিল্প ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। এটাই হচ্ছে শেখ সাহেবের দ্বিতীয় দফার মন্ত্রীত্ব পদলাভ। তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এ সময় পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটের খুবই দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা তাঁর 'প্রাসাদ রাজনীতির' চক্রান্তে মুসলিম লীগকে দ্বিধা বিভক্ত করতে সক্ষম হলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই মীর্জা সাহেবের

কারসাজিতে নবগঠিত রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দিলেন। এই রিপাবলিকান পার্টির নেতা হিসাবে ডাঃ খান সাহেব পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিটের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। আর কেন্দ্রীয় পরিষদে রিপাবলিকান পার্টির সদস্যরা মোহাম্মদ আলীর প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করায় মুসলিম লীগ কৃষক শ্রমিক পার্টির কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটলো। আর রিপাবলিকান সদস্যদের সমর্থনে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রে সরকার গঠন করলেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর আজীবনের স্বপ্ন ও সাধনা বাস্তবায়িত হলো।

এ সময় কেন্দ্রীয় পরিষদে জনাব সোহরাওয়ার্দী সহ আওয়ামী লীগের মাত্র তেরোজন সদস্য ছিল। তবু রিপাবলিকানদের সমর্থনে সরকার গঠনে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হলোনা। জনাব সোহরাওয়ার্দী মাত্র তেরো মাসকাল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে তাঁকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। কেননা তিনি নিজে পশ্চিমা ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী হলেও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গনতন্ত্রে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির উল্লেখ থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ সময় বহু প্রগতিশীল বামপন্থী কর্মী ও নেতা আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন বলে, এঁরা দলের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে প্রকাশ্যভাবেই জনাব সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্র নীতির সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন পররাষ্ট্রক্ষেত্রে জনাব সোহরাওয়ার্দী একটা ব্যাপারে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন যে 'পাকিস্তান সিয়াটো সদস্য হওয়া সত্ত্বেও গণচীনের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। তাই জনাব সোহরাওয়ার্দী শুধুমাত্র লোকায়ত্ত চীন সফর করলেন তাই-ই নয়, তারই, আমন্ত্রনক্রমে ১৯৫৬ সালের

ডিসেম্বর মাসের শেষার্দ্ধে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই মার্শাল হোলুংকে সংগে করে পাকিস্তান সফরে আগমণ করলেন। এ সময় পূর্ব বাংলায় চৌ এন লাই যে অভূতপূর্ব আর প্রাণঢালা সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন তা পাকিস্তানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। এটাই ছিল বিশ্বের কমিউনিষ্ট দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের প্রথম পাকিস্তান সফর। এ সফরের ফলে পাকিস্তান আর চীনের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা হয়েছিলো তা আজ বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অবশ্য পাক-চীন মৈত্রী স্থাপনের কিছুদিন আগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারীতে এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই কাগমারী সম্মেলন নানা কারণে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে।

একথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে মাত্র বছর চৌদ্দ আগেও এই পাকিস্তানে যুক্ত আর পৃথক নির্বাচনের প্রশ্ন নিয়ে এক তুমুল রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। চরম ধর্মান্ধ আর প্রতিক্রিয়াশীলদের দল চিন্তা করেছিল যে, যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমেই তারা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। তাই তারা পৃথক নির্বাচনের শ্লোগান উত্থাপন করে জেহাদের সৃষ্টি করলো। কিন্তু তারা মুসলিম জনসাধারণকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, 'যুক্ত নির্বাচন' চালু হলে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। অবশ্য এদের সংগে এক শ্রেণীর সংকীর্ণমনা প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু নেতাও পৃথক নির্বাচনের পক্ষে আওয়াজ তুললেন। কেননা এরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুক্তনির্বাচনের মধ্যেই এদের মৃত্যুবাণ রয়েছে। কেননা পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে যেখানে পূর্ববঙ্গ পরিষদে মোট ৩০৯ টা আসনের মধ্যে ৭২ টা অমুসলিমদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রয়েছে যেখানে যুক্ত নির্বাচনের মারফত তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ একেবারে 'ফরসা' হয়ে পড়বে। কেননা তখন একজন

সদস্যকে নির্বাচিত হতে হলে হিন্দু আর মুসলমান সম্মিলিত জনসাধারণের আস্থাভাজন হতে হবে। সে ক্ষেত্রে উদার মনোভাবাপন্ন লোক ছাড়া নির্বাচিত হওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর নয়। এছাড়া সংখ্যলঘু ভোটাররাও সমান অধিকার সম্পন্ন নাগরিক হিসাবে নিজেদের বিবেচনা করতে সক্ষম হয়। উপরন্তু এতে করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। তাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যুক্তনির্বাচন পদ্ধতি অব্যাহত থাকায় মেসার্স গোলাম আযম, আতাহার আলী, ফজলুল কাদের চৌধুরী আর মনোরঞ্জন ধর পরাজয়ের গ্লানি বহন করেছেন বলেই মনে হয়।

মওলানা আবুল আলা মওদুদী ১৯৫৭ সালে পৃথক নির্বাচনের পতাকা কাঁধে নিয়ে ইসলামের বুলি কপচিয়ে প্রথম পল্টন ময়দানে জনসভা করতে এলেন। জনসভার আয়োজন করতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় সে বছর আমরা তা বুঝতে পারলাম। বক্তৃতা মঞ্চের উপর গালিচা পেতে সোফাসেট বসানো হলো। বক্তাদের সুবিধার জন্য 'কুলুকদান' আনা হলো এছাড়া বিপুল জন সমাবেশের আশায় উদ্যোক্তরা লাইন করে মঞ্চে মাইক্রোফোন বসালেন আর প্রায় ডজন খানেক ডে লাইটের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ঢাকাবাসী শেষ পর্যন্ত এ জনসভা অনুষ্ঠিত হতে দেয়নি। কেননা প্রধান বক্তার বক্তৃতার আগেই জনৈক 'চুনোপুটি' বক্তা বাংগালীদের ইসলাম প্রীতি নেই বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন আর বলেছিলেন যে, যুক্তনির্বাচনের সমর্থনের অর্থই হচ্ছে 'ভারতের স্বার্থে কাজ করা'। এরপর ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। একদিকের ইট আর একদিকের লাঠি, মধ্যে পুলিশ। ঘন্টা দুয়েক ধরে একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়ে জনসভার পরিসমাপ্তি ঘটলো।

জনসভায় ভাষণ দানের উদ্দেশ্যে মওলানা মওদুদী যখন নিজস্ব দলীয় প্রধান হিসাবে দ্বিতীয় বার ঢাকায় এলেন, তখন

বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক পানিই বঙ্গোপসাগরে চলে গেছে। তাই ১৯৭০ সালের জনসভা শুধু মারামারিতেই সীমাবদ্ধ ছিলো তাই-ই নয়, এবার দু'জন ছাত্র নিহত হলো। কেননা বাংগালী জাতীয়তাবাদের শ্লোগানে আচ্ছন্ন পূর্ব বাংলায় যেখানে ন্যাপ ওয়ালী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক ওসমানীকে বাংলা জানেন না বলে পল্টন ময়দানে চীৎকার করে বসিয়ে দেয়া হলো, সেই ময়দানে একজন উর্দুভাষী বক্তাকে দিয়ে মওলানা মওদুদীর জনসভার কাজ শুরু হলো। তাই এ জনসভার 'নতিজা' সহজেই অনুমান করা সম্ভব। ইষ্টকবৃষ্টি, ছোরা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি লাঠি চার্জ আর হত্যার মধ্যে জনসভার পরিসমাপ্তি ঘটলো। মওলানা সাহেব ঢাকায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও শুভকাংখীদের পরামর্শে এ সভায় শেষ পর্যন্ত যোগ দেননি।

যাক যা বলছিলাম। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন পাকিস্তান পার্লামেন্টের ঢাকা অধিবেশনে যুক্ত নির্বাচনের আইন পাশ করা হয়। অবশ্য প্রথম দিকে জনাব সোহারাওয়ার্দী নিজেও পৃথক নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। পরে সহকর্মীদের যুক্তির কাছে নতি স্বীকার করে যুক্তনির্বাচনের প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান। এই জনাব সোহরাওয়ার্দীই প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে যুক্তনির্বাচনের ভিত্তিতে ভোটার লিষ্ট প্রণয়ন ও ছাপার ব্যবস্থা করে অবিলম্বে ছাপান্ন সালের শাসন তন্ত্রের ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য এ শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রের মুলনীতি 'এক মাথা এক ভোট' খানিকটা পরিহার করে সংখ্যা সাম্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতে করে পাকিস্তানের শতকরা ছ' ভাগ বাংগালী জনসাধারণকে কাগজে কলমে গায়েব করা হয়েছিল। আর পশ্চিম পাকিস্তানে শতকরা ছ'ভাগ অবাংগালীর সংখ্যা কৃত্রিম ভাবে বাড়ানো হয়েছিল। কেননা কঠিন বাস্তবে আমরা হচ্ছি প্রতি একশ জনে ৫৬ আর

ওরা হচ্ছে ৪৪ জন। তবুও প্রাসাদ চক্রান্তের দল সংখ্যা সাম্যের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচনের বিরোধিতা করে বসলো। তাই মাত্র তেরো মাসের মাথায় তেরো সদস্য আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদচ্যুত হলেন। মুসলিম লীগ পার্টির নেতা জনাব ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রীগড় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর গদীতে অধিষ্ঠিত হলেন। কেন্দ্রে আর একটা কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলো। এ সময়ে কক্সবাজারের জনাব ফরিদ আহাম্মদ এ' মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। জনাব চুন্দ্রীগড় প্রধানমন্ত্রী হয়েই ভোটার তালিকা পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে পুনরমুদ্রনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু খুবই স্বল্প সময়ের মধ্যেই রিপাবলিকান আর আওয়ামী লীগের বিরোধিতার মোকাবিলায় জনাব চুন্দ্রীগড় পদত্যাগ করলেন। এবার আওয়ামী লীগের সমর্থনে রিপাবলিকান পার্টির নেতা জনাব (লর্ড) ফিরোজ খান নুন নয়া প্রধানমন্ত্রী হলেন। জনাব নুন যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালে মার্চ মাসে সারা দেশ ব্যাপী প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওয়াদা ঘোষণা করলেন।

এ দিকে পূর্ব বাংলার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করে অসাম্প্রদায়িক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ করা হলো। সদরঘাটের রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু জনাব সালাম খানের নেতৃত্বে কিছু দক্ষিণ পন্থী আওয়ামী লীগার এ সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করেন। এমনকি এরা আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি পর্যন্ত পরিত্যাগ করে জনাব আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেছিলেন। মুল আওয়ামী লীগের এ দলটা এখন পিডিপির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদিকে টাঙ্গাইলের কাগমারী সম্মেলনে

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের বামপন্থী উপদলের সংগে বাকী আওয়ামী লীগারদের প্রকাশ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। আজকের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দু'টো গ্রুপই এ সময়ে মোটামুটি ভাবে আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বাংলা জাতীয় লীগের সম্পাদক ও অধুনালুপ্ত পূর্ব পাকিস্তান যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব অলী আহাদ তখন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ছিলেন। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে তখন আওয়ামী লীগের বামপন্থী উপদল পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে আপোষহীন মনোভাব প্রকাশ করলো। আর জনাব সোহরাওয়ার্দী সবাইকে শুধু বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ৮০ জন সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টে তাঁর দলীয় প্রতিনিধিদের সংখ্যামাত্র ১৩ জন। তাই পার্টির প্রতিটি ম্যাণ্ডেট অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব নয়। এছাড়া পাকিস্তান সিয়াটো আর সেন্টোর (বাগদাদ প্যাক্ট) সদস্য হওয়া সত্ত্বেও জনাব সোহরাওয়ার্দীই প্রথমে লোকায়ত্ত চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এসব সত্ত্বেও বহু তর্কবিতর্কের পর কাগমারী সম্মেলনে পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগ তার আগের প্রস্তাবটাই উল্লেখ করে তা জনাব সোহরাওয়ার্দী মারফত বাস্তবায়নের প্রশ্নে নিশ্চুপ থাকলো। মওলানা সাহেব পার্টিকে ভাংগনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ সিদ্ধান্তে মত দিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেলো যে, কাগমারী সম্মেলনে পররাষ্ট্র প্রশ্নে পুরোপুরি বামপন্থীদের তৈরী খসড়া প্রস্তাব পাস হয়েছে বলে মওলানা সাহেবের দস্তখতে ঢাকার খবরের কাগজ গুলিতে বিবৃতি এসে হাজির হলো। ফলে চারদিকে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো। যে দৈনিক ইত্তেফাকের মাস্তুলে একদিন পরিচালক হিসাবে মওলানা ভাসানীর নাম ছাপা হতো, আর যে ইত্তেফাক মওলানা ভাসানীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, সেই ইত্তেফাক প্রকাশ্যভাবে মওলানার সমালোচনায়

মুখর হয়ে উঠলো। আমি তখন দৈনিক ইত্তেফাকের চীফ রিপোর্টার হিসাবে চাকুরী করছিলাম। তাই এখনও পর্যন্ত কাহিনী আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসছে।

এদিকে দৈনিক সংবাদ তখন সবেমাত্র মুসলিম লীগের 'খোলস' পরিত্যাগ করে বামপন্থী ঘেষা হয়েছে। তাই কাগমারী সম্মেলনের আগেই দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর মওলানা ভাসানীর বাণী শোভা বর্দ্ধন করতে লাগলো। এতসব ডামাডোলের মধ্যে গুলিস্তান সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হলো। এটাই ছিল আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা ভাসানীর শেষ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মওলানা সাহেব দলত্যগী বামপন্থী আওয়ামী লীগের ও গণতন্ত্র দলের বিলুপ্তি ঘটিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশগুলোর এক ইউনিট বিরোধী ভূস্বামী আর প্রগতিশীল কর্মীরা এ পার্টিতে যোগ দিলেন।

এর মধ্যে একদিন সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফফার খান ঢাকায় এসে হাজির হলেন। গুলিস্তান হলের পিছনে রমনা রেস্ট হাউসে তিনি আস্তানা গাড়লেন। কেন জানিনা রূপকথার নায়ক এ বাদশা খানের একটা ইন্টারভিউ নেয়ার ইচ্ছে হলো। অনেক কষ্টে তৎকালীন ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক ভাইকে কথাটা বললাম। তিনি বললেন, যদিও বাদশা খানের সংগে আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের যথেষ্ট বিরোধ রয়েছে, তবুও একটা ইন্টারভিউ নিয়ে ছাপাবার ব্যবস্থা করেন। আগে থেকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই তার কক্ষে যেয়ে হাজির হলাম। তখন সকাল ৯টা বাজে। বৃদ্ধ জননেতা বাথরুমে গোসল করছিলেন। একটু পরেই সৌম্য মূর্ত্তির আর দীর্ঘ দেহী সীমান্ত গান্ধী একটা শিশুসুলভ হাসি দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন হাতে তাঁর কয়েকটা কাচা কাপড়।

আমি তাঁকে ভাংগা ভাংগা উর্দু'তে প্রশ্ন করলাম।

আপনি কি ধোপা বাড়ীতে কাপড় দেননা? 'আমার কাপড়ই হচ্ছে চারটা—দুটো সালোয়ার আর দুটো কামিজ। তাই ধোপার বাড়ীতে না দিয়ে রোজ গোসলের সময় নিজেই ধুয়ে নিই।'

পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার বীর সেনা আবদুল গাফফার খানের এ ধরনের কথায় হতবাক হয়ে রইলাম। বুঝলাম ত্যাগ,তিতীক্ষা ও আত্মোৎসর্গের মাঝ দিয়েই এ ধরনের এক একজন মহান নেতার সৃষ্টি হয়। এরপর আমি তাকে খাওয়ার কথা বলতে তিনি বললেন, 'জীবনে কোনদিন খেতেবসে দু'টোর বেশী চাপাতি খেতে পারিনি।' আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তিনি কাচা কাপড়গুলো শুকাতে দিয়ে এসে বসলেন। এরপর শুরু হলো রাজনৈতিক প্রশ্নের পালা।

আমি তাঁকে নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে সম্মিলিত বিরোধী দল গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন,

"হতে পারে, তবে পাঞ্জাব ছাড়া।"

কেন, পাঞ্জাব ছাড়া কেন?

"পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ আর আজাদ পাকিস্তান পার্টি কোনটার মধ্যেই কোন তফাৎ নেই। এরা সবাই পাঞ্জাব ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।"

বুঝলাম এক ইউনিট গঠনের ফলে খান সাহেবের পাঞ্জাব বিরোধী মনোভাব আরও সুদৃঢ় হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে আর বুড়োকে ঘাঁটাঘাঁটি না করে সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। পরিষ্কারভাবে বললেন, পাঞ্জাবী ভাষাভাষি এলাকার নাম যেখানে পাঞ্জাব, সিন্ধী ভাষাভাষি এলাকার নাম সিন্ধ, সেখানে পাখতুন ভাষাভাষি এলাকার নাম পাখতুনিস্থান হবে না কেন? বর্তমান শাসক গোষ্ঠী আমাদের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ভাষা এমনকি নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়ে তাদের শোষণ কায়েম রাখতে চায়।

কিন্তু পাখতুনদের এঁরা এখনও ঠিকভাবে চিনতে পারেনি। আমি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এসব নীতির প্রশ্নে আপোষ করতে পারবো না। এর চেয়ে আমার মৃত্যুও শ্রেয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী নেতার চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, নীতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, সাধারণ মানুষের প্রতি অনাবিল প্রেম আর অসাম্প্রদায়িকতার জন্যে আমরণ সংগ্রামের শপথ দেখে সেদিন আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। এর বছরখানেক পরে কার্যোপলক্ষ্যে আমার বাদশা খানের জন্মভূমি ওৎমানজাইতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। দুপুরের পড়ন্ত রোদে যখন তাঁর বাড়ীতে পৌঁছলাম, তখন তিনি আরও ৮-১০ জন পাঠানের সঙ্গে একই থালায় মধ্যাহ্ন ভোজন করছিলেন। পাঠানদের একাত্মবোধের এটাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সেদিন এ বৃদ্ধ জননেতা আমাকে হাতধরে একই সঙ্গে খেতে বাধ্য করেছিলেন। তেরো বছর পর আজও পর্যন্ত এসব কথা আমার মনে স্পষ্ট গাঁথা রয়েছে। এখনও পর্যন্ত তাঁর হাতের যেই উষ্ণ পরশ আমি অনুভব করতে পারি। আর তাঁর সেই অমায়িক হাসি সমস্ত জীবন আমার হৃদয় মুকুরে গাঁথা থাকবে। জানিনা জীবনে অন্ততঃ আর একবার এ মহান নেতার সঙ্গে দেখা হবে কিনা। কিন্তু এঁর যতটুকু সান্নিধ্য আমি লাভ করতে পেরেছি, সেটুকুই আমি সমস্ত জীবন ধরে অত্যন্ত সঙ্গোপনে রক্ষা করে চলেছি। বেচারা গাফফার খান বছরের পর বছর ধরে কারাজীবন যাপন করে এখন কাবুলে 'স্বেচ্ছায় নির্বাসিতের' জীবন যাপন করছেন।

যাক যা বলছিলাম। আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৫৭ সালে যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্ম হয়েছিলো, আইয়ুব আমলে সেই পার্টি আবার ন্যাপ (ভাসানী) আর ন্যাপ (ওয়ালী) এ'দুটো গ্রুপে বিভক্ত হয়েছিলো। এখন আবার ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনের পর চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে।

মোহাম্মদ তোহার নেতৃত্বে একদল চরম বামপন্থী আগেই পার্টি ত্যাগ করেছে। আর বর্তমানে মওলানা সাহেব অন্যান্য চরম-পন্থীদের হাত থেকে পার্টিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যে মওলানা সাহেব তাঁর জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্য লাহোর প্রস্তাবের আওতায় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবী ঘোষণা করে পশ্চিম পাকিস্তানী ন্যাপকে 'তালাক' দিয়ে বসেছেন। অন্যদিকে নির্বাচনে ভরাডুবির ফলে ন্যাপ (ওয়ালী) পার্টি পূর্ব বাংলায় এখন 'দিশেহারা' হয়ে পড়েছে।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান হওয়ার আগে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। প্রাদেশিক পরিষদে মন্ত্রীসভা ভাঙ্গাগড়ার খেলা শুরু হলো। মোটামুটিভাবে প্রতিটি পার্লামেন্টারী পার্টিই দ্বিখণ্ডিত হলো। কংগ্রেস আর তফশিলী ফেডারেশনেও এর ব্যতিক্রম হলো না। ফলে নির্বাচিত সদস্যদের পক্ষে উন্নয়ন মূলক কাজ করা সুদূর পরাহত হয়ে পড়লো। আর এদিকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা ও স্পীকার আবদুল হাকিমের সঙ্গে ক্ষমতার প্রশ্নে প্রবল সংঘাত দেখা দিল। ফলে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি স্পীকার হাকিম সাহেবকে অপসারণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলেন। কে, এস, পি দলীয় ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলীর রাতারাতি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টিতে যোগ দিলে ঘটনার নাটকীয় পরিবর্তন হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী মন্ত্রীসভাকে বাঁচাবার জন্য বার্ষিক বাজেট পাশ করার প্রশ্ন দেখা দেয়। সরকার আর বিরোধী দল উভয় পক্ষ থেকেই পরিষদ ভবনে ভাড়া করা 'গুণ্ডা বাহিনী' আমদানী করা হলো। ফলে ঢাকার একদল সাংবাদিক নিরাপত্তার অভাবে পরিষদ অধিবেশন 'বয়কট' করলো।

সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে। এখন যেখানে জগন্নাথ হল সেটাই তখন প্রাদেশিক পরিষদ ভবন ছিলো।

আগের দিন স্পীকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে তাড়াহুড়া করে একটা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিলো। তাই পরদিন পরিষদের বাজেট অধিবেশনে ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলীর সভাপতিত্ব করার কথা। কিন্তু বিরোধীদল কিছুতেই এভাবে অধিবেশন করতে দেবেন না। পরিষদ ভবনের নির্দিষ্ট কক্ষে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান উপবিষ্ট রয়েছেন। তিনি পরিষদে যেতে অস্বীকার করলে সমস্ত দায়িত্ব শেখ মুজিবুর রহমানের স্কন্ধে অর্পিত হলো। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি সংখ্যাগুরু বিধায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, তাঁরা পরিষদে স্ব স্ব আসন কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করবেন না।

অধিবেশন শুরু হওয়ার ঘন্টা বাজার সংগে সংগে ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলী কিছুসংখ্যক পরিষদ সদস্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমানের কক্ষে প্রবেশ করে হাত মিলিয়ে বললেন' ভাই সাহেব দোয়া রাখবেন কামটা যাতে ঠিক মতো করতে পারি। মুখ্যমন্ত্রী একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে বিদায় করলেন।

পরিষদ কক্ষে প্রবেশের পথে বিরোধী দলীয় সদস্যরা জনাব শাহেদ আলীকে প্রবলভাবে বাধা দিলেন। এদিকে পরিষদ ভবনের আর একটা কক্ষে স্পীকার আবদুল হাকিমকে আটক রাখায় সেখানকার দরজায় দুইপক্ষে তুমুল বাক বিতণ্ডা আর হাতাহাতির সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক শ' 'সার্জেণ্ট এ্যাট আর্মস' (হাতে কোন অস্ত্র নেই) পরিষদ কক্ষে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বাইরে সশস্ত্র পুলিশ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর করিডোরে গুণ্ডা নামীয় ব্যক্তিরা ঘুরাঘুরি করছে। প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই এসে হাজির হয়েছেন। অন্যদিকে পূর্ব বাংলার গভর্ণর শেরে বাংলা ফজলুল হক অপসারিত হওয়ায়

নয়া গভর্ণর জনাব সুলতান উদ্দিন আহাম্মদ গভর্ণর ভবন থেকে পরিষদ কক্ষের প্রতি মুহূর্তের ঘটনার খবরাখবর নিতে শুরু করেছেন। এমনি এক পরিবেশে অধিবেশন শুরু হলো। কিন্তু বিরোধী দল থেকে টেবিল চাপড়িয়ে আর চীৎকার করে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা হলো যে, জনাব শাহেদ আলীর পক্ষে অধিবেশন পরিচালনায় কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। ফলে তিনি কয়েকজন বিরোধী দলীয় সদস্যদের নাম উল্লেখ করে কক্ষ পরিত্যাগের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সবাই তার নির্দেশ অমান্য করলে জনাব আলী 'সার্জেন্ট এ্যাট আমর্সদের' সহযোগিতা কামনা করলেন। কিন্তু প্রবল বাধার ফলে এদের পক্ষে উল্লেখিত সদস্যদের বের করা সম্ভব হলো না। শেষ পর্যন্ত জনাব শাহেদ আলী সশস্ত্র পুলিশদের আহ্বান করলেন। বহু প্রচেষ্টার পর সশস্ত্র পুলিশের দল বল পূর্বক ঐ কজনা পরিষদ সদস্যকে একরকম কোলে করে বাইরে নিয়ে গেলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে।

এ পর্যায়ে বিরোধী দলীয় সদস্যরা তাদের ফোল্ডিং টেবিলের অংশবিশেষ ভেংগে জনাব শাহেদ আলীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতে শুরু করলেন। হঠাৎ করে দেখলাম একটা বড় আকারের কাঠের টুকরো ঠিক জনাব আলীর মাথায় যেয়ে আঘাত করেছে। বৃদ্ধ শাহেদ আলীর নাক আর মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগলো। এর মধ্যে কিছুসংখ্যক সার্জেন্ট এ্যাট আমর্স চেয়ার উচু করে শাহেদ আলীকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। আর এদিকে সরকার পক্ষীয় সদস্যরা পার্টি হুইপের জন্য পাথরের পুতুলের মতো শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলেন। 'ডায়োবেটিসের রুগী' ষাট বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ শাহেদ আলীকে মারাত্মক আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলো। পরদিন তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সমস্ত পূর্ববাংলা শোকে

মুহ্যমান হয়ে পড়লো আর সভ্য জগৎ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো। বিশ্বের পার্লামেন্টারী রাজনৈতিক ইতিহাসে পরিষদ কক্ষে স্পীকার হত্যার ঘটনা এই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো।

এ সমস্ত ব্যাপারটাই তৎকালীন প্রাদেশিক জিওসি মেজর জেনারেল ওমরাও খান সাদা পোশাকে গভর্ণর গ্যালারী থেকে অবলোকন করলেন। এদিকে করাচীতে তখন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার ইংগিতে আইয়ুব খান সাহেব সামরিক অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ করেছেন। ১৯৫৮ সালের সাতই অক্টোবর রাত সোয়া এগারোটা নাগাদ এপিপির টেলিপ্রিন্টারে পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসনের খবর এসে পৌঁছলো। অন্যান্য কারণের মধ্যে শাহেদ আলী হত্যার ঘটনা উল্লেখ করে এ সামরিক শাসন প্রবর্তন করে শাসনতন্ত্র বাতিল, সমস্ত পরিষদের বিলুপ্তি আর রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষণা করা হলো। কিন্তু মাত্র বিশদিনের মাথায় এ ষড়যন্ত্রের হোতা (?) প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুব গদি দখল করলেন।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসের যবনিকা পাত হয়ে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হলো। একযুগ ধরে আইয়ুব শাসন পাকিস্তানের জনসাধারণের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসলো। শেষপর্যন্ত শত শত প্রেমিকের শাহাদতের মধ্যে আইয়ুব শাসনের পতন ঘটলো। আর নয়া প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভূয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা দখল করলেন। সত্তর সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চলেছেন। এর পরিণতি কোথায় কে জানে?

শেষ